সম্পাদকীয়

সর্বরিক্ত দলিত সমাজ চায় দুনিয়া কাঁপানো দশটি দিন অথবা ভারতের আকাশে বজ্র-নির্ঘোষ

ভারত সরকার দলিত, আদিবাসী, সংখ্যালঘু ও মহিলাদের বি দ্ধে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের নির্দেশে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।
আসুন ধিক্কার জানাই

CLASS CASTE RELATIONS
MARXIST APPROACH

DAFODWAM PUBLICATION

For Collection :-

Mail : dafodwam @gmail.com
or
Call : (0) 9331858854

যাঁদের রচনাবলী অবশ্যপাঠ্য

কার্ল মার্কস, জ্যোতি বা ফুলে, রামস্বামী পেরিয়ার,
বেগম রোকেয়া, আম্বেদকর, ভগৎ সিং

যাঁদের রচনাবলী পাঠককে মুক্ত মনা হ তে সহায়তা করবে

অক্ষয়কুমার দত্ত, কোসাম্বী, রাহুল সাংকৃত্যায়ন,
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুকুমারী ভট্টাচার্য,
আরজ আলি মাতুব্বর, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, আহমেদ শরিফ,
আশিষ লাহিড়ী, ভবানীপ্রসাদ সাহু

জাতিভেদের কুফল

শিবনাথ শাস্ত্রী

....এখানে জাতিভেদের অনিষ্ট ফল কি কি ঘটিয়াছে তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখা যাউক।

প্রথম অনিষ্ট ফল ঃ এই প্রথা ভারত-ক্ষেত্রে বিচ্ছেদ ও অনাত্মীয়তার বীজ বপন করিয়াছে। ইহারই জন্য 'মানুষ মানুষেরই ভাই' এই মহাসত্য ভারতবাসীর মনে আপনার বল প্রকাশ করিতে পারে নাই। এই প্রথা নিবন্ধন এক প্রদেশের ও এক জেলার ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকের রীতি-নীতি আচারব্যবহার বিভিন্ন প্রকার। পরস্পরের সহিত কোন প্রকার সামাজিক বন্ধন নাই; আত্মীয়তা বৃদ্ধি হইবার উপায় নাই। চিন্তা করিয়া দেখ এই শহরের ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ সুবর্ণবণিকদের কিরূপে ঘৃণা করেন। জাতিগত ঘৃণা যেখানে, আত্মীয়তা সেখানে কোথায়? তৎপরে আর একটু দূরে দৃষ্টি ফেলিয়া দেখ — দেশের কি শোচনীয় দুরবস্থা। চব্বিশপরগণার লোক যদি কর্ম্মোপলক্ষে মেদিনীপুরে গিয়া থাকে, সেখানকার লোকদিগকে ঘৃণা করে; বাঙালীগণ যদি বেহারে থোকে বেহারবাসিদিগকে ঘৃণা করে, পঞ্জাবের বাঙালীদিগকে পঞ্জাবীরা ঘৃণা করে! বাঙালীগণ পঞ্জাবীদিগকে হীন বলিয়া অবজ্ঞা করে। এইরূপ যত প্রকার অমিত্রতা যত প্রকার জাতি বা শ্রেণীগত বিদ্বেষ ইহার মূলে জাতিভেদ। বিবাহসম্বন্ধই দুই দল লোকের মধ্যে আত্মীয়তা বৃদ্ধির একটি প্রধান উপায়। ইহা আপনারা সহজেই অনুভব করিতে পারেন। ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। প্রাচীন রোমানদিগের সহিত তাহাদের প্রতিবেশী স্যাবাইনদিগের কিরূপ শত্রুতা ছিল তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু যখন রোমীয় যুবকগণ শত্রুজাতীয় কতকগুলি রমণীকে হরণ করিয়া আনিল এবং তাহাদের সহিত পরিণয়-পাশে বদ্ধ হইল তখন সেই রমণীগণের দ্বারাই শত্রুজাতির সহিত সন্ধি ও আত্মীয়তা স্থাপিত হইল। ইতিহাসের শরণাপন্ন-ই বা হই কেন? আপনারা কি অনেকবার দেখেন নাই, যে দুইটি গ্রামের লোকের মধ্যে ঘন ঘন বিবাহ-সম্বন্ধ হয় সেই দুই গ্রামের মধ্যে কেমন আত্মীয়তা? যে গ্রাম আমার মাসী বা পিসী বা ভাগনী দশজন আছেন, সে গ্রাম আমার কত ভালবাসার স্থান; তাহার লোকের সঙ্গে আমার কত আত্মীয়তা। জাতিভেদ প্রথা নিবন্ধনে ভারতবর্ষে এই আত্মীয়তা বৃদ্ধি

হইতে পারে নাই। যেস্থলে আত্মীয়তা নাই; সেস্থলে লোকে অপরের সুখে সুখী, দুখে দুঃখী হয় না। আজ যদি আপনারা শুনিতে পান যে মাদ্রাজ শহরে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ বা মারীভয় হইয়া দলে দলে লোক মরিতেছে, তাহা হইলে স্বদেশ বলিয়া সাধারণভাবে আপনাদের সকলেরই কিঞ্চিৎ দুঃখ হইবে; আমার হৃদয়ে বিশেষ আঘাত লাগিবে, কারণ আমার অনেকগুলি বন্ধু ও আত্মীয় তথায় আছেন। আবার আমার সেই ক্লেশ আরও ঘনতর হইত, যদি সেখানে আমার দুই-চারিজন মাসী, পিসী কি ভগিনী থাকিতেন। ইহা আপনারা সহজেই অনুভব করিতে পারেন ইহা বলা বাহুল্য যত আত্মীয়তা ততই সমদুঃখসুখতা। জাতিভেদ প্রথা ভারতীয় জাতিসকলের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপিত হইতে দেয় নাই। এই আত্মীয়তা ও ঐক্যের অভাবই ভারতবাসীদিগের দুর্গতির প্রধান কারণ — ইহার জন্যই ভারতবর্ষ এত সহজে বিদেশীয় জাতিদিগের দাসত্ব-পাশে বদ্ধ হইয়াছে।

একবার পাঞ্জাব প্রদেশ ভ্রমণ করিবার সময় একজন উচ্চ শ্রেণীর য়ুরোপীয় কর্মচারীর সহিত আমার ভারতবর্ষের ভাবী অবস্থার বিষয়ে কথোপকথন হয়। উক্ত য়ুরোপীয় কর্মচারী আমাকে বলিলেন — আমার অনুমানে বোধ হয় তুমি বঙ্গদেশের লোক।

আমি বলিলাম — হ্যাঁ, আমি পঞ্জাব ভ্রমণের উদ্দেশে আসিয়াছি।

য়ুরোপীয় কর্মচারী বলিলেন, — আচ্ছা এস আমরা তোমাদের দেশের ভাবী অবস্থার বিষয়ে কথা কই।

আমি বলিলাম — ও বিষয়টা রাখিয়া দিলে ভাল হয় না? কারণ ও বিষয়ে আমাদের মতভেদ উপস্থিত হইয়া কথোপকথনের সুখের ব্যাঘাত হইবে।

তিনি বলিলেন — না, না, বিবাদ করা আমার উদ্দেশ্য নয়।

তখন আমি বলিলাম — আপনারা আমাদিগকে যে ইংরাজি শিক্ষা দিয়াছেন তাহার গুণে আমাদের অন্তরে স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্ক্ষা উদিত হইয়াছে।

তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন — অর্থাৎ, তোমরা সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতেছ যখন আমরা এ দেশ হইতে চলিয়া যাইব।

আমি হাসিয়া বলিলাম — হাঁ তা বই কি। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন — আচ্ছা, তোমরা যে আমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে তাড়াইবে তাহার কোন সম্ভাবনা দেখিতে পাও?

আমি বলিলাম, না, তিন-চারিশত বৎসরের মধ্যে সে সম্ভাবনা দেখি না।

তখন তিনি বলিলেন — তোমাদের মধ্যে যে বাহুবলশালী ও সমরকুশল লোক নাই তাহা নহে, দেখ তোমাদেরই লোকের দ্বারা তোমাদিগকে শাসনে রাখিয়াছি। বলের অভাবের জন্য তোমরা আমাদের অধীন নও, কিন্তু আর এক কারণে। তোমাদের মধে এমন একটি বিষয় আছে যে জন্য তোমাদিগকে এক হইতে দিবে না এবং তোমরা আমাদিগকে তাড়াইতে পারিবে না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম — সে বিষয়টি কি?

তিনি বলিলেন — তাহা জাতিভেদ প্রথা। এ প্রথা বাঁচিয়া থাক, আমাদিগকে এদেশ হইতে তাড়ায় কাহার সাধ্য?

বাস্তবিক এই জাতিভেদ প্রথা ভারতীয় জাতি সকলের মধ্যে আত্মীয়তা, সমদুঃখসুখতা বর্ধিত হইতে দেয় নাই। এই কারণেই ভারতবাসীগণ এত দুর্বল।

জাতিভেদের দ্বিতীয় অনিষ্ট ফল এই হইয়াছে যে, এতদ্বারা কায়িক শ্রমসাধ্য কার্যকে নিকৃষ্ট ও লোকের চক্ষে হেয় করিয়াছে। এ দেশে কায়িক শ্রম চিরদিন হীনজাতিরাই করিয়া আসিতেছে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বর্ণেরা যে সকল কার্যকে তাঁহাদের অযোগ্যবোধে পরিত্যাগ করিয়াছেন। দেশে এই প্রথা চিরদিন প্রচলিত থাকাতে কায়িক শ্রমের প্রতি ভদ্রলোকের ঘৃণা বদ্ধমূল হইয়াছে। এই কারণে দেখিতে পাই এদেশে শিক্ষা বা অন্য কোন কারণে যাহারই অবস্থা একটু ভাল হয় সে এবং তাহার পুত্র-পৌত্রগণ অমনি কায়িক শ্রমকে ঘৃণিত বলিয়া অনুভব করিতে থাকে। এই ব্যধি এতদূর পর্যন্ত প্রবল, যে একজন ব্রাহ্মণ বা কায়স্থের সন্তান অর্থাভাবে সপরিবারে অর্ধাশনে থাকিবে অথচ কোনপ্রকার কায়িক শ্রমের দ্বারা অর্থোপার্জন করিবে না। ব্রাহ্মণদিগের তো কথাই নাই, কোন ব্রাহ্মণ ভিখারীকে যদি তিরস্কার করা যায়, সে বলে মহাশয়! ব্রাহ্মণের সন্তান খাটিয়াও খাইতে পারি না, সুতরাং ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়। ভিক্ষাতে ব্রাহ্মণের লজ্জা কি! কি ভয়ানক, যে দেশে মনুষ্যোচিত কায়িক শ্রম অপেক্ষা ভিক্ষা প্রশংসার বিষয়, সে দেশকে দুর্গতি হইতে রক্ষা করে কার সাধ্য? হে ভারতীয় যুবক! তুমি যতদিন সাহসী, কর্মঠ, স্বাধীনচেতা মনুষ্যের ন্যায় নিজের মস্তকের ঘর্মে নিজের অন্ন উপার্জন করিতে না শিখিবে, জগদীশ্বর তোমাকে যে বাহুদ্বয় ও পদদ্বয় ও যে মস্তিষ্ক দিয়াছেন, তাহাদিগকে খাটাইয়া নিজ উন্নতি করিবার চেষ্টা না করিবে ততদিন তোমার দুর্গতি দূর হইবে না। ইতিহাসের প্রতি

দৃষ্টি পাত কর, দেখিতে পাইবে, যে ব্রাহ্মণদিগের প্রতাপ যখন প্রবল ছিল, তখন এ দেশে শ্রমজীবীদের উন্নতি হইতে পারে নাই।

জাতিভেদের তৃতীয় অনিষ্ট ফল এই যে, ইহাতে ভারতবর্ষকে দরিদ্র করিয়াছে। এই প্রথা নিবন্ধন সমুদ্র-যাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছে সুতরাং বাণিজ্যের উন্নতি হইতে পারে নাই। সমুদ্রযাত্রা ব্যতীত আজ পর্যন্ত কোন্ দেশ কবে বাণিজ্য বিষয়ে উন্নতিলাভ করিয়াছে? বোম্বাই নগরে গিয়া দেখ এ দেশের লোকে কত কাপড়ের কল চালাইতেছেন। তাঁহার প্রতিদিন রাশি রাশি সূতার নুটি প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদের কারখানাতে স্তূপাকার করিতেছেন। কিন্তু সেই সকল সূতার নুটি কোথায় বিক্রয় হইতেছে? কেন, য়ুরোপীয় বণিকগণ ঐ সূতা ক্রয় করিয়া চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে গিয়া বিক্রয় করিয়া আসিতেছে। একজন সূতা প্রস্তুত করিল, দ্বিতীয় ব্যক্তি সেইগুলি লইয়া আর একজনের নিকট বিক্রয় করিয়া লাভ করিয়া গেল। জাতিভেদ প্রথা থাকাতে প্রথমোক্ত ব্যক্তি সে লাভ করিতে পারিলেন না। এইজন্য ভারতীয়দের এত দারিদ্র্য।

চতুর্থতঃ এই প্রথা নিবন্ধন এ দেশের লোকের এত শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা। জাতিভেদপ্রথা নিবন্ধন আমাদের বিবাহ সম্বন্ধ ক্রমেই সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর সীমার মধ্যে বদ্ধ হইয়াছে; রক্তের বিমিশ্রণ হইতে পারে নাই। ইহা একটি প্রাণী জগতের পরীক্ষিত সত্য যে অল্পপ্রসর ক্ষেত্রে মধ্যে যদি ক্রমাগত বিবাহ সম্বন্ধ ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে সে জাতি হীনতেজ হইয়া যায় এবং কালে উৎসন্ন দশা প্রাপ্ত হয়। দুইটি হাঁস পোষ, তাহাদিগকে এমন জায়গায় লইয়া যাও যেখানে অন্য হাঁস নাই। এই দুইটি হাঁসের যে বংশ তাহাদের মধ্যেই বংশবৃদ্ধি চলুক, আর বাহিরের হাঁস আনিও না। কয়েক পুরুষের মধ্যেই দেখিবে হাঁসগুলি দুর্বল, নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে, আরও কয়েক পুরুষ পরে দেখিবে তাহাদের বংশবৃদ্ধি বন্ধ হইয়া গেল। রক্তের বিমিশ্রণাভাবে যে শারীরিক দুর্বলতা তাহা বিজ্ঞানের প্রমাণিত সত্য। সুতরাং এ বিষয়ে অধিক বলা নিরর্থক। আবার অপরদিকে ইংরাজজাতির প্রতি দৃষ্টিপাত কর, ইহাদের বল বিক্রম ও শৌর্য বীর্যের বিষয় চিন্তা কর। সমগ্র দ্বীপটি ভারতবর্ষের তুলনায় কি সামান্য স্থান! বিস্তৃতিতে ইহার একটি প্রদেশের ন্যায়ও নহে। অথচ এই সামান্য দ্বীপে যে জাতি বাস করিতেছে, তাহাদের শৌর্য বীর্য কত। কেবল যে ভারতবর্ষের ন্যায় প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য ইহাদের দ্বারা সুচারুরূপে চালিত হইতেছে তাহা নহে; কিন্তু ইঁহাদের ভয়ে পৃথিবীর বলবান জাতিসকল সর্বদা সশঙ্কিত। ইঁহাদের অগ্রাহ্য করিয়া জর্মণির সম্রাট কার্য করিতে পারেন না; ভ্রূকুটি দেখিলে রুশিয়ার সম্রাটকে তাঁহার সিংহাসনে বসিয়া কাঁপিতে হয়।

ভারতবর্ষ কিরূপে শাসন হইতেছে তাহাই একবার চিন্তা কর। কিরূপ লোকের দ্বারা আমরা শাসিত হইতেছি? ইংলণ্ডের প্রথম শ্রেণীর লোক গ্লাডস্টোন, ব্রাইট প্রভৃতি তো এদেশে আসিবার কথা স্বপ্নেও ভাবেন না; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক ফসেট প্রভৃতি, ইঁহাদের দুই একজন, গবর্ণর জেনারেলের পদ গ্রহণ করিয়া আসেন; তৃতীয় শ্রেণীর লোকগণও এদেশে আসা প্রয়োজন মনে করেন না; কেবল সেখানকার চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর লোকেরা সিভিল সার্বিসে প্রবিষ্ট হইয়া ও অপরাপর কর্ম অবলম্বন করিয়া এদেশে আগমন করেন। এই পঞ্চমশ্রেণীর লোকেরাই এদেশকে ভাঙিতেছেন, গড়িতেছেন, রাজাগুলিকে কাদার পুতুলের ন্যায় সিংহাসনে তুলিতেছেন, নামাইতেছেন, সমুদয় রাজকার্য সুচারুরূপে চালাইতেছেন, ইহা কি আশ্চর্য দৃশ্য নয়? ইহাতে কি ইংলণ্ডের বলের পরিচয় পাওয়া যায় না? সে দেশ না জানি কিরূপ হইবে, যাহার পঞ্চম শ্রেণীর লোকদিগের এত শক্তি, এত বিক্রম। কিন্তু ইংরাজদিগের এই তেজস্বিতা ও মানসিক শক্তির মূলকোথায়? ইহার মূল তাঁহাদের রক্তে। আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই যে নির্ভীকতা, উদ্যোগিতা, কর্মকুশলতা, শ্রমদক্ষতা, অধ্যবসায়, স্বাধীনচিত্ততা প্রভৃতি গুণগুলি অনেক পরিমাণে শারীরিক তেজের উপর নির্ভর করে। এ বিষয়ে আমার একটি পৌরাণিক আখ্যায়িকা মনে হয়। একবার দেবগণ কোন অসুরের উপদ্রবে নিতান্ত উত্যক্ত হইলেন। দানব-নিপাতের জন্য তাঁহার অবশেষে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন—এইরূপ স্থির হইল যে দেবগণের অংশোদ্ধার করিয়া একজন অমিততেজ সম্পন্ন বীরকে সৃষ্টি করা হইবে। ইন্দ্র তিন ভাগ দিলেন, যম তিন ভাগ দিলেন, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি অপর দিক্‌পালগণ স্বীয় স্বীয় অংশোদ্ধার করিয়া দিলেন। এই সকল অংশে এক মহাশক্তির জন্ম হইল, তিনিই সেই দানব দলনে সমর্থ হইলেন। এরূপ আখ্যায়িকা আপনারা অনেকবার নিশ্চয় শুনিয়া থাকিবেন। ইংরাজ জাতির জন্মও সেই প্রকারে। আদিতে স্যাক্‌সন, দিনেমার, নর্মান প্রভৃতি নানা জাতি সম্মিলিত হইয়া তাহাদের সৃষ্টি হইয়াছে। তৎপরে এখনও বিবাহসম্বন্ধ বিষয়ে তাঁহাদের কোন কুসংস্কার নাই। ইঁহারা যেখানেই যাইতেছেন সেইখানেই বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেছেন। ইংরাজ ফরাসীদেশে যাইতেছেন, একটি ফরাসী রমণী ঘরে আনিতেছেন, ইটালিতে যাইতেছেন, ইটালীয় রমণী ঘরে আনিতেছেন, এইরূপে নিরন্তর নব নব রুধিরস্রোত ইংরাজ সমাজে প্রবাহিত হইতেছে। নানা শক্তির সমাবেশ হইয়া ইঁহারা শক্তিসম্পন্ন হইয়াছেন। ইঁহাদের ভাষা যেমন নানা ভাষা হইতে শব্দ সংগ্রহ করিয়া উন্নতিপ্রাপ্ত হইয়াছে, ইঁহাদের দেহ মনও তেমনি নানা জাতির গুণ ও শক্তি সকল লাভ করিয়া সবল হইয়াছে।

পঞ্চমতঃ এই জাতিভেদ প্রথা বহু বহু শতাব্দী ধরিয়া আমাদের উন্নতির পথে একটি কঠিন অর্গলস্বরূপ রহিয়াছে। চীন-দেশবাসীগণ যেমন এক পাষাণ প্রাচীরের দ্বারা আপনাদের রাজ্যকে বেষ্টন করিয়া বাহিরের আলোক, বাহিরের উন্নতির স্রোত, বাহিরের চিন্তাকে বহু শতাব্দী ধরিয়া আপনাদের রাজ্যে প্রবেশ করিতে দেয় নাই, হিন্দুগণও তেমনি জাতিভেদরূপ এক আধ্যাত্মিক প্রাচীরের দ্বারা আপনাদিগকে আবদ্ধ করিয়া সকল প্রকার উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক অর্পণ করিয়া রাখিয়াছেন। এই কারণেই জাপানবাসিগণ বিগত তিরিশ বছরের মধ্যে রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে যতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন, বিগত দেড় শতাব্দীর অধিককাল ইংরাজরাজ্যে বাস করিয়াও এদেশবাসীগণ সে উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। কি আশ্চর্য, এই ভারতের উপর দিয়ে কত স্রোত বহিয়া যাইতেছে। এখানে বুদ্ধের নব ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল, এখানে শত শত খ্রীষ্টীয় প্রচারক দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া দেহের শোণিত শুষ্ক করিতেছেন, কিন্তু কেহই যেন এই স্থাবর, অচলিষ্ণু ঘণীভূত প্রাণিপুঞ্জকে অগ্রসর করিতে পারিতেছেন না। ইহার কারণ কি? এই জাতিভেদ প্রথাই ইহার কারণ। জাতিখড়্গ মস্তকোপরি দোদুল্যমান, কে হঠাৎ পা বাড়াইতে সাহসী হইবে। যদি এদেশবাসী নরনারীর গলদেশে জাতির নিগড় এত দৃঢ়তররূপে বদ্ধ না হইত, তাহা হইলে এদেশের রক্ষণশীলতা এত অধিক হইত না।

ষ তঃ জাতিভেদ এমন এদেশবাসিদিগকে রক্ষণশীল ও উন্নতিপরাঙ্মুখ করিয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনুষ্যত্ব হরণ করিয়াছে। আমাদিগকে কাপুরুষ জাতি করিয়াছে। এই কথাগুলি হৃদয়ের গুরুতর দুঃখ ও ক্ষোভের সহিত বলিতেছি। মানবত্মার উন্নতির সহায়তা করিবার জন্যই জনসমাজ। যে সমাজে বাস করিয়া আমি জ্ঞানে ধর্মে বর্ধিত হইব, প্রেম পবিত্রতা লাভ করিব, কর্তব্যের পথে অবাধে অগ্রসর হইতে পারিব, স্বাধীনভাবে অসংকোচে ও নির্বিঘ্নে আপনার দেহমনের শক্তিসকল ঈশ্বরের প্রিয়কার্য-সাধনে নিয়োগ করিতে পারিব, তাহাই ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত সমাজ। কিন্তু তাহা না হইয়া জনসমাজ যখন প্রপীড়ক ও অত্যাচারী হয়, যখন অবাধে স্বীয় কর্তব্য পালন করিতে দেয় না, যখন সরল ধর্মপিপাসু লোকদিগকে দস্যুতস্করের ন্যায় সাজা দিতে আরম্ভ করে, যখন তন্মধ্যে স্বাধীনভাবে বিবেকের আদেশ পালন করা যায় না, নিজের আত্মারগৌরব ও মনুষ্যত্বরক্ষা করিতে পারা যায় না, তখন সে বিকৃত সমাজের ব্যধিগ্রস্ত দেহের ন্যায়, মানবাত্মার বাসের অযোগ্য হইয়া পড়ে। এই জাতিভেদ প্রথা নিবন্ধন হিন্দুসমাজের সেই দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। হায় হায়!

ইহাতে আমাদের পুরুষদিগকে কাপুরুষ করিয়া ফেলিয়াছে। জাতি যাওয়ার ভয়ে লোকে স্বীয় কর্তব্যপালনেও পরাঙ্মুখ হইতেছে। ঐ দেখ একজন শিক্ষিত গৃহস্থের নিরপরাধ বালিকা কন্যা দশমবর্ষে বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই সুকুমারমতি সরলস্বভাবা বালিকা সংসারের সুখ দুঃখ বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিয়া ধূলা খেলা করিতেছিল, এমন সময়ে পিতা দেশাচারের ভয়ে তাহাকে ধরিয়া তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। এক বৎসর না যাইতে যাইতে সে ঘোর বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন তাহার নবযৌবনের উদয়। শিক্ষিত পিতা ও অশিক্ষিতা জননী যতবার তাহার নবযৌবন প্রস্ফুটিত সরল ও অনিন্দিত মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, ততবার গোপনে অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। তাঁহাদের হৃদয় বলিতেছে, ধর্মজ্ঞান বলিতেছে যে বলপূর্বক তাহার চির-বৈধব্য রাখা অকর্তব্য— কিন্তু সাহসে কুলাইতেছে না। কাহার ভয়? জাতি যাওয়ার ভয়। যদি জাতি বলিয়া কিছু একটা না থাকিত, যদি দশজনে মিলিয়া একজনকে এত কষ্ট দিতে না পারিত, তাহা হইলে কি ঐ বালিকার সংসারিক সুখের পথে অর্গল পড়িত? বলিতে কি সমাজের ভয়ে লোকের মনুষ্যত্ব লোপ হইতেছে। যদি জাতিভেদ প্রথা না থাকিত সমাজের এত ভয় থাকিত না।

সপ্তমতঃ চিন্তা করিয়া দেখ এই জাতিভেদ প্রথা হইতেই বিবাহ-সম্বন্ধীয় রীতি নীতি এতদূর দূষিত হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষে যেখানে হিন্দু সেইখানেই বাল্যবিবাহ প্রচলিত দেখা যায় কেন? জাতিভেদ প্রথা কি ইহার অন্যতম কারণ নহে? বাংলাদেশে প্রধানত ঃ তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন, রাঢ়ী, বৈদিক ও বারেন্দ্র। ইঁহারা পরস্পরের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হন না। ইঁহাদের মধ্যে আবার কুলীন, মৌলিক, বংশজ আছেন। ইঁহাদেরও পরস্পরের মধ্যে বিবাহসম্বন্ধ অনেক কঠিন নিয়ম আছে। এইরূপে কালক্রমে বিবাহোপযোগী স্থল ক্রমেই সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর সীমার মধ্যে বদ্ধ হইয়া আসিতেছে। ইহার উপর এক গৃহে এক পুরুষের বিবাহ হইলে সে গৃহে তাঁহার সন্তান-সন্ততির বিবাহ হওয়ার স্থল অতি অল্প থাকে। ওদিকে আবার কন্যাদিগকে দশম বৎসরের পর অবিবাহিত রাখিতে ধর্মশাস্ত্রে কঠিন নিষেধ আছে; সুতরাং কালক্রমে যথা সময়ে উপযুক্ত পাত্র পাওয়া দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। কন্যাকর্তাগণ উপযুক্ত পাত্র দেখিলেই সময় না আসিতে বিবাহ দিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। কি জানি কন্যা বড় হইলে যদি উপযুক্ত পাত্র না পাই, তখন কন্যা রাখিতে পারিব না। সুতরাং উপযুক্ত অনুপযুক্ত বিবেচনার সময় থাকিবে না, অতএব সময় থাকিতে একটি উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া দুই হস্ত এক করিয়া দেওয়া যাউক। গৃহস্থগণ এইরূপ বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া কার্য করিয়াছেন

ও করিতেছেন। এই কারণে কলিকাতার দক্ষিণস্থ বৈদিকগণের মধ্যে সূতিকা-গৃহ হইতে বহির্গত হইলেই কন্যার বিবাহসম্বন্ধ করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। এই জন্যই কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে পারিবারিক সুখের কন্টকস্বরূপ বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। এই কারণেই এদদ্দেশীয় সুবর্ণবণিক, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মধ্যেই কন্যার বিবাহের ব্যয় ভয়ানক বৃদ্ধি হইতেছে। এই ব্যয় ইতিমধ্যে এতদূর বাড়িয়াছে যে, কোন গৃহস্থের গৃহে তিনটি কন্যা জন্মিলে, সেই তিন কন্যার বিবাহ দিতে তাঁহাকে সর্বস্বান্ত হইতে হইতেছে। যাঁহাদের ঘরে উপযুক্ত বুদ্ধিমান্ ও শিক্ষিত পুত্র আছে, তাঁহাদের লাভের সীমা নাই। তাঁহারা একটি পুত্রকে নীলামে বিক্রয় করিয়া অনেক অর্থ উপার্জন করিতেছেন। এই সামাজিক দৌরাত্ম্য পূর্বোক্ত শ্রেণীসকলের মধ্যে এত অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে যে তাঁহারা এই অনিষ্ট নিবারণের জন্য মধ্যে মধ্যে সভা করিতেছেন ও বলিতেছেন, এস সকলে প্রতিজ্ঞাপূর্বক একটা ব্যয় ধার্য করি, তাহার অধিক কোন বরকর্তা চাহিতে পারিবেন না। কিন্তু তাঁহাদের সে সকল চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হইতেছে না। হইবে কেন? যে জাতিভেদ প্রথা হইতে বাল্যবিবাহের সৃষ্টি, যে জাতিভেদ প্রথা নিবন্ধন একটি ভাল ছেলের জন্য নীলামের ডাক পড়ে, সে প্রথা অপরিবর্তত থাকিতে উক্ত অনিষ্ট নিবারিত হইতে পারে না।

অষ্ট মতঃ জাতিভেদ প্রথাকে এজন্য ঘৃণা করি যে ইহা অধর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত। জগদীশ্বর মানবকে দেহমনের শক্তি দিয়া প্রত্যেককে এই অধিকার দিয়াছেন যে, আপনার ইচ্ছামত সেই সমুদায় শক্তি নিজ উন্নতিসাধনে ও অপরের কল্যাণসাধনে নিয়োগ করিবে। ইহাই ঐশ্বরিক বিধি। জাতিভেদ প্রথা এই বিধিকে লঙ্ঘন করিয়াছে। জাতিভেদ প্রথা বলিতেছে তুমি যদি বুদ্ধিমান হও, যদি জ্ঞানী হও, যদি ধার্মিক-প্রবর হও, কিন্তু তুমি যদি শূদ্র হও, তবে তুমি ব্রাহ্মণের সমাধিকার পাইবে না। এই ন্যায়বিরুদ্ধ, ধর্মবিরুদ্ধ ও ঈশ্বরেচ্ছা-বিরুদ্ধ বিধি প্রচলিত থাকাতে বহু বহু শতাব্দী ধরিয়া ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণেতর জাতিদিগের প্রতিভা ও আধ্যাত্মিক শক্তিসকলকে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহাদিগকে এইরূপে পদতলে চাপিয়া রাখাতে কি দেশের সমূহ অকল্যাণ করা হয় নাই? তাহারা যদি অবাধে আপনাদের শক্তিসকলকে বিকশিত করিবার অবসর পাইত, যদি স্বীয় শক্তি অনুসারে উন্নত পদে আরোহণ করিতে পারিত, যদি তদনুরূপ সামাজিক সম্ভ্রম লাভে সমর্থ হইত, যদি আপনাদের প্রতিভালোকে দেশীয় সাহিত্যকে আলোকিত করিতে পারিত, তাহা হইলে কি তাহাদের গৌরবে দেশ আরও গৌরবান্বিত হইত না? তাহাদের যশঃসৌরভে ভারতাকাশকে

আমোদিত করিত না? বর্তমান সময়ে জাতিভেদের প্রকোপ শিথিল হওয়ার ফল আমরা দেখিতে পাইতেছি না? আমাদের ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, আমাদের কৃষ্ণদাস পাল, কে ইঁহাদের নাম স্মরণপূর্বক স্বদেশকে গৌরবান্বিত মনে করে না? জাতিভেদ প্রবল থাকিলে কি এ সকল লোককে পাওয়া যাইত? ইঁহাদিগের দ্বারা দেশ কি উপকৃত হইতেছে না? চিন্তাবিহীন যুবক। তুমি কি কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছ, এই দুরন্ত জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত না থাকিলে আরও কত মহেন্দ্রলাল সরকার, ও কৃষ্ণদাস পাল জন্মিতে পারিত? তবে দেখ, জাতিভেদ প্রথা তোমার দেশের কি শত্রুতা করিয়াছে। ইলবার্ট বিলের আন্দোলনের সময় ইংরাজগণ বলিয়াছিলেন — ভারতীয়গণ বিদ্যা বুদ্ধিতে যত বড় হউক, আমাদের সমাধিকার পাইতে পারে না। তাহাতে কেন সকলে বিরক্ত হইয়াছিলেন? ইহা জাতিভেদের কথা, ইহা ধর্মবিরুদ্ধ। পাপের উপর ইহার ভিত্তি।

নবমতঃ আমি মনে করি, জাতিভেদ নিবন্ধনই এই দেশবাসিদিগের পক্ষে পরের দাসত্বপাশ গলে ধারণ করা সহজ হইয়াছে। ব্রাহ্মণেতর জাতির সংখ্যা দেশে সর্বকালেই অধিক ছিল। উক্ত ব্রাহ্মণেতর জাতিগণ কঠোর আধ্যাত্মিক দাসত্বের মধ্যে বাস করিয়া মনুষ্যত্ববিহীন হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং যখন বিদেশীগণ এ দেশ আক্রমণ করিল, তখন মনুষ্যত্ববিহীন ও দাসত্বে অভ্যস্ত জাতিসকল অনায়াসে তাহাদের দাসত্ব নিগড় গলদেশে ধারণ করিতে সম্মত হইল।

আর অধিক দোষ প্রদর্শনের প্রয়োজন নাই। এই জাতিভেদ হইতে সমুহ অনর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। এই জাতিভেদ প্রথা ভারতে ঈর্ষানল প্রজ্বলিত করিয়াছে; দারিদ্র-যাতনা বৃদ্ধি করিয়াছে; শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা আনয়ন করিয়াছে; সামাজিক উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক হইয়াছে; হিন্দুগণের মনুষ্যত্ব হরণ করিয়া কাপুরুষতার বৃদ্ধি করিয়াছে; বাল্যবিবাহ, বহু-বিবাহ, প্রভৃতি দূষিত রীতিসকল প্রসব করিয়াছে, শারীরিক ও মানসিক উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়াছে; শত শত বৎসর ধরিয়া নিম্নজাতীয়দিগকে চাপিয়া রাখিয়াছে এবং সর্বশেষে এ দেশবাসিদিগকে পরের দাসত্ব-পাশ বহনের জন্য প্রস্তুত করিয়াছে। আর কি শুনিতে চাও? এমন প্রথার সপক্ষে আবার কথা কও? আমি যখন এই সকল অনিষ্ট ফলের বিষয় স্মরণ করি তখন বলি, এই জাতিভেদ প্রথা যদি কোন ঝোপ বা বৃক্ষ হইত তাহা হইলে দুই হস্তে সজোরে ধরিয়া উপাড়িয়া ফেলিতাম, ইহা উন্নতির

প্রাচীন ভারতে গোমাংস

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

অধিকাংশ স্বদেশবাসীর কাছেই, আমি জানি, এই প্রবন্ধের শিরোনাম অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকবে। তবুও হিমালয়ের এপারে আর্যজাতির আদি সামাজিক ইতিহাসের অনুসন্ধান-এর কৈফিয়ৎ হিসেবে গ্রাহ্য হবে বলেই আমার বিশ্বাস। খাদ্য হিসেবে গোমাংস — যা কিনা দেবী ভগবতীর পার্থিব প্রতিনিধির মাংস — স্রেফ এই চিন্তাটাই হিন্দুদের কাছে এত ঘৃণ্য যে তাঁদের মধ্যে যাঁরা একটু গোঁড়া এরকম হাজার হাজার মানুষ শব্দটাই উচ্চারণ করেন না। গোহত্যার জন্যে শোচনীয় রক্তক্ষয়ী দাঙ্গাও এদেশে বড় কম হয়নি। অথচ একটা সময় ছিল যখন গোহত্যার জন্য মানুষের মনে বিবেকদংশন হওয়া দূরে থাক, গোমাংস পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে গৃহীত হতো। সেকালে প্রাচীন ইহুদিদের মতো সম্মানিত অতিথির খাতিরে হৃষ্টপুষ্ট বাছুর মারা তো উদার আতিথেয়তা হিসেবে গণ্য হতোই, হিন্দুদের পরলোকযাত্রাতেও গোমাংস অবশ্য-প্রয়োজনীয় উপকরণ ছিল — মৃতের সঙ্গেসবসময়েই দাহ করা হতো একটি গরুও। যেসব ইংরেজ আজকের দিনে এ ব্যাপারে দেশের মানুষের আবেগের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরাও যেমন এ তথ্যে বিস্মিত হবেন, ততটাই আশ্চর্য হবেন এদেশীয় অনেকেই। কিন্তু যেসব সূত্র থেকে এ তথ্যের আহরণ, সেগুলি এতই প্রামাণিক এবং অকাট্য যে এক মুহূর্তের জন্যও তা অস্বীকার করা যায় না।

শিক্ষিত স্বদেশবাসীদের কাছে একথা অজানা নয় যে, বেদের নির্দেশে এক সময়ে গোমেধ নামে এক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু তাঁদের অনুমান, তা ছিল নিছক রূপকানুষ্ঠান, সত্যিসত্যিই গরু বলি হতো না। এরকম ব্যাখ্যায় গোটা ব্যাপারটাকে রহস্যে মুড়ে রাখেন তাঁরা। যাঁরা এ বিষয়ে অদীক্ষিত তাঁদের কাছে তা হয়ে ওঠে দুর্বোধ্য, কিংবা তাঁরা বোঝেন এমনভাবে যে সত্য থেকে অনেক দূরে সরে চলে যান। যখন এ ব্যাপারে অধ্যাপক উইলসন-এর নজর পড়ে, সে সময়ে এই ধাঁধাবাজি এতটাই সফল হয় যে তিনিও দোলাচলে পড়ে যান, যদিও তাঁর মতো পণ্ডিত ও সমালোচকের কাছ থেকে সত্যকে পুরোপুরি আড়াল করা সম্ভব হয়নি। 'মেঘদূতে'র অনুবাদের

একটি টীকায় অধ্যাপক উইলসন বলেন, 'গোমেধ বা অশ্বমেধ প্রাচীনতম হিন্দু আচার অনুষ্ঠানের মামুলি অঙ্গ ছিল। ভাবা হয় যে বলিদান বাস্তবে হতো না, তা রূপক মাত্র; উৎসর্গিত প্রাণীটির কল্পবলিদানের পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হতো। এই অংশের পাঠ থেকে কিন্তু এই ধারণার সমর্থন মেলে না, কেননা গাভীকুলের রক্তের নদীতে রূপান্তর রক্তের ব্যপ্তিই নির্দেশ করে।.....'

বিদ্বান অধ্যাপকের এই যুক্তি কিন্তু এদেশের লোকের মাথায় অনেক আগেই এসেছিল এবং কেউ কেউ এমনও বলেছিলেন যে, রক্তের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে বলির রূপকটিকে সম্পূর্ণ করার জন্য। অন্যরা, যাঁরা প্রাচীন পুঁথির ভাষা সরলভাবে মেনে নিতেই অভ্যস্ত, আবার একই সঙ্গে বেশি সাহসীও, ধরে নেন যে বলিপ্রদত্ত প্রাণীগুলি অনিবার্যভাবে প্রাণ ফিরে পেত সঙ্গে সঙ্গেই, বলিদাতার অলৌকিক শক্তির কল্যাণে।

এই প্রস্তাব সমাজের নিচুতলার ধর্মভীরু মানুষের কাছে যথেষ্ট হলেও তা যুক্তির সীমানার এত দূরে যে এটি স্বচ্ছন্দে পরিহার করতে পারি। কিন্তু নিষ্ঠাবান হিন্দু এ প্রশ্ন করতেই পারেন যে, তাহলে কেন প্রাচীন কবি ঋষি বাল্মীকি তাঁর ভাই মুনি বশিষ্ঠকে অভ্যর্থনা জানাতে মারলেন অনেকগুলি বাছুর শুধু অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য, বিশেষত যেখানে বশিষ্ঠ নিজে একজন স্মৃতিকার এবং বেদের এক প্রধান চরিত্র? এক্ষেত্রে তবে পশুগুলির পুনর্জীবনদান হতে পারে শুধু তাদের মাংস খাওয়ার পরেই। বাল্মীকির বশিষ্ঠকে অভ্যর্থনার এই লক্ষণীয় বিবরণটি আছে 'উত্তররামচরিতে'। .....

আবার বশিষ্ঠকে বাছুর বলি দিতে দেখি বিশ্বামিত্র, জনক, শতানন্দ, এবং অন্যানা ঋষি ও বন্ধুদের আপ্যায়নের সময়ে। 'মহাবীরচরিতে' তিনি প্রলোভন দিচ্ছেন, 'বাছুরটি বলির জন্য প্রস্তুত, ঘি দিয়ে তৈরি হয়েছে খাদ্য। আপনি শ্রোত্রিয় (পন্ডিত), পন্ডিতের বাড়িতে আসুন, আমাদের অনুগ্রহ করুন(উৎসবে যোগ দিয়ে)।'

এই সমস্ত উদাহরণই উদ্ধৃত হয়েছে নানা কাল্পনিক কাহিনী থেকে। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে এসব কাহিনীর লেখকেরা নিশ্চয়ই এমন কোনো বিষয়ের অবতারণা করেন নি যা তাঁদের পাঠকদের মনে বিরূপ অভিঘাত সৃষ্টি করতে পারত।

কোলব্রুক তাঁর ''হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান'' সম্পর্কিত প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে লেখেন, 'মনে হয় প্রাচীন যুগে এই উপলক্ষ্যে (অর্থাৎ অতিথি আপ্যায়নের সময়ে) গোবধের রীতি ছিল এবং সেজন্য অতিথিকে বলা হত গোঘ্ন বা গোহত্যাকারী।'.....

মনু নির্দেশ দিয়েছেন, যে কোনো সময়ই পশুমাংস খাওয়া যেতে পারে, তবে প্রথমে

তার কিছু অংশ দেবতা, পূর্বপুরুষদের আত্মা অথবা অতিথিকে অর্পণ করতে হবে। তিনি বলেছেন, 'পশুমাংস কিনে অথবা অন্যের সাহায্যে সংগ্রহ করে দেবতা বা পূর্বপুরুষদের পূজার পরে যিনি গ্রহণ করেন, তিনি কোন অধর্ম করেন না'(৫।৩২)। কিন্তু মনু খাদ্যের মধ্যে কোথাও গোমাংসের সরাসরি উল্লেখ করেন নি। মানুষের খাদ্যের উপযুক্ত প্রাণীর তালিকায় অবশ্য তিনি লেখেন, পাঁচ আঙ্গুলবিশিষ্ট প্রাণীদের মধ্যে কাঁটাচুয়া ও সজারু, গোধ বা গোসাপ, গন্ডক (গন্ডার), কাছিম, শশক বা খরগোশকেই জ্ঞানী আইনপ্রণেতারা বৈধ খাদ্য বলেছেন আর বলেছেন উট ছাড়া যাবতীয় চতুষ্পদকে, যাদের একসারি দাঁত রয়েছে'(৫।১৮)। এর মধ্যে অবশ্যই গরু পড়ে, কেননা তিনি ভালোভাবেই জানতেন যে গরুর দাঁত একসারি। যদি তাঁর তালিকা থেকে গরুকে বাদ দেওয়ার ইচ্ছেই থাকত, তাহলে নিশ্চয়ই উটের সঙ্গে তারও উলেখ করতেন। অবশ্য এভাবে তাঁর অভিপ্রেত বক্তব্য অনুমান করে যুক্তি খাড়া করার কোনো দরকার নেই। ব্রহ্মচারীর ঘরে ফেরার পরে গোমাংসের ব্যবহার সম্পর্কে তিনি পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, 'কঠোরভাবে কর্তব্য পালনের জন্যে যথাযথভাবে অভিনন্দিত হয়ে এবং তার জন্মদাতা অথবা পিতৃসম শিক্ষকের কাছ থেকে বেদের পুণ্য জ্ঞানলাভের পরে তাকে পুষ্পশোভিত সুন্দর শয্যায় নিয়ে যাও। সেখানে তার পিতা তার বিবাহের আগে মধুপর্ক আচর অনুসারে একটি গরু উপহার দিয়ে তাকে সম্মান প্রদর্শন করবেন'(৩।৩)। পরবর্তী অধ্যায়ে তিনি রাজা ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আপ্যায়ণে মধুপর্ক অর্থাৎ গোমাংসসহ মধুমিশ্রিত খাদ্য দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। (৩।১১৯-২০)।

.....'রামায়ণ' ও 'মহাভারতে'ও গোমেধের উল্লেখ আছে; কিন্তু কোনো বিশদ বর্ণনা নেই অথবা খাদ্য হিসেবে গোমাংস ব্যবহারের কথাও পরিষ্কার করে বলা নেই।

প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্র কিন্তু এ ব্যাপারে অনেক বেশি স্পষ্ট। খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকে রচিত 'চরকসংহিতা'র খাদ্য সম্পর্কিত অধ্যায়ের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, 'গরু, মহিষ বা শুয়োরের মাংস প্রত্যেকদিন খাওয়া অনুচিত'। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, খাদ্য হিসেবে এদের চল ছিল, কিন্তু মাছ, দই আর যবের পিঠের মতোই, দুষ্পাচ্য হওয়ার জন্য প্রাত্যহিক ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে। অন্যত্র ভ্রূণ শক্তিশালী করবার জন্য 'চরকসংহিতা'র লেখক গর্ভবতী মায়েদের গোমাংস খাওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। যেসব রোগে গোমাংস নিষিদ্ধ, সুশ্রুত তাঁর বইয়ের খাদ্যসংক্রান্ত অংশে তাদের উল্লেখ করেছেন। আদিযুগের চিকিৎসাসংক্রান্ত অন্য অনেক বইতেও একই নির্দেশ দেখা যায়। কোথাও কঠোরভাবে বর্জনের আদেশ চোখে পড়ে না। মধ্যযুগের কিছু বইতে খিঁচুনি ও মূর্ছার আক্রমণ কাটিয়ে ওঠার সময় রোগীদের গোমাংসের সুরুয়া খেতে উপদেশ

দেওয়া হয়েছে।

কল্প ও গৃহ্যসূত্রে, এমনকি বেদেও, এ সম্বন্ধে আরও অনেক বিশদ আলোচনা দেখা যায়। এগুলিতে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, গোমাংস খাদ্য হিসেবে প্রচলিত ছিল। কোন্ কোন্ উপলক্ষ্যে গোহত্যা করতে হবে এবং গোমাংস খেতে হবে তারও দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। গোভিল শ্রাদ্ধে গোমাংস ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন।

বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের মূল্যবান আকরগ্রন্থ কৃষ্ণযর্জুবেদ ব্রাহ্মণ (যেখানে প্রাচীন ভারতের ধর্মজীবনের সবচেয়ে গভীর পরিচয় মেলে)-এ এমন অসংখ্য অনুষ্ঠানের উল্লেখ রয়েছে যেগুলিতে গোমাংস দরকার হতো। শুধু তাই নয়, কোন্ দেবতার তুষ্টির জন্য কী ধরনের গরু বলি দিতে হবে, তারও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা রয়েছে এতে, কাম্য ইষ্টি অর্থাৎ বিশেষ প্রার্থনা সহযোগে গৌণ যজ্ঞের মধ্যে বিষ্ণুর উদ্দেশে দিতে হবে একটি বামন বলীবর্দ ..... পূষণের উদ্দেশে একটি কালো গাই ..... রুদ্রের উদ্দেশে একটি লাল গাই... ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানেই দেখা যায় যে, অশ্বমেধের একটি নিয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত পশুর গোত্র, বর্ণ, বয়স ইত্যাদি বিভিন্ন হতে হবে।

রাজসূয়, বাজপেয়, অশ্বমেধ এইসব বড় বড় যজ্ঞের সঙ্গে গোবধ অপরিহার্য ছিল। গোবধ প্রথম দুটির অনিবার্য অঙ্গ ছিল এবং এতে যজমানের এ পৃথিবীতে যেমন সম্পূর্ণ স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার, তেমন ব্রহ্মলোকেও অরণ্যেও গরুটির মতো স্বচ্ছন্দচারিতার প্রতিশ্রুতি থাকত।

''তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে' অশ্বমেধের বিবরণে ঘোড়া, ষাঁড়, গরু, ছাগল, হরিণ, নীলগাই ইত্যাদি ১৮০ রকমের পোষা প্রাণী বলির নির্দেশ আছে।.....

এই 'ব্রাহ্মণে' আরেকটি বড় অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে, যাতে মরুৎদের সন্তুষ্টি ও তাঁদের উপাসকদের মনোরঞ্জনের জন্য অনেক গরু অগ্নিসাৎ করা হতো। একে বলা হতো **পঞ্চশারদীয় সব**। আধুনিক হিন্দুদের কাছে দুর্গা-পূজার যে গুরুত্ব, প্রাচীন ভারতে এই অনুষ্ঠান সেরকমই মর্যাদা পেত। নাম থেকেই অনুমান করা যায় যে, পর পর পাঁচ বছর ধরে এই উৎসব হতো, প্রত্যেকবারেই পাঁচদিন করে। আরম্ভ হতো বিশাখরাশির অমাবস্যায়, অর্থাৎ সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে।

এই উৎসবের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান ছিল সতেরোটি করে পাঁচ বছর বয়সী বামন কুঁজবিহীন ষাঁড় ও তিন বছরের কম বয়সি বামন বলদ। ষাঁড়গুলিকে উৎসর্গ

করা পরে ছেড়ে দেওয়া হতো। বলদগুলি বলি হতো উপযুক্ত মন্ত্রোচ্চারণ অন্যান্য অনুষ্ঠানের পরে। প্রত্যেকদিন হতো তিনটি করে বলি। শেষ দিনে সে বছরের মতো উৎসবের সমাপ্তি উদ্‌যাপন করতে বলি দেওয়া হতো অতিরিক্ত দুটি পশু। সামবেদের 'তান্ড্যব্রাহ্মণে'ও এই উৎসবের উল্লেখ আছে, শুধু তাতে পরপর দু বছর দুটি আলাদা রঙের গরু বলি দিতে বলা হয়েছে। .....বেদের একটি কাহিনী অনুসারে এ যজ্ঞ প্রথম করেন প্রজাপতি। একসময় তাঁর ধন ও পরিজনে সমৃদ্ধিলাভের বাসনা জাগল। 'তিনি পঞ্চশারদীয় দেখতে পেলেন এবং সে দিয়ে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে ধন ও পরিজনে সমৃদ্ধিলাভ করলেন'। 'যিনি মহত্ব পেতে চান, তিনি পঞ্চশারদীয়মতে অর্চনা করুন, তাহলে অবশ্যই মহত্বলাভ করবেন।' অন্যত্র বলা হয়েছে যে, এই অনুষ্ঠানের ফলে সম্পূর্ণ স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা হয় ঋষি কান্দমের কথা।

'আশ্বলায়ন সূত্রে' এমন অনেক যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে যাদের অন্যতম অঙ্গ ছিল গোহত্যা। তাদের মধ্যে 'গৃহ্যসূত্রে' বর্ণিত একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এর নাম ছিল **শূলগব**, অর্থাৎ শূলপক্ক গোমাংস। ....

যিনি এই কৃত্যটি সম্পন্ন করতেন তিনি দীর্ঘ জীবন এবং অতুল ধন, মান, সন্তান-পরিজন ও পুণ্যের অধিকারী হওয়ার নিশ্চয়তা পেতেন। প্রত্যেক গৃহস্থকে জীবনে অন্তত একবার এটি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। .....

ওর পরে যে বিবরণ আমার চোখে পড়েছে তা হলো **গবাময়ন** বা গাভী বলি। একে একাষ্টকও বলা হতো, ...এর অনুষ্ঠানবিধির সঙ্গে সাধারণ পশুবন্ধ-র অনেক মিল আছে .....। মনে হয় এটি মহাপ্লব, দ্বাদশাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের অংশমাত্র ছিল, আলাদা করে পালিত হতো না।

এরকম অন্য অনেক অনুষ্ঠানে গোমাংসের প্রয়োজন হতো। অতিরাত্র অনুষ্ঠানে কাত্যায়ন মরুৎদের উদ্দেশে একটি বন্ধ্যা গাই (বিভিন্ন বর্ণের হলে ভালো হয়) উৎসর্গ করতে বলেছেন আর প্রজাপতির উদ্দেশে বলি দিতে বলেছেন সতেরোটি শিঙের আগা-ছেঁটে দেওয়া পূর্ণাঙ্গ কালো ষাঁড়। সঙ্গে সঙ্গে এমনও বলা আছে যে, এই তিনটি শর্ত একসঙ্গে পূরণ না হলেও ক্ষতি নেই। একটি বা দুটি লক্ষণ থাকলেই চলবে। .....

বিভিন্ন সূত্রকার গরুসহ অন্যান্য পশুবলির ক্ষেত্রে কী কী সাধারণ নিয়ম মানতে হবে তার উল্লেখ করেছেন। ..... আশ্বলায়ন এই সমস্ত নিয়মকে 'পশুকল্প' শিরোনামে লিপিবদ্ধ করেছেন।

এ নিয়মগুলি সহজ হলেও গণ্যমান্য অতিথি আপ্যায়নে সময়ে প্রয়োগের পক্ষে যথেষ্ট জটিল। সে জন্যে অন্য একগুচ্ছ নিয়ম দেওয়া আছে। এই অনুষ্ঠানের নাম **মধুপর্ক**। ঋত্বিক, রাজা, পাত্র, শিক্ষান্তে ঘরে ফেরার উপলক্ষ্যে বেদ-শিক্ষার্থী এক বছর বাদে ঘরে ফেরার পরে আচার্য বা শিক্ষক, শ্বশুর, পিতৃব্য, এবং সাধারণভাবে যে কোনো উচ্চপদাধিকারীর ক্ষেতের এ অনুষ্ঠান অবশ্য-পালনীয় ছিল।

আশ্বলায়ন জোর দিয়ে বলেছেন যে, পশুমাংস ছাড়া মধুপর্ক অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর টীকাকার গর্গনারায়ণ বলেন, 'যখনই একটি পশুকে উৎসর্গ করা হয়, তখন তার মাংসই খাদ্যের প্রয়োজনে লাগে। যদি তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে অন্য যে-কোনোভাবে পশুমাংস জোগাড় করতে হবে। কখনোই তা বাদে ভোজ সম্পন্ন হবে না'।

এক্ষেত্রে তিনি মনুর নির্দেশ মতোই চলেছেন। মনু বলেন যে মানুষ (মধুপর্ক বা অন্য কোনো) উৎসবে পশুমাংস গ্রহণ করেননা , তিনি একুশ জন্ম পশু হয়ে জন্মাবেন। যেহেতু ব্রহ্মা উৎসর্গের উদ্দেশ্যেই প্রাণীর সৃষ্টি করেছেন, সেজন্যে বৈদিক আচারে পশুবলি ক্ষতিকর তো নয়ই, বরঞ্চ পবিত্র যজ্ঞে আহুতির পরে পশু, পাখি, উদ্ভিদ, ও কাছিম সৃষ্টির মানদন্ডে আরও ওপরে ঠাঁই পায়। .....

এখানে উল্লেখ্য যে ব্রহ্মহত্যা, ব্রাহ্মণের সুরাপান, ব্রাহ্মণের স্বর্ণ অপহরণ ও আচার্যের শয্যা কলুষিত করা এবং এই চারটি অপরাধে দোষী ব্যক্তির সঙ্গে এক বছর মেলামেশাকে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ ('মহাপাতক')। আর অন্যায় গোহত্যা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে গৌণ অপরাধ বা 'উপপাতক'-এর মধ্যে। তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত যৎসামান্য।

সুরাপানের দায়ে অভিযুক্ত ব্রাহ্মণ গলিত ধাতু পান করে আত্মহত্যা ছাড়া অন্য কোনোভাবে প্রায়শ্চিত্ত করতে পারেন না, অথচ সম্বর্ত একজন গোঘাতকের ক্ষেত্রে পনেরো দিন যব, দুধ, দই ও মাখনের স্বল্পাহার, একটি ব্রাহ্মণভোজন ও একটি গোদানের বিধান দিয়েই ছেড়ে দিয়েছেন। যাজ্ঞবল্ক্য অবশ্য একটু বেশি কড়া : পঞ্চগব্য - অর্থাৎ পাঁচটি গোজাত -পদার্থ পান, বিনা বাধায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এমন একটি গরুর পশ্চাদানুসরণ, পুরো এক মাস গোয়ালে নিয়মিত শয়ন ও সবশেষে একটি গোদান বা বিনষ্ট প্রাণীর তুল্যমূল্য অর্থদন্ড। অন্যভাবে প্রায়শ্চিত্তের কথাও তিনি বলেছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী স্মৃতিকারদেরও নিজের নিজের বিধান রয়েছে; কিন্তু কোনো নির্দেশই

আত্মহত্যার ধারেকাছেও যায় না।

'নরসিংহীয় প্রয়োগপারিজাতে'র লেখক মধুপর্ক অনুষ্ঠানে গোমাংস খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আশ্বলায়নের নিয়ম পুরোটাই উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু সেইসঙ্গে তিনি 'আদিত্যপুরাণে'র আরোপিত বিধিনিষেধ স্পষ্ট ও নিশ্চিতভাবে বলা নেই, বরং তা অনেকটা ইঙ্গিতে বোঝানো হয়েছে: 'যেহেতু কিছু জ্ঞানী ও প্রাজ্ঞ পুরুষ তা করেন নি এবং ধার্মিক মানুষের কৃতকর্ম বেদের মতই অকাট্য প্রমাণ', অতএব তা করা উচিত নয় — এটাই বলতে চেয়েছিলেন লেখক, কিন্তু অত কথা তিনি বলেন নি। দুটি ক্ষেত্রেই উৎস হলো উপপুরাণ, যেগুলির বয়স এগারোশ-বারোশ বছরের বেশি নয়। অধ্যাপক উইলসন-এর মতে, উপপুরাণগুলি দ্বাদশ শতকের আগে লেখা নয়। যখন দেখি যে বল্লাল সেন 'দানসাগরে' 'বৃহন্নারদীয়'কে প্রামাণিক গ্রন্থ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তবে তা নিশ্চয়ই তখন থেকে চার কি পাঁচ শতক আগে লেখা হয়ে থাকবে। তা হলেও এগুলি এত অসাবধানে সংরক্ষিত ছিল এবং প্রক্ষিপ্ত অংশ এদের মধ্যে এত বেশি যে সব মিলিয়ে এদের প্রামাণিকতা বেশ সন্দেহজনক। সেজন্য খুব গোঁড়া হিন্দুও বেদ, স্মৃতি ও সূত্রের তুলনায় এগুলিকে অনেক নিচে স্থান দেন। 'প্রয়োগপারিজাতে' বলা হয়েছে, শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধে শ্রুতিই প্রাধান্য পাবে। আবার স্মৃতির স্থান পূরাণের ওপরে আর স্মৃতির মধ্যে মনু অগ্রগণ্য।

কল্পসূত্রের প্রত্যক্ষ উৎস বেদ। তাই শাস্ত্র হিসেবে তাদের ভারবত্তা স্মৃতির চেয়ে বেশি। সেজন্যেই স্মৃতিকার পৌলস্ত্যের মতে মনুকে কল্পসূত্রের কাছে নতিস্বীকার করতেই হবে। কোনা আইনকর্তা বা টীকাকার এই মন্তব্যের বিরোধিতা করেন নি। উপপুরাণ পুরাণের তুলনায় গৌণ এবং কখনোই তারা পুরাণকে অতিক্রম করার প্রশ্রয় পায় নি, শ্রুতি ও স্মৃতির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। ওপরের আলোচনা সাপেক্ষে গুরুত্বের ক্রম অনুযায়ী তাহলে এভাবে সাজানো যেতে পারে : প্রথম শ্রুতি বা বেদ, দ্বিতীয় সূত্র, তৃতীয় স্মৃতি, চতুর্থ পুরাণ, পঞ্চম উপপুরাণ। সুতরাং লক্ষ্য করার ব্যাপার যে, একমাত্র এক্ষেত্রে শেষেরটি আগের চারটিকে লঙ্ঘন করতে পারল। 'নির্ণয়সিন্ধু'র রচয়িতা আরও অগভীর যুক্তি দর্শান। অনামা কোনো সূত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি শুরু করেন, 'যে কাজ স্বর্গে যাওয়ার পক্ষে উপযুক্ত নয় এবং যা বিরূপ জনমত সৃষ্টি করে, তা করা অনুচিত'। সুতরাং তাঁর মতে, 'বড় বড় ষাঁড় ও ভেড়া বলি যদিও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের জন্য বিহিত হয়েছে, তবুও তা করা অনুচিত, যেহেতু তা জনসাধারণের কাছে ঘৃণ্য।'

পুনশ্চ, মিত্র ও বরুণের জন্য উৎসর্গিত গরু বা বন্ধ্যা গাই বা প্রথম বাছুর প্রসবের পরে যে গাই বন্ধ্যা হয়ে গেছে, তাদের বলি যদি নিয়মসিদ্ধ, তাও করা অনুচিত, কেননা তা জনসাধারণের অনুভূতির পরিপন্থী। এই যদি ঘটনা হয় তবে প্রশ্ন হলো: বেদের আদেশের বিরুদ্ধে এই অনুভূতি তৈরি হলো কবে থেকে? সবচেয়ে যথার্থ উত্তর পাওয়া যাবে ব্রাহ্মণ্যবাদের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে। বৌদ্ধধর্মের জোরালো ও সফল বলিবিরোধিতার মুখে ব্রাহ্মণেরা বুঝতে পারলেন যে, পশুজীবনের প্রতি শ্রদ্ধার নীতি এতই শক্তিশালী ও জনপ্রিয় যে তাকে পরাস্ত করার চেষ্টা বৃথা। তাই ধীরে ধীরে সবার অলক্ষ্যে এমনভাবে এই তত্ত্বকে তাঁরা আত্মসাৎ করলেন যেন তা তাঁদের শাস্ত্রেরই অঙ্গ। প্রাণজ সৃষ্টির প্রতি দয়াও ক্ষমার উচ্চারণ প্রাধান্য পেতে থাকে, ক্রমশ পশ্চাৎপটে বিলীন হয় প্রাণোৎসর্গের নির্দেশাবলী। এই একই প্রক্রিয়া এখনও হিন্দুধর্মে চলেছে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবে। বৌদ্ধধর্মের উত্থানের সময় হিন্দুরা বৌদ্ধ প্রচারকদের শিক্ষাজনিত পরিবর্তনের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন। সেজন্যে বেদের নির্দেশে হোমবাগ ও অবাধ তামসিক নৈবেদ্যের পরিবর্তে ভক্তি, বিশ্বাস ও প্রেম অনায়াসে ঠাঁই করে নিয়ে পেরেছিল। এরকম মিতাচার প্রথম দিকে নিঃসন্দেহে ছিল ইচ্ছানির্ভর। ক্রমশ তা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, অংশত মানুষের স্বাভাবিক দয়াশীল প্রবৃত্তির বশে, অংশত বৌদ্ধ প্রতিবেশীর অনুভূতির সম্মানে। একই ব্যাপার দেখা যায় বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে — সেখানে মুসলিমরা তাঁদের হিন্দু ভাইদের প্রতি সহমর্মিতায় গোমাংস পরিহার করেন। এজন্যেই জনসাধারণের রীতিনীতি ও আবেগকে বেদের মতোই অভ্রান্ত সত্য ঘোষণা করা ও বর্তমান যুগে বলি নিষিদ্ধ বলে প্রতিষ্ঠা করা শাস্ত্রকারদের পক্ষে সহজ হয়। একবার যখন তা করা সম্ভব হলো, তখন পরিবর্তনও হলো সম্পূর্ণ। এককথায়

রানাডে, গান্ধী ও জিন্না

বি.আর. আম্বেদকর

ভাষা ন্তর ঃ উৎসা আহমেদ

প্রয়াত বিচারপতি মহাদেব গোবিন্দ রানাড়ের ১০১তম জন্মদিন ১৯৪০ সালের ১৮ জানুয়ারি উদ্‌যাপনের প্রস্তাব করেছেন পুনার 'ডেকান সভা' এবং আমাকে এই উপলক্ষে ভাষণ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমন্ত্রণ গ্রহণ করার খুব ইচ্ছা আমার ছিল না। কারণ আমি জানি, রানাড়ের সম্বন্ধে আলোচনার প্রসঙ্গে উদ্ভূত সামাজিক রাজনৈতিক সমস্যার ওপর আমার দৃষ্টিভঙ্গি শ্রোতাদের খুব পছন্দসই হবে না। এমন কী, 'ডেকান সভা'র সদস্যদেরও ভাল লাগবে না। শেষে অবশ্য আমি আমন্ত্রণ গ্রহণ করি। বক্তৃতা দেওয়ার সময় তা প্রকাশের ইচ্ছা ছিল না। মহান ব্যক্তিদের জন্ম-জয়ন্তীতে প্রদত্ত ভাষণ সাধারণত একটু উপলক্ষকেন্দ্রিক হয়। এগুলির স্থায়ী মূল্য কম। আমার বক্তৃতাও এর ব্যতিক্রম বলে মনে হয় না। কিন্তু আমার কিছু নাছোড়বান্দা বন্ধু এটি প্রকাশের জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। এ-ব্যাপারে আমি ছিলাম অনাগ্রহী। ভাষণটি এর মধ্যেই যত প্রচার পেয়েছে, তাতেই আমি সন্তুষ্ট। আমি বেশি কিছু চাই না। তা সত্ত্বেও যদি কেউ মনে করেন, যে, এটা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবার মত নয়, তাহলে তাদের আমি হতাশ করতে চাই না।

লিখিত আকারের এই বক্তৃতা মূল ভাষণ থেকে দুটি ক্ষেত্রে আলাদা। অনুষ্ঠানের সময় ভাষণটি খুবই দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছিল। সময়াভাবের জন্য অংশ-১০ পাঠ করিনি। এটা বাদ দিয়েই সময় লেগেছিল দেড় ঘন্টা। এই একটা পার্থক্য। অন্যটা হচ্ছে, ফুলের সাথে রানাড়ের তুনলামূলক অংশ-৮ যা এখানে বাদ দেওয়া হয়েছে। বাদ দেবার কারণ দুটি। প্রথমত, তুলনামূলক আলোচনার যথেষ্ট পূর্ণাঙ্গ বিস্তৃতি ছিল না, যাতে দুজনের প্রতিই সুবিচার করা হয়। দ্বিতীয়ত, সহায়ক তথ্যাদির অভাবে কিছু অংশ বাদ দিতে বাধ্য হই।

ভাষণটি প্রকাশিত হচ্ছে বিচিত্র পরিস্থিতিতে। সাধারণত প্রকাশের পরে আলোচনা হয়। এ ক্ষেত্রে হয়েছে বিপরীত। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হল, ভাষণটি তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে তা ছিল প্রকাশকদের মাথাব্যথার কারণ। আমি খুশি যে, তবু প্রকাশকরা জেনেশুনেই এই ঝুঁকি নিয়েছেন। এ নিয়ে বেশি কিছু বলার নেই। বক্তৃতায়

তাৎক্ষণিক মূল্যের চেয়েও বেশি কিছু ছিল, বন্ধুদের এই বক্তব্যই যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে। পত্র-পত্রিকাগুলি এই বক্তৃতার নিন্দা করায় আমি বিন্দুমাত্র বিচলিত নই। এই নিন্দার ভিত্তিটা কী? কারা করেছেন?

আমার নিন্দিত হওয়ার কারণ হল আমি নাকি ভারতীয় রাজনীতিতে বর্তমান বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টির জন্য গান্ধী ও জিন্নার সমালোচনা করেছি এবং তা করতে গিয়ে তাঁদের প্রতি ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছি। এই অভিযোগের উত্তরে বলতে চাই, আমি বরাবরই তাঁদের সমালোচক এবং তাই থাকব। আমার ভুল হতেও পারে, কিন্তু আমি সবসময়েই মনে করি যে, অন্যের নির্দেশ ও নেতৃত্ব মেনে নেওয়া অথবা চুপ করে বসে থেকে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটতে দেওয়ার চেয়ে ভুল করা অনেক ভাল। আমি ঘৃণার বশবর্তী হয়ে কাজ করছি বলে যাঁরা আমায় অভিযুক্ত করেন, তাঁরা দুটি ব্যাপার ভুলে যান। প্রথমত, এই ঘৃণার অভিযোগ কোনও ব্যক্তি-স্বার্থ প্রণোদিত নয়। আমি যদি তাঁদের বিরোধী হই, তার কারণ আমি একটা ফয়সালা চাই। যে রকমই হোক একটা ফয়সালা আমি চাই এবং একটা আদর্শ মীমাংসার জন্য অপেক্ষা করতে প্রস্তুত নই। আমি সেই ব্যক্তিকেও বরদাস্ত করতে পারি না যাঁর সম্মতি ও ইচ্ছার ওপর সিদ্ধান্ত নেওয়া নির্ভর করছে এবং মোঘল সম্রাটের মতো তিনি সব কিছু ঠিকঠাক করে দেবেন। দ্বিতীয়ত, ভালবাসা ও ঘৃণা করার মতো শক্তি না থাকলে কোনও ব্যক্তি মহান নীতি রূপায়ণের সহায়ক হতে পারে না। আদর্শের জন্য লড়াইও করতে পারে না, তার পক্ষে নিজের যুগের ওপর প্রভাব বিস্তারের আশা করাও সম্ভব নয়। অবিচার, অত্যাচার, প্রতারণা, আড়ম্বর, ও আত্মম্ভরিতাকে আমি ঘৃণা করি, এবং এইসব দোষে দুষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি আমার তীব্র ঘৃণা রয়েছে। আমার সমালোচকদের উদ্দেশে বলতে চাই, এই ঘৃণার আবেগকে আমি আসল শক্তি বলে মনে করি। উদ্দেশ্যের প্রতি আমার বিশ্বাস ও ভালবাসার প্রতিফলন হল এই ঘৃণা এবং তার জন্য আমি লজ্জিত নই। **এই কারণেই শ্রী গান্ধী ও শ্রী জিন্নার সমালোচনার জন্য আমি মার্জনাপ্রার্থী নই, এই দুই ব্যক্তি ভারতের রাজনৈতিক প্রগতি রুদ্ধ করেছেন।**

কংগ্রেসের পত্র-পত্রিকাগুলিই আমাকে নিন্দা করছে। এদের আমি চিনি। এদের সমালোচনার ওপর আমি গুরুত্ব দিই না। আমার যুক্তি ওরা অস্বীকার করতে পারেনি। ওরা শুধু জানে, আমি যা কিছু করি তার নিন্দা ও গালাগাল করতে এবং আমার বক্তব্যের ভুল রিপোর্ট, মিথ্যা বর্ণনা ও বিকৃত করে তুলে ধরতে। আমার সব কাজই

কংগ্রেসের পত্র-পত্রিকার না-পসন্দ। আমার মতে ওদের এই বৈরিতা কিছু অনুপযুক্ত নয়। অস্পৃশ্যদের প্রতি হিন্দুদের ঘৃণার অভিব্যক্তি হিসাবে এর বিচার করতে হবে। এঁদের বিদ্বেষ যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে গেছে তার প্রমাণ, যে জিন্না গত ক'বছর ধরে কংগ্রেসের আক্রমণের লক্ষবস্তু ছিলেন তাঁকে সমালোচনার করায় কংগ্রেসের পত্র-পত্রিকাগুলি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট।

কংগ্রেসের পত্রিকাগুলি যত নোংরাভাবে ও তীব্র ভাষায় আমার ওপর নিন্দা বর্ষণ ক ক না কেন, আমার কর্তব্যে আমি অবিচল থাকব। আমি কোনও মূর্তির পূজারী নই। বরং সেগুলি ভাঙ্গায় বিশ্বাসী। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলছি, গান্ধী ও জিন্নাকে যদিও আমি ঘৃণা করি না তাঁদের অবশ্য আমি অপছন্দ করি। একজন সাচ্চা জাতীয়তাবাদীর এটাই যথার্থ ধর্ম। আমার আশা, আমার দেশবাসী একদিন বুঝবে যে, মানুষের চেয়ে বড় দেশ। গান্ধী ও জিন্নার ভজনা এবং দেশ সেবা, দুটি সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। এমন কী পরস্পর-বিরোধীও হতে পারে।

পেরিয়ার এবং তাঁর রুশ দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয়

সুশা ন্ত সরকার

পেরিয়ার ই.ভি.রামস্বামী (১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯৭ - ২৪ ডিসেম্বর ১৯৪৩) দক্ষিণ ভারতে সংগ্রামী নেতাদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তিনি ইরোড শহরে একটি স্বচ্ছল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামাতা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ছিলেন এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রচুর অর্থব্যয় করতেন। কিশোর বয়সেই পেরিয়ার নিজেকে এইসব বিষয়ে জড়িত করেননি। তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ অসম্পূর্ণ রাখলেও বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা এবং দরিদ্র নিরক্ষরদের সাহচর্য ধর্মান্ধতা এবং সামাজিক বৈষম্য সম্পর্কেত যথেষ্ট ওয়াকিবহাল এবং জনপ্রিয় সুবাগ্মী হয়ে ওঠেন। যৌবনে তিনি কংগ্রেস দলে যোগ দিলেও ব্রিটিশ শাসনের বিরোধী অবস্থান বজায়রেখেও ভারতীয় সমাজে জাতিভেদ বিশেষতঃ অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে হেতুবাদী, আত্মমর্যাদার আন্দোলনকে অগ্রাধিকার দেন। তাঁর ভাবনায় হেতুবাদ চিন্তাজগতের প্রক্রিয়ায় সীমাবদ্ধ ছিল উপরন্তু জাতিভেদগত বৈষম্য এবং নিরীশ্বরবাদ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্য নিরলস প্রচারের হাতিয়ার ছিল।

সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণের পরেই তিনি তামিল পত্রিকা কৌদী আরসু তে তাঁর ভ্রমণ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাটি সামান্য সংক্ষিপ্তাকারে অনুদিত হল।

''আমি ১৯৩১ সালের ২৩ নভেম্বর আমরা বিদেশ সফর শুরু করি। আমার ৫জন বন্ধু সহযাত্রী ছিলেন। যদিও এই সফরকে বিশ্বভ্রমণ বলে প্রচারিত হয় তবুও আমার প্রধান আকর্ষণীয় ভ্রমণস্থান ছিল সোভিয়েত রাশিয়ায়। আমি অক্টোবর বিপ্লব সম্পর্কে আগ্রহী ছিলাম এবং বিপ্লবের পরে সোভিয়েত রাশিয়ার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে চাক্ষুস ধারণা সংগ্রহে ইচ্ছুক ছিলাম।

আমরা বিভিন্ন দেশ ঘুরে ১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৩২ মস্কো শহরে পৌঁছলাম।

মস্কোতে আমাদের একটি ভালো হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। পরের দিন মস্কো শহরের ৬১ নং মালায়নকেট স্কোয়ারে সোভিয়েত সরকারের বিদেশী সংস্কৃতি দপ্তরে আমাদের নাম নথিভুক্ত করা হয়। পরের দিন আমাদের লেনিনের সমাধিস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়। সংগে অনুবাদক থাকার ফলে লেনিন নামাংকিত মিউজিয়মটি ঘুরে দেখা এবং সবকিছু বোঝা আমাদের সহজ হয়েছিল। লেনিনের জীবনের নানা ঘটনা এবং তাঁর রচিত নানাভাষায় অনুদিত পুস্তক, অংকিত চিত্র এবং ফটো আকারে দেওয়ালে ধারাবাহিকভাবে সাজানো ছিল।

পরের দিন একটি তাঁতকলে ভ্রমণকালে আমি একজন নারী শ্রমিককে বিপ্লবের আগে এবং পরে পারিশ্রমিকের কোন তফাৎ ঘটেছে কিনা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি জানালেন অক্টোবর বিপ্লবের আগে তিনি দৈনিক ১১ ঘণ্টা কাজের বিনিময়ে মাসান্তে ২০ রুবল মাইনে পেতেন। সোভিয়েত বিপ্লবের পরে দৈনিক ৭ ঘণ্টা শ্রমের বিনিময়ে ১১০ রুবল রোজগার করেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে সোভিয়েত রাশিয়ায় মেয়েদের তুলনামূলকভাবে কম কায়িক শ্রমের কাজ দেওয়া হয় এবং পুরুষদের তুলনায় পারিশ্রমিকের ফারাক বেশি নয়। মাসান্তে একজন মহিলা সর্বাধিক ২০০ রুবল রোজগার করেন যেখানে পুরুষ শ্রমিক পান সর্বাধিক ২২০ রুবল। [বর্তমানে ভারতীয় হিসাবে ১ রুবল = ২.৫০ টাকা] আমি ভারতে থাকাকালীন মহিলাদের গৃহশ্রম পুরুষদের সাথে ভাগাভাগি করে গৃহের বাহিরের জগত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে জড়িত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করতাম। সোভিয়েত রাশিয়ায় সেই জিনিষ আমরা স্বচক্ষে দেখলাম। পরে আমাদের একটি বিরাট রন্ধনশালায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে একটি কারখানার ১২হাজার শ্রমিকের জন্য কম মূল্যে খাবার সরবরাহ করা হয়। উপরোক্ত রন্ধনশালাটি যান্ত্রিকভাবে পরিচালিত, যেখানে শারীরিক শ্রম তুলনামূলকভাবে কম লাগে এবং নানা ধরনের খাদ্য তৈরী হয়। এক কাপ স্যুপ, পুডিংস, বড় কেক, দু পিস বড় রুটির মোট দাম আধ রুবল। এ ধরনের বড় রন্ধনশালার সংখ্যা মস্কো শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ৮টি।

প্রত্যেকটি রন্ধনশালায় খাবার, সব্জি, ফলের গুণগত মান স্বাস্থ্যসম্মত কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য বেশ কয়েকজন দক্ষ স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ আছেন। প্রত্যেকটি কারখানার ক্যান্টিন হলটি যথেষ্ট বৃহৎ। পরে আমরা একটি রেডক্রস সভায় উপস্থিত হবার আমন্ত্রণ পাই। বক্তাগন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কুফল এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং কমিউন পদ্ধতি

সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন এবং শ্রোতাদের (যাদের বেশীরভাগ শ্রমিক) প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন।

মস্কো শহরের গ্রিটিংক হোটেলে থাকাকালীন আমাদের নিরীশ্বরাদী সমিতির দফতরে নিয়ে যাওয়া হয়। ওখানে অন্য কয়েকটি দেশের মুক্তমনাগণও নিমন্ত্রিত ছিলেন। সমিতির অন্যতম নেতা স্তোফানিক জানালেন যে সমিতির মধ্যবয়স্ক সদস্যগণ ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের আগে আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকতে থাকতেই হেতুবাদের প্রতি আকর্ষিত হন। তুলনামূলকভাবে তরুণ প্রজন্ম বিজ্ঞানচর্চা এবং দৈনন্দিন জীবনচর্যার মাধ্যমে মুক্তমনা হচ্ছেন। আমাদের সাথে লতোনভ নামে একজন বস্তুবাদীর আলাপ করানো হল. তিনি বিনয় এবং রসিকতাসহ জানালেন যে তাঁদের প্রচেষ্টায় তিনি সারে সাত হাজার পাদ্রীকে প্রাথমিক পর্যায়ে কর্মহীন এবং পরবর্তীকালে অন্য কর্মে নিয়োজিত করার ব্যবস্থা করেছেন। ওদেশের বন্ধুরা মনে করেন যে কমিউনিস্ট পার্টি করতে হলে নিরীশ্বরবাদী হতেই হবে এটা পূর্বশর্ত নয়, তবে কোনও ভাববাদী দীর্ঘকাল কমিউনিস্ট পার্টিতে টিকে থাকতে পারে না কারণ সাম্যবাদী দর্শন বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে রচিত। আমাদের সৈনিকদের বিদ্যালয়ে, শ্রমিক সংগঠনের দপ্তরে , বিচার শালা এবং কারাগারে ঘুরে দেখার সুযোগ করে দেওয়া হয়।

আমাদের সৈনিকদের বিদ্যালয়ে একজন সৈনিক সম্পূর্ণ নিরক্ষর অবস্থান থেকে এক মহিলা শিক্ষকের সহায়তায় কিভাবে যথেষ্ট শিক্ষিত হয়েছেন তার বর্ণনা দিলেন। মহিলাদের অগ্রগতি যে কি পরিমাণে এদেশে হয়েছে তা এক বিস্ময়কর পর্ব। শ্রমিক সংগঠনের দপ্তরে প্রতিদিন বহু শ্রমিক, আইনজীবি, সংগঠক নানা কাজে উপস্থিত থাকেন। সংগঠন প্রতি তিন মাসে ১০ হাজার শ্রমিককে প্রথাগত শিক্ষার বাইরের বিষয় নিয়ে চর্চার মাধ্যমে সাংস্কৃতিকভাবে উন্নত স্তরে তোলার কর্মসূচী নিয়েছে।

জনমত বা ভোট জাতীয় পদ্ধতিতে বিচারক নির্বাচিত হয়। বিচারক এবং জুরীদের সমানাধিকার রাখা হয়। কোন রায় অভিযোগকারী বা অভিযুক্তর অপছন্দের হলে ১ সপ্তাহের মধ্যে উচ্চ আদালতে শুনানী শুরু হয়।

জেলখানায় প্রতিজন বন্দীকে খাট-বিছানা, পোষাক, গরমজল, বই সহ বইয়ের তাক, রেডিও এবং দিনে ৩বার যথেষ্ট পরিমাণে খাবার দেওয়া হয়।

প্রত্যেক বন্দীকে কোনও না কোনও হালকা কাজের সাথে যুক্ত করা হয়। গ্রন্থাগার

ছাড়াও খেলার মাঠ, নাট্যশালা এবং সিনেমা হল জেলখানার মধ্যে আছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে থাকাকালীন ১লা মে আমার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। অত্যন্ত মর্যাদার সাথে মে দিবস সোভিয়েত ইউনিয়নে পালিত হয়। বিদেশী অতিথি হিসেবে আমাদেরও ঐদিন বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়। কয়েকলক্ষ মানুষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ১৭মে ১৯৩২ সালে আমি রাশিয়া হইতে অন্য দেশে যাই।

সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ঘুরে আসার পর আমার চিন্তাভাবনার এক নূতন দিক খুলে গেল। আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে আমি এখন প্রকাশ্য সভায় কমরেডস এবং বন্ধুগণ সম্বোধন করে বক্তব্য শুরু করি। এমনকি আমি সম্প্রতি আমার নিকটজনের সন্তানদের নামকরণের জন্য আমার কাছে এলে আমি তাদের লেনিন, স্তালিন, গর্কি, সলোকভ এমনকি মস্কো নামকরণ করতে বলি। সর্বহারা জনগণের হাতে যখন সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রমিকশ্রেণীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হল এবং আমি তার সুফলের কিছু নিদর্শন নিজের চোখে দেখে এলাম, তা লিখিতভাবে জানানো এবং বিভিন্ন সভায় বলা ছাড়া

পেরিয়ার ই.ভি. রামস্বামীর সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি

— ১৮৯৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ই.ভি. রামস্বামী তামিলনাড়ুর এড়ড শহরে জন্মগ্রহণ করেন। দশ বছর বয়সে তিনি পড়াশুনা শুরু করেন।

— ১৯০২ সালে তিনি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী এবং বিভিন্ন ধর্মীয়গোষ্ঠীর মধ্য বিবাহ প্রথা চালু করার ব্যাপারে উদ্যোগী হন।

১৯০৪ সালে তিনি তাঁর নিজস্ব শহর ছেড়ে সত্য এবং শান্তির জন্য কলিকাতা, বেনারসসহ ভারতের বহুস্থানে ভ্রমণ করেন

— ১৯০৭ সালে তিনি ফিরে আসেনএবং বুঝতে পারেন যে সংসার ত্যাগ করে সমাজের মুক্তি আনা যায় না। তিনি সেই সময় প্লেগ রোগে আক্রান্ত মানুষের সেবা করতে শুরু করেন। ১৯০৯ সালে সমাজে বিধবা বিবাহের ব্যাপারে সমকালীন তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি নিজের বিধবা ভ্রাতুষ্পুত্রীকে পুনরায় বিবাহ দিলেন।

—১৯১৭ সালে তিনি এড়ড মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি সম্মানিত মেজিস্ট্রেট পদেও নিযুক্ত হন এবং প্রায় ১৯ বছর এই দায়িত্বে ছিলেন।

— ১৯২০ সালে তিনি ২৯টি গুরুত্বপূর্ণ পদ ত্যাগ করেন এবং গান্ধীজির আহ্বানে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

— ১৯২১ সালে তিনি মদ্যপানের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনে তাঁর বোন এবং স্ত্রীও যোগদান করেন।

— ১৯২২ সালে তিনি কংগ্রেসের সম্মেলনে মনুস্মৃতি এবং রামায়ণকে জ্বালিয়ে দেওয়ার কথা বললেন। ঐ বছরই তিনি গ্রেপ্তার হন এবং তাঁর কারাদণ্ড হয়।

— ১৯২৪ সালে তিনি বিখ্যাত ভাইকাশ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন এবং গ্রেপ্তারর বরণ করেন। ঐ আন্দোলনের মূল বিষয়বস্তু ছিল অস্পৃশ্যতা। তৎকালীন কেরালাতে ইজাভা গোষ্ঠী ছিল অস্পৃশ্য। এই অস্পৃশ্য সম্প্রদায়কে রাস্তায় কোন কাজ করতে দেওয়া হত না। বিশেষ করে হিন্দু মন্দিরের সামনে দিয়ে এই সম্প্রদায় চলাফেরাই করতে পারত না। তিনি এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

— ১৯২৫ সালে তিনি ‘কৌদী আরসু’ নামে একটি সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন প্রকাশ

করেন, সেখানে তিনি নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের সমস্যা ও দুঃখ দুর্দশার কথা লিখতেন।

— ১৯২৫ সালে তিনি সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষণের নীতিকে কংগ্রেস কর্তৃক বিরোধিতার জন্য কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি ঐ বছরই গান্ধির সঙ্গে দেখা করেন এবং কংগ্রেস দলে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাব সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন।

— ১৯২৮ সালে দক্ষিণ রেলওয়ে কর্মচারীদের ধর্মঘট সংগঠিত করে পেরিয়ার গ্রেপ্তার বরণ করেন। ঐ বছরই তিনি 'Revoli' নামে একটি দৈনিকে ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশ করেন।

— ১৯২৯ সালে তিনি সস্ত্রীক মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুর পরিদর্শন করেন।

— ১৯৩০ সালে তিনি পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে Garbachi (গার্বাচি) নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

— ১৯৩১ সালে তিনি ইউরোপ সফর করেন। বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকা, ইজিপ্ট, গ্রীস, টার্কি, **রাশিয়া**, ইংল্যাণ্ড, জার্মানি, স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স, ইতালী, শ্রীলঙ্কা সফর করেন।

— ১৯৩৩ সালে তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ প্রথা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

— ১৯৩৩ সালে তিনি Paguthariya নামে একটি তামিল সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন।

— ১৯৩৪ সালে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে একটি সম্পদকীয় লিখে তিনি গ্রেপ্তার বরণ করেন।

— ১৯৩৫ সালে তিনি Justice Party কে সমর্থন করেন এবং মাদ্রাজ থেকে Viduthalai নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন।

— ১৯৩৬ সালে তাঁর নামের সঙ্গে Periyar যুক্ত করেন এক মহিলা সমাবেশের মধ্য দিয়ে।

— ১৯৩৮ সালে তিনি যখন জেলে তখন Justice Party -এর সভাপতি নির্বাচিত হন।

—১৯৪০ সালে আম্বেদকর ও জিন্নার সঙ্গে দেখা করেন।

— ১৯৪২ সালে 'Dravidnadu' কে একটি পৃথক রাজ্য হিসাবে দাবী তোলেন।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতাকে তামিলনাড়ুর দুঃখের দিন বলে অভিহিত করেন।

— ১৯৪৯ সালে তিনি একটি পৃথক রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ঐ দলের নাম

ছিল Dravidan Kazhagam

— ১৯৫০ সালে তাঁর Golden Treatise গ্রন্থের জন্য তিনি গ্রেপ্তার বরণ করেন।

— ১৯৫১ সালে হাইকোর্ট এবং সুপ্রীম কোর্ট অব্রাহ্মণদের সংরক্ষণের ব্যাপারে বাধাদান করেন সংবিধানের ১৫(১) নং ধারা অনুসারে। পেরিয়ার আন্দোলনে শুরু করেন তখন সংবিধান সংশোধন করে ১৫(৪) অব্রাহ্মণদের ব্যাপারে সংরক্ষণ প্রথা রাখা হয়।

— ১৯৫৩ সালে প্রকাশ্যে গণপতির মূর্তি ভাঙেন এবং প্রমাণ করেন সত্যতা এই Idol-এর মধ্যে নেই।

— ১৯৫৮ সালে ব্রাহ্মণ হোটেলের সাইনবোর্ড খোলার আন্দোলন করেন। রাম মনোহর লোহিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

— ১৯৫৭ সালে সারা তামিলনাড়ুতে রামায়ণ পুড়িয়ে ফেলা হয়।

— ১৯৫৯ সালে উত্তর প্রদেশ, কানপুর, দিল্লী, এলাহাবাদে মিটিং করেন।

— ১৯৬৯ জাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করেন এবং মন্দিরে ঢোকার জন্য আন্দোলন করেন।

— ১৯৭০ সালে যুক্তিবাদী সমিতি গঠন করেন।

— ১৯৭৩ সালে এই মণীষীর জীবনাবসান ঘটে।

দলিত-মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে

নকুল মল্লিক

বাবাসাহেব আম্বেদকর বলেছেন তাঁর তিনজন গুরু — বুদ্ধ, কবির ও ফুলে। গুরু অর্থে আদর্শ পুরুষ। মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেনি। মহাত্মা ফুলের তিরোভাবের পর বাবাসাহেবের আবির্ভাব ঘটলেও তিনি ফুলেকে জীবনের পথপ্রদর্শক মনে করেছেন। তাঁর অসমাপ্ত কর্মধারা সমাপ্ত করার দায়ভার মাথায় তুলে নিয়েছিলেন বাবাসাহেব ডক্টর ভীমরাও রামজী আম্বেদকর।

মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলার কাতগান গ্রামের এক মালী পরিবারে ১৮২৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি জ্যোতিরাও ফুলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- গোবিন্দরাও। মাত্র একবৎসর বয়সে জ্যোতির মাতা চিমনবাঈ-এর মৃত্যু হয়। শৈশবে পিতার তত্ত্বাবধানে গ্রামের পাঠশালায় জ্যোতিরাও-এর শিক্ষা শুরু হয়। তিনি মেধাবী ছিলেন, লেখাপড়ায় গভীর মনোযোগ দিলেন। গোবিন্দরাও-এর ফুলের দোকানের এক উচ্চবর্ণের কর্মচারী তাঁকে দুর্বুদ্ধি দিল — তোমার ছেলেকে পাঠশালায় পাঠিয়ে কী হবে? লেখাপড়া শেখালে কী হবে? বাবুগিরি দেবে, তোমার কাজে সাহায্য করবে না। অধার্মিক হবে; ওকে না পড়িয়ে চাষের কাজে লাগাও।

স্কুলের ব্রাহ্মণ শিক্ষকগণও সুকৌশলে অব্রাহ্মণ ছাত্রদের বিদ্যাশিক্ষায় নিরুৎসাহিত করতেন কারণ তাঁদের ধারণা ছিল নিম্নশ্রেণীর মানুষ যদি শিক্ষিত হয় তবে তারা তাঁদের ভদ্রোচিত কাজকর্মের ভাগীদার হবে, কৃষি বা সেবামূলক কর্মে লোক পাওয়া যাবে না। নিজের কর্মচারীর বারংবার পীড়াপীড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে গোবিন্দরাও তার বুদ্ধিমন্ত পুত্র জ্যোতিরাওকে একদিন স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনলেন। জ্যোতি পিতৃপেশায় আত্মনিয়োগ করলেন।

প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী গোবিন্দরাও তখন ছেলের বিবাহ দিতে মনস্থির করলেন। ১৮৪০ সালে সাতার জেলার নায়গন গ্রামের খন্ডোজি পাতিলের মাত্র আট বৎসর বয়সের কন্যা সাবিত্রীর সঙ্গে তের বৎসর বয়সের জ্যোতির বিবাহ হল।

বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ হলেও জ্যোতির লেখাপড়ায় উৎসাহ নষ্ট হয়নি। সারাদিন

মাঠে ও বাগানে কাজ করার পর সন্ধ্যায় প্রদীপের আলোতে তিনি আপনমনে পড়াশুনা করতেন। লেখপড়ায় তাঁর দুর্দমনীয় উৎসাহ ও আকাঙ্খা দেখে দুজন বিদ্যোৎসাহি প্রতিবেশী গফফর বাইগ মুন্সী ও মিস্টার লিজিট একদিন গোবিন্দরাওকে বললেন — তোমার ছেলের লেখাপড়ায় এত আগ্রহ তাকে স্কুল ছাড়ালে কেন? ওকে আবার স্কুলে পাঠাও। লেখাপড়া শিখলে ও একদিন তোমার বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে।

তাঁদের হিতোপদেশে গোবিন্দরাও-এর ভুল ভাঙল। অনেক আশা আকাঙ্খা নিয়ে ১৮৪১ সালে তিনি আবার জ্যোতিরাওকে স্কুলে পাঠালেন। ১৮৪৭ সালে কুড়ি বৎসর বয়সে তিনি ইংলিশ স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করলেন।

শিক্ষালাভের পর জ্যোতিরাও সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি মহারাষ্ট্রে সমাজ-সংস্কারের ঘণ্টাধ্বনি বাজালেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র একুশ। তিনি নারীজাতিকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে মনস্থির করলেন। জ্যোতিরাও প্রথমে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করলেন। নিম্নশ্রেণীর মাহার, মং, চম্ভর, যারা সমাজের একটা বিরাট অংশ অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে আছে, তাদের শিক্ষাদানের জন্য স্কুল খোলা হল। ১৮৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বালিকা বিদ্যালয়ে নিজের স্ত্রীকে, যাঁকে বাড়ীতে বসে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করলেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে স্কুলে পড়াতে যেতেন। সাবিত্রীবাঈ ভারতের প্রথম নারীশিক্ষিকা। ব্রাহ্মণ সমাজের চক্ষুশূল হলেন জ্যোতিরাও। তাঁকে সমাজসেবা থেকে বিরত করতে উচ্চবর্ণের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁর বাবাকে গিয়ে ধমক দিলেন, ভয় দেখালেন, সমাজচ্যুত করার হুমকি দিলেন।

ধর্মভীরু দরিদ্র মালী গোবিন্দরাও এই সামাজিক চাপের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। ক্ষোভে, দুঃখে পুত্রকে ডেকে বললেন — তুমি স্কুল ত্যাগ কর। জ্যোতিরাও সবিনয়ে বললেন — বাবা, আমি সমাজের কল্যাণকর ব্রত গ্রহণ করেছি। ওরা আপনাকে ভুল বুঝিয়েছে। আমার জীবন বিপন্ন হলেও এই মহৎব্রত থেকে একচুলও বিচ্যুত হবো না। আপনি যদি দুঃখ পান, তবে আমি স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ করে চলে যাব।

পিতা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন— তোমার স্ত্রীকেও সঙ্গে নিয়ে যাও। জ্যোতিরাও-এর স্ত্রী সাবিত্রীবাঈ সকল প্রকার অপবাদ, অপমান, তিরস্কার মাথায় নিয়ে স্বামীর অনুগামিনী হলেন। পিতার আশীর্বাদ ভিক্ষা চেয়ে স্বামী-স্ত্রী দুজনে হাসিমুখে বিদায় নিলেন।

বাড়ী ছেড়ে দূরে গিয়ে জীবিকার জন্য ব্যবসায় মনোনিবেশ করলেন জ্যোতিরাও। তাঁর স্ত্রী হাতের কাজ করেন। কাজের ফাঁকে জ্যোতিরাও ১৮৫১ সালে ভেটলপেটে

দুটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মাহার ও মংদের শিক্ষার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করে তিনি শিক্ষকতাও করতেন।

নিম্নসমাজ ও নারীজাতির শিক্ষার আন্দোলনের জন্য সমগ্র মহারাষ্ট্রে জ্যোতিরাও-এর নাম ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম, ভালোবাসা ও নিষ্ঠার জন্য তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুল, সরকারী স্কুল অপেক্ষা পড়াশুনায় অধিকতর সুনাম অর্জন করল।

শূদ্রদের দাসত্ব মোচনের জন্য তাদের কুসংস্কারে আঘাত হানতে জ্যোতিরাও ১৮৫৫ সালে ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রগ্রন্থের ফাঁকিবাজি উল্লেখ করে 'তৃতীয় রত্ন' নামে একখানি নাটক রচনা করেন। এই গ্রন্থে ঈশ্বরের প্রতি অন্ধবিশ্বাসের সুযোগে ব্রাহ্মণরা কীভাবে সাধারণ মানুষকে শোষণ করে তার দৃষ্টান্ত আছে। সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে বিধবাদের অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ও বেদনায় জ্যোতিরাও বিচলিত হয়ে উঠলেন। একটি অনাথআশ্রম খুললেন, যেখানে গর্ভবতী বিধবারা গোপনে প্রসব করতে পারেন।

জ্যোতিরাও নিঃসন্তান থাকায় তাঁর মৃত্যু পথযাত্রী পিতা, পুত্রকে দ্বিতীয়বার বিবাহের জন্য অনুরোধ জানালেন। জ্যোতিরাও অসম্মতি প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন — সন্তান হচ্ছে না আমার দোষে না আমার স্ত্রীর দোষে, কে বলতে পারে? যদি আমার দোষে হয় তাহলে আর একজন স্বামী গ্রহণের অধিকার আমার স্ত্রীর থাকবে না কেন? তাঁর পিতা দুঃসহ মর্মবেদনায় ১৮৬৮ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

জীবিকার জন্য যদিও জ্যোতিরাও কন্ট্রাক্টরী কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তবু অবসর সময়ে ও রাত্রিতে মহারাষ্ট্রের সাধক কবিদের জীবনী, উইলিয়ম জোন্স ও খৃস্টান মিশনারীদের ভারতীয় ইতিহাস, সাহিত্য, হেনরি মিডের সিপাহী বিদ্রোহ এবং অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ করতেন। ১৮৬৯ সালে জ্যোতিরাও 'ব্রাহ্মণ কে কাসাব' ও 'পুরোহিত চাতুর্য উন্মোচন' নামে দুখানি কবিতাগ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন - বেদ ঈশ্বরসৃষ্ট নয়, বেদ মানুষেরই রচিত। বেদই সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। কৃষক, শূদ্র, অতিশূদ্র, ভূমিহীন প্রভৃতি শোষিত শ্রেণীর মুক্তির জন্য জ্যোতিরাও-এর সংগ্রাম। শুধু সামাজিক ও সাংগঠনিক আন্দোলনে তিনি নিরত রইলেন না। এদের পক্ষে দৃঢ় হস্তে কলম ধরলেন। ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত হয় জ্যোতিরাও ফুলের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'গোলামগিরি'। দাসত্ব প্রথা বন্ধ করার জন্য যে সকল আমেরিকাবাসী কালো মানুষ সংগ্রাম করেছিলেন, তাঁদের উদ্দেশে এই বই উৎসর্গীকৃত হয়েছে। 'গোলামগিরি' ষোলটি অধ্যায়। প্রথম দশ অধ্যায়ে লেখক হিন্দুদের দশ অবতারকে বিদ্রুপ করে দেখিয়েছেন। তাঁর লেখার ভিতর বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের নীচতা ও চরম স্বার্থপরতাকে নির্মমভাবে

উদ্ঘাটিত করে দিয়েছেন। সমাজের অসার, কুসংস্কার নির্মূল করে যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। জ্যোতিরাও ফুলের 'গোলামগিরি' কে ভারতীয় দলিত সাহিত্যের আদিগ্রন্থ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

ঐ একই সালে জ্যেতিরাও প্রতিষ্ঠা করেন 'সত্যশোধক সমাজ'। এই সংগঠনের আলোচ্য বিষয় ছিল সংযত আচার, বাধ্যতামূলক শিক্ষা, স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার, ব্রাহ্মণবিহীন বিবাহ ব্যবস্থা, জ্যোতিষ, ভূত, কল্পিত দেবদানবের ভীতি হতে মানুষকে মুক্ত করা; প্রধান আক্রমণ ছিল জাতিভেদ ও মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে। এই সংগঠনের সার্বিক উদ্দেশ্য ছিল - সমাজ সংস্কার ও পুরোহিত প্রথা বর্জন। বর্তমান ভারতের সামাজিক আন্দোলনের এটাই ছিল প্রথম প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘদিনের নিপীড়িত মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠ ছিল ওই প্রতিষ্ঠান।

পুনা মিউনিসিপ্যালিটিতে নিম্নশ্রেণীর মানুষের সঠিক প্রতিনিধিত্ব না থাকায় জ্যোতিরাও জোরদার আন্দোলন করেন। সরকার তাঁকে মিউনিসিপ্যালিটিতে মনোনীত সদস্য (কমিশনার) হিসাবে গ্রহণ করে। ১৮৭৬ সাল থেকে ১৮৮২ সাল পর্যন্ত তিনি কমিশনার হিসাবে অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন।

১৮৭৭ সালে সত্যশোধক সমাজের মুখপত্র 'দীনবন্ধু' প্রকাশিত হয়। জ্যোতিরাও এই পত্রিকায় কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থে অনেক প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৮৮২ সালে ভারত সরকার নিযুক্ত শিক্ষা কমিশন প্রত্যেকে প্রদেশের শিক্ষঅ মূল্যায়ন করছিলেন। এই কমিশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন উইলিয়ম হান্টার। এই হান্টার কমিশনের কাছে জ্যোতিরাও ফুলে ১৮৮২ সালের ১৯ অক্টোবর সারা দেশে শিক্ষার সংস্কারমূলক এক স্মারকলিপি প্রদান করেন, যার ভিতর বিশেষ বিশেষ দাবি ছিল —

ক ভারতীয় সাম্রাজ্যে রাজস্বের বেশীরভাগ অংশ প্রজাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা শ্রম থেকে সংগৃহীত হয়। এ রাজস্ব দানে সমাজের উচ্চ ও ধনী শ্রেণীর অবদান খুবই নগণ্য অথবা আদৌ নেই অথচ এইভাবে সংগৃহীত রাজস্বের বেশীরভাগ অংশ সরকার উচ্চবর্ণের শিক্ষার জন্য ব্যয় করেন। কেননা, তারাই সুযোগ গ্রহণ করতে জানে। সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গী নিরপেক্ষতার পরিচয় নয়।

খ সরকারী চাকরীতে উচ্চবর্ণের একচেটিয়া কর্তৃত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে অন্যান্য নিম্নবর্ণদের যুক্ত করতে হবে।

গ শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সরকার বিশেষ কর (tax) আদায় করে কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সেই উদ্দেশ্যে এই অর্থ ব্যয়িত হয় না। প্রেসিডেন্সি বিভাগে নব্বই শতাংশ গ্রামের প্রায় দশ লক্ষ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত।

ঘ শিক্ষার্থীদের কোন একটি বয়স, অন্ততঃ বারো বৎসর পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।

ঙ সমাজে নিম্নবর্ণের ছেলেরা বিদ্যালয়ে পড়তে পারে না কেবল জাতিবিদ্বেষের কারণে। উচ্চবর্ণের ছেলেদের পাশাপাশি বসবার অধিকার তারা পায় না। অবহেলিত সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে বাস্তবসম্মত করতে হবে।

চ নিম্নশ্রেণীর মধ্যে থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিযুক্ত করতে হবে, যাঁদের সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর ছাত্ররা সহজে মিশতে পারে।

ছ পাঠক্রমে থাকা উচিত কৃষিকর্মের প্রাথমিক জ্ঞান, বিদ্যালয় সংলগ্ন থাকবে ছোট কৃষিক্ষেত্র, যেখানে গ্রামের ছেলেরা হাতে-কলমে কাজ শিখতে পারবে।

জ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

ঝ বিদ্যালয়-পরিদর্শকগণ পূর্ব সংবাদ না জানিয়ে আকস্মিকভাবে একাধিকবার বিদ্যালয় পরিদর্শন করবেন। তাহলে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ সর্বক্ষণ ত্রুটি সংশোধনে সচেষ্ট থাকবেন।

১৮৮৩ সালের প্রথমদিকে জ্যোতিরাও শূদ্রদের স্বার্থে কৃষকদের 'চাবুক দড়ি' নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকের প্রথম খন্ডে তিনি উল্লেখ করেছেন কীভাবে ব্রাহ্মণ পুরোহিত, শূদ্র সমাজকে শিশু-দোলনা হতে শ্মশান পর্যন্ত, গর্ভবাস হতে তীর্থক্ষেত্র পর্যন্ত বিভিন্ন কুসংস্কার, ধর্মের আবরণ ও পূজা-পার্বণাদির মাধ্যমে শোষণ করে বেঁচে থাকে।

১৮৮৪ সালে জ্যোতিরাও 'দীনবন্ধু' পত্রিকায় বরোদার মহারাজা সয়াজিরাও কাইকোয়াড়-এর কাছে কবিতার ছন্দে একখানি খোলা চিঠি লেখেন, চিঠিতে তিনি সয়াজিরাওকে শূদ্রদের প্রতি করুণা প্রদর্শনের জন্য অনুনয় করেন। তিনি লেখেন

— ব্রাহ্মণগণ তাঁদের শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে দুর্বল ও চরম দুরবস্থার মধ্যে ফেলেছেন। যে কৃষক মাঠে কাজ করে, তাদের অভুক্ত রেখে রাজস্ব হতে অলস ব্রাহ্মণদের বৃত্তি দেওয়া ঠিক নয়। দেশের শ্রমজীবী কৃষক সমাজ কায়িক পরিশ্রম করে জমিদার মহাজনের কোষাগার পূর্ণ করে আর আধপেটা খেয়ে দুর্বহ ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে কোনক্রমে জীবন নির্বাহ করে। দেশের সর্বময় কর্তা যিনি তাঁর প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব, নিরক্ষর কৃষক সমাজকে বাঁচিয়ে রাখা।

এই চিঠির জন্য ১৮৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসে জ্যোতিরাও বরোদায় নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। জ্যোতিরাও-এর প্রচন্ড ব্যক্তিত্ব, নির্ভীকতা, দৃঢ় চরিত্র, নিঃস্বার্থপরতা, অস্পৃশ্য ও দরিদ্র মানুষের জন্য অসীম দরদ মহারাজ সয়াজিরাও-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি জ্যোতিরাও-এর মনোজ্ঞ বক্তৃতা শুনে খুশী হন। জ্যোতিরাও বরোদার বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ পান।

১৮৮৫ সালের ২৪ মে পুণায় সার্বজনিক হলে মারাঠী লেখকদের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন শুরু হয়। এর সভাপতি ছিলেন কৃষ্ণশাস্ত্রী রীজওয়াদে। প্রায় তিনশত লেখক এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন। যে সকল লেখক সভায় যোগ দিতে পারেন নাই তাঁদের লিখিত অভিভাষণ সভায় পঠিত হয়।

স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব এম.জি.রাণাডে এই সভায় যোগদানের জন্য জ্যোতিরাওকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কিন্তু জ্যোতিরাও সভায় যোগদানে অসম্মতি জানিয়ে রাণাডেকে লেখেন

> — ‘‘আপনার চিঠি পেয়ে আমি খুশী হয়েছি। কিন্তু ভাই, আমাদের প্রতিষ্ঠান ও পুস্তকাবলীর মতবাদের সঙ্গে আপনাদের লেখকগণ একমত নন। ইচ্ছাক্রমে পরোক্ষ বা প্রকাশ্যে তাঁরা নিম্নবর্ণের মানুষদের মানবিক অধিকার দিতে নারাজ। তাঁদের শিক্ষা ও বাণীর সঙ্গে আমাদের মতবাদের অনেক ফারাক। তাঁদের পূর্বপুরুষগণ শূদ্র ও অতিশূদ্রদের প্রতি হিংসা গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের লেখায় এদের দাস আখ্যা দিয়েছেন। শুধু বর্তমান শাস্ত্রগ্রন্থ নয়, অনেক ঐতিহাসিক প্রাচীন লিপিও সেই সাক্ষ্য বহন করে। যে দুঃখ-যন্ত্রণা শূদ্র ও অতিশূদ্রগণ যুগ যুগ ধ’রে ভোগ করে আসছে, ঐসব জ্ঞানাভিমানী লেখকগণ, যাঁরা অর্থহীন বক্তৃতা দান করেন, তাঁরা তা ধারণাই করতে পারবেন না।
>
> আমরা অস্পৃশ্য শূদ্রগণ, উচ্চবর্ণের কোন সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করিনা। ওদের সঙ্গে মিশে আমাদের কোন লাভ নেই। আমাদের নিজেদের চিন্তা নিজেরাই

করব এবং নিজেদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করব।

আপনাদের ঐসব বিদগ্ধ লেখকগণের যদি জাতীয় সংহতি সৃষ্টি করার সদিচ্ছা থাকে তবে জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা দূর করে কীভাবে পরস্পরের ভিতর ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠতে পারে সে বিষয়ে উদার দৃষ্টিসম্পন্ন রচনা প্রকাশ করতে বলুন। শিল্প ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টির নামে সমাজের প্রকৃত ক্ষতকে আবৃত না রেখে তাকে নির্মূল করাই সঙ্গত।

আমার সারকথা এই। আমার এই সংক্ষিপ্ত পত্র আপনার সভায় আলোচনার জন্য পাঠালে খুশী হব।''

উক্ত সভায় অনুপস্থিত ৪৩ জন লেখকদের মধ্যে জ্যোতিরাও ফুলের লিখিত ও প্রেরিত এই পত্রখানিই সর্বপ্রথম পঠিত হয়।

১৮৮৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জ্যোতিরাও বম্বে গেলেন, বিভিন্ন শ্রমিক অঞ্চলের সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিলেন। তাঁর উদ্দীপ্ত ভাষণ শুনে অবহেলিত শ্রমিক শ্রেণী অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন — সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে আমৃত্যু তাঁরা সংগ্রাম করবেন।

জ্যোতিরাও ফুলের ষাট বৎসর বয়সে তাঁর বম্বের অনুগামীগণ তাঁকে সম্বর্ধনাদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি হচ্ছেন মহারাষ্ট্রের সর্বপ্রথম মানুষ যিনি অবহেলিত ও বঞ্চিতের জন্য অক্লান্ত সংগ্রাম করে অতুলনীয় অবদান রেখেছেন। ১৮৮৮ সালে ১১ মে দুপুরবেলায় মান্ডবীর কোলীওয়াদা হলঘরে দেশের অবহেলিত ও দরিদ্র জনগণের ভীড় উপছে পড়ছে। তারা বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষের মুক্তিযোদ্ধা, অস্পৃশ্য ও নিরক্ষর মানুষের পরমবান্ধব জ্যোতিরাও ফুলেকে 'মহাত্মা' উপাধিতে সম্মানিত করেন। জ্যোতিরাও-ই সমগ্র ভারতবর্ষে প্রথম মহামানব, যাঁকে দেশের সাধারণ মানুষ 'মহাত্মা' উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

নিরক্ষর, দরিদ্র, অসহায় মানুষের ভক্তি ও ভালবাসায় অভিভূত হলেন জ্যোতিরাও। তিনি বিনীতভাবে বললেন — ''আমার কাজ শেষ হয়নি। এই কাজকে আগামী দিনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আপনাদের । আপনারা সত্যশোধক সমাজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হোন। সমাজের জন্য সবাই সাধ্যমত আত্মত্যাগ করুন, তাতেই আমার আনন্দ।''

১৮৮৮ সালের জুলাই মাসে জ্যোতিরাও হঠাৎ রোগাক্রান্ত হন। শরীরের দক্ষিণ অঙ্গে পক্ষাঘাত দেখা দেয়। তবু তাঁর কলম থামল না। অসুস্থতার মধ্যেও তিনি 'দীনবন্ধু'

পত্রিকার জন্য লিখে চলেছেন। তিনি গদ্য অপেক্ষা কবিতা লিখতেন বেশী। তাঁর কবিতায় আছে জাতীয় জাগরণ মন্ত্র। 'সার্বজনিক সত্যধর্ম' পুস্তকে তিনি লিখেছেন — সকল ধর্মগ্রন্থ মানুষেরই রচনা। সেগুলি আরম্ভ হতে শেষ পর্যন্ত সকল বিষয় সত্যের সঙ্গে যুক্ত নয়। জ্যোতিরাওকে কেবল সামাজিক আন্দোলনের অগ্রদূত না বলে ভারতীয় দলিত সাহিত্যের পথিকৃৎ বললেও অত্যুক্তি হয়না।

১৮৮৯ সালে ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমদিকে জ্যোতিরাও তাঁর পালিত পুত্র যশোবন্তকে 'রাধা' নামে সদ্বংশজাত এক কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিলেন। তাঁর নির্দ্ধারিত নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসারে ব্রাহ্মণ্যবাদবিরোধী বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। বিবাহের পর স্নেহবশতঃ কন্যার নামকরণ করা হল 'চন্দ্রভাগা'। তিনি নব-দম্পতিকে আশীর্বাদ করলেন তারা যেন ভারতীয় নারীদের মুক্তি ও অধিকারলাভের জন্য সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়।

১৮৯০ সালের ২৭ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার জ্যোতিরাও-এর স্বাস্থ্যের বেশ অবনতি ঘটল। তিনি অনুভব করলেন সময়ে সংক্ষেপ। সন্ধ্যা পাঁচটায় তাঁর পরিবারের সকলকে বিছানার পাশে ডাকলেন। তিনি একে একে সবাইকে নিঃস্বার্থভাবে ন্যায় ও সত্যের পথে অবহেলিত ও বঞ্চিত মানুষের জন্য কাজ করতে উপদেশ দিলেন — ''ভাইয়েরা আমার! অবহেলিত ও নিপীড়িত মানুষের কল্যাণের জন্য আমরা সাধ্যমত কাজ করেছি। আগামী পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের ভিতর আমরা মানবিক অধিকার অর্জন করতে পারব, যা বিগত দুইশত বৎসরে পারিনি। তোমরা আত্মসম্মান নিয়ে সিংহের মতো বাঁচো। শূদ্র এবং অতিশূদ্রদের আগে শিক্ষা দাও''। স্ত্রীকে কাছে ডেকে তিনি শেষ বিদায় চাইলেন। স্ত্রী সাবিত্রীবাঈ ভক্তিবিনম্র চিত্তে বিষণ্ণভাবে সকরুণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। জ্যোতিরাও পুত্রকে কাছে ডেকে বললেন— ''তোমার মায়ের প্রতি দায়িত্ব পালন করবে, মানুষের সেবার জীবন উৎসর্গ করবে।'' তারপর উপস্থিত আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, অনুগামীদের দিকে শেষবারের মত একবার তাকিয়ে জ্যোতিরাও আস্তে আস্তে পরম শান্তি ও তৃপ্তিতে চোখ বুজলেন। দুহাত বাড়িয়ে যেন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলেন।

রাত্রি দুটো কুড়ি মিনিটের সময় মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলের চৌষট্টি বৎসরের ক্লান্ত হৃদপিন্ড একেবারেই থেমে গেল। অশ্রুসজল শোকার্ত আত্মীয়-পরিজনদের মাঝে একটা গভীর নিস্তব্ধতা নেমে এল।

অন্ধকারের আলো রোকেয়া

আনন্দময়ী মুখোপাধ্যায়

যিনি নিজে কোনদিন স্কুলে পড়েননি, স্কুল সম্পর্কে তাঁর কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না, এমনকি দিনের আলোতেও পড়ার সুযোগ পাননি - তাঁরই অন্তরের অন্তঃস্থলে এক অদম্য ইচ্ছে ঘুমিয়েছিল। অন্যায় অন্ধকারের গরাদ থেকে মেয়েদের সূর্যের আলোতে এনে সূর্যমুখী করে ফোটাবেন।

নারীজাতির শক্তি ও স্বাধীনতার স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন। সেই স্বপ্নকে সাকার করতে নিজের না পাওয়া বেদনা ভুলতে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত সারাজীবন প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। প্রতিষ্ঠা করেছেন সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল। মেয়েদের শুধু স্বাক্ষর করা নয়, সার্বিক নারীজীবনের খুঁটিনাটি বিষয়কেও তিনি প্রকৃত শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে করতেন। সেই রোকেয়া মেয়েদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করে গেছেন।

বিদ্যালয়ে না গিয়েও দুর্লঙ্ঘ্য পারিবারিক ও সামাজিক বাধা অতিক্রম করে অত্যন্ত গোপনে রাত জেগে বিদ্যার্জন পর্ব চলত। রোকেয়ার বড়দা ইব্রাহিম সাবের। তিনি সামাজিক পারিবারিক নিয়ম মানেননি। ভ্রাতা ভগিনী কোন আত্মীয়-স্বজনের বিদ্রুপে ভগ্নোৎসাহ হয়ে ক্ষান্ত হননি। দাদার অপরিসীম উৎসাহের কথা রোকেয়া সারাজীবন মনে রেখেছিলেন। রোকেয়া তার পদ্মরাগ উপন্যাসটি দাদাকে উৎসর্গ করে লেখেন 'আমি জানিনা পিতা মাতা গুরু শিক্ষক কেমন হয় - আমি কেবল তোমাকেই জানি'। দাদা বলতেন 'বোন এই ইংরেজি ভাষাটা যদি শিখে নিতে পারিস তবে পৃথিবীর এক রত্নভাণ্ডারের দ্বার তোর কাছে খুলে যাবে'। সেটা যত্ন করে রোকেয়া আয়ত্ত করেছিলেন।

রোকেয়া মুসলমান সমাজে জন্মেছিলেন। সেই সময়কার মুসলমান সমাজের প্রচলিত অন্যায় কুসংস্কার তিনি মেনে নেননি। আপোষ করেননি । নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। মুসলমান মেয়েদের টেনে এনে আলোর নিচে দাঁড় করাতে।

রোকেয়া রঙপুরের পায়রাবন্দের জমিদারবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮০ সালের

৯ই ডিসেম্বর। আবু আলি সাবের রোকেয়ার পিতা। তাঁর চার পত্নী। প্রথমা পত্নী রোকেয়ার মাতা ঢাকার হোসেনউদ্দিন চৌধুরীর কন্যা রাহাতুন্নেসা সাবেরা চৌধুরী। দুই পুত্র — ইব্রাহিম সাবের ও খলিলুর রহমান। তিন কন্যা করিমুন্নেসা, রোকেয়া ও হোমায়রা ।

রোকেয়ার বড় হয়ে ওঠার মুহূর্তগুলিতে একদিকে সমস্তরকম শিক্ষাগ্রহণে বাধা অন্যদিকে কঠিন কঠোর অবরোধপ্রথা ভীষণভাবে কায়েম ছিল সাবের পরিবারে। মা রাহাতুন্নেসা ছিলেন অত্যন্ত রক্ষণশীল মনের। মেয়েরা ছিল কার্যত গৃহবন্দী। শুধু পর্দা রক্ষার স্বার্থেই মেয়েদের গৃহভ্যন্তরে একান্তে অর্থ না বুঝে কোরাণ পাঠ ছাড়া যাবতীয় লেখাপড়া ছিল নিষিদ্ধ। পর্দাপ্রথার দৌরাত্ম্য এতটাই ছিল যে রোকেয়ার লেখা অবরোধবাসিনীর বিবরণগুলি গল্পের মত শোনায়।

শৈশবের এই ভয়াবহ পর্দাপ্রথার স্মৃতি রোকেয়াকে সারাজীবন স্বস্তি দেয়নি। শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে পড়লেন রোকেয়া। দিদি করিমুন্নেসার বিয়ে হয়েছিল চোদ্দ বছর বয়সে। এরই উদ্যমে রোকেয়া বাঙলা শেখেন। করিমুন্নেসা নিজেও একজন শক্তিশালী লেখিকা ছিলেন। শিক্ষিত দুই অগ্রজের বাধার ফলেই রোকেয়ার বিবাহ যুগ অনুযায়ী বহু বিলম্বে হয়, ১৬ বছর বয়সে, ১৮৯৬ সালে ভাগলপুর নিবাসী সৈয়দ সাখাওয়াতের সঙ্গে। বিয়ের সময় সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের বয়স ছিল ৩৮। তবু এই অসম বয়সের বিয়ে ততটা মন্দ হয়নি। স্বামীর সদিচ্ছাতেই আমরা পরবর্তীকালে এই প্রগতিশীল রমণীকে পাই। যিনি সমগ্র সমাজ বিশেষতঃ মুসলিম সমাজের নারীদের পক্ষে চরম আশীর্বাণী নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। নিরন্তর সংগ্রামে মুসলমান মেয়েদের, অন্ধকারবাসিনী নারীদের সামনে খুলে দিয়েছেন আলোর রাজ্য। নিজের বর্তমানকে উৎসর্গ করেছিলেন আগামীদিনের নাগরিকদের সুখ ও কল্যাণের জন্য।

সাখাওয়াত হোসেন রোকেয়ার ভেতরের আগুনের আঁচ পেয়েছিলেন। বয়সের প্রচুর ব্যবধান থাকলেও রোকেয়ার জীবনের সুষমামণ্ডিত করেছিল স্থানীয় আন্তরিক উৎসাহ, সাহায্য ও প্রেরণা । তাঁদের দাম্পত্যজীবন মাত্র চোদ্দ বছরের (১৮৯৬-১৯০৯) হলেও সাখাওয়াতের কুসংস্কারমুক্ত উদার ও শিক্ষানুরাগী মনের ছোঁয়া আলোকদীপ্ত রোকেয়ার পরবর্তী জীবন ও কর্মকে সমৃদ্ধ করেছিল। স্বামীর উৎসাহ ও আনুকূল্যেই রোকেয়া বিবাহিত জীবনেও পড়াশুনা ও সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্বামীর সযত্ন প্রচেষ্টায় তিনি উর্দু ও ইংরেজিতে দক্ষতা অর্জন করেন।

স্বামীর প্রদত্ত দশহাজার টাকার মূলধন নিয়ে স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ মাস পরে ১৯০৯

সালের সালের ১লা অক্টোবর ভাগলপুরের খলিফাবাগে পাঁচজন ছাত্রীকে নিয়ে রোকেয়া গড়ে তোলেন সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়। ভাগলপুরের মত বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলে প্রতিকূল পরিবেশে এই বিদ্যালয়টি গড়ে তোলা সহজ ছিল না।

বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য সাখাওয়াত হোসেন যে ১০ হাজার টাকা রোকেয়াকে দিয়ে গিয়েছিলেন সেই টাকা এবং রোকেয়ার কিছু গহনার লোভে শ্বশুরবাড়ির কিছু আত্মীয় বিশেষতঃ সাখাওয়াতে পূর্বতন পত্নীর কন্যা-জামাতা রোকেয়ার জীবন বিপন্ন করে তোলে। ভালো কাজে বাধা আসেই কুচক্রীদের কাছ থেকে। দুঃখী রোকেয়া ভাগলপুর ছেড়ে, সাখাওয়াত হোসেনের স্মৃতি বিজড়িত বাড়ি ছেড়ে ১৯১০ সালের ৩ ডিসেম্বর কলকাতায় চলে আসেন। ধন্য হয় কলকাতা। এখানে তার আরব্ধ কর্মটি সম্পন্ন করবার জন্য কঠিন সংগ্রাম শুরু হয়।

১৯১১ সালের ১১ মার্চ ১৩ নম্বর ওয়ালিউল্লাহ লেনে একটি ছোট্ট ভাড়াবাড়িতে দ্বিতীয়বার রোকেয়া শুরু করলেন সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়। মাত্র দুটো ক্লাস, দুখানা বেঞ্চ আর আটজন ছাত্রী। খুব সহজে ছাত্রী আসেনি। বাড়ি বাড়ি গিয়ে অনেক সাধাসাধি করে পর্দানসীন মেয়েদের ডেকে এনে শুরু হল মুসলমান মেয়েদের জন্য রোকেয়ার স্কুল।

পরের মাসের ২ এপ্রিল ১৯১১ সালের তৎকালীন মুসলমান সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আবদুর রসুলের বাসভবনে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিনের সভায় মৌলবী সৈয়দ আহ্‌মদ আলিকে সম্পাদক করে স্কুল পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শিক্ষা-শিল্প-বিজ্ঞানে নব নব উন্মেষ, অগ্রগতির যে ছোঁয়াচ লেগেছিল কলকাতায় তার সঙ্গে একটা সংযোগসূত্র স্থাপিত হল মুসলমান সমাজেরও। এই অসাধ্য সাধনের পদক্ষেপ নিলেন রোকেয়া, নারী শিক্ষার হাতটি ধরে।

রোকেয়ার প্রতিষ্ঠিত স্কুলটির বহু আগে থেকে কলকাতায় এ ধরনের স্কুল ছড়িয়ে ছিল কিছু। তাতে স্থানীয় মুসলমানদের প্রত্যক্ষ উদ্যোগ ও সহযোগিতাও ছিল প্রচুর। তবু স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রে রোকেয়াই ছিলেন অগ্রপথিক। তাঁর স্কুলে শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই নয়, নারীর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার অধিকার সম্পর্কেও শিক্ষা দিতেন রোকেয়া।

স্কুল প্রতিষ্ঠার একবছর পর ১৯১২ সালের এপ্রিল মাস থেকে মাসিক ৭১ টাকা হিসেবে সরকারি অনুদানের বন্দোবস্ত হয়। ১৯১৪ সাল পর্যন্ত অনুদান একই ছিল।

বহু আবেদন নিবেদনে অনুদান বেড়ে যখন ৪৪৮ টাকা, তখন সব মিলে মাসিক খরচ হত ৬০০ টাকা। অতিরিক্ত টাকা যোগাড়ের জন্য রোকেয়ার চিন্তার শেষ ছিল না।

এই ভয়ংকর আর্থিক দুর্যোগের মধ্যেও অপরিসীম মনোবল আর কঠোর পরিশ্রমে রোকেয়া স্কুলটিকে টিকিয়ে রেখেছিলেন। স্কুলের উন্নতির জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে রাশি রাশি অর্থ ঢেলেছেন। তাঁর সামান্য পারিশ্রমিকও স্কুলের কাজে ব্যয় করতেন।

ছাত্রীরা অধিকাংশ বিনা বেতনে পড়ত। তাদের যাতায়াতের গাড়িভাড়াও রোকেয়া মকুব করেছিলেন। বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছাত্রী যোগাড় করতেন। তাঁর এই অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ছাত্রীসংখ্যা এমন বাড়ে যে ছাত্রী ভর্তি সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল। ১৯১৫ সালে ফেব্রুয়ারীতে স্কুলটি ৮৬/এ লোয়ার সার্কুলার রোডের দোতলা বাড়িতে উঠে আসে। একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ছাত্রীসংখ্যা হয় ৮৪।

প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে স্কুলটি দাঁড় করাবার সময় রোকেয়া কিছু আর্থিক সাহায্য ও সুপরামর্শও পেয়েছিলেন বিদ্বজ্জনের কাছ থেকে। এটিই ছিল এগিয়ে চলার শক্তি ও প্রেরণা। নানাধরনের পরামর্শ দিয়ে রোকেয়াকে সাহায্য করেন ভূপালের বেগম সুলতান জাহান, সাকিনা চৌধুরী, লেডি চেম্‌সফোর্ড ও লেডি কারমাইকেল। সরোজিনী নাইডু রোকেয়ার এই মহৎ প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়ে হায়দরাবাদ থেকে ১৯১৬ সালে একটি চিঠি পাঠান — 'মুসলমান নারীদের জন্য আপনি যে অক্লান্ত সাধনা করিতেছেন বিধাতা করুন তাহা জয়যুক্ত হউক'।

কয়েকজন বিশিষ্ট মহিলা শিক্ষাবিদের সহায়তায় তিনি বেথুন, গোখেল মেমোরিয়াল প্রভৃতি স্কুলে নিয়মিত যাতায়াত করে স্কুল পরিচালনার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে থাকেন। ছাত্রীদের সঙ্গে ক্লাসরুমে বসেও শিখতেন। রোকেয়ার অদম্য মনোবল আর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৩০ সালের মধ্যেই স্কুলটি উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

কলকাতায় নিজের বাড়িতে থাকবার জন্য একটি ঘরও বানাননি রোকেয়া। স্কুল বাড়িতেই একটি ঘরে থাকতেন তিনি। স্কুলের খুঁটিনাটি বিষয়ের উপর সবসময় নজর রাখার জন্যই এই ব্যবস্থা করেছিলেন। স্কুলই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান।

রোকেয়ার ব্যক্তিজীবন খুব সুখের ছিল না। 'শৈশবে বাপের আদর পাইনি। বিবাহিত জীবনে কেবল স্বামীর রোগের সেবা করেছি ..... পথ্য রেঁধেছি। ডাক্তারকে চিঠি লিখেছি'।

.....দুবার মা হয়েছিলুম। তারা একজন পাঁচ মাস অপরটি চার মাস বয়সে চলে

গেছে'। ছোটবোন হোমায়রার শিশুকন্যা নূরীকে আপন সন্তানস্নেহে মানুষ করবার অভিপ্রায়ে নিজের কাছে রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছাও পূরণ হয়নি নূরীর অকালমৃত্যুতে।

অফুরন্ত মনোবল, অনমনীয় ব্যক্তিত্ব, অসীম কর্মক্ষমতা ও অতুলনীয় দূরদর্শিতাকে সম্বল করে মাত্র আটজন ছাত্রী নিয়ে রোকেয়া ১৯১১ সালে যে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন আজ তা কলকাতার নামীদামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম। কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য তিনি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেননি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন — 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলটা না থাকলে আমি মরে যাব না.....তবে এ স্কুলের উন্নতি কেন চাই? — চাই নিজের সুখ্যাতি বাড়াবার জন্য নয়, চাই স্বামীর স্মৃতিরক্ষার জন্য নয়, চাই বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের কল্যাণের জন্য। .....চিরকাল আমি স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্য কিছু করবার চেষ্টা করেছি'।[৩]

স্কুল স্থাপনের ১৮ বছর পরেও সমাজের বিরূপতা ও বিরুদ্ধতার অবসান হয়নি। এই সমস্ত ষড়যন্ত্র, অপপ্রচার, কুৎসা রোকেয়ার মধ্যে বোধের উন্মেষ ঘটিয়েছিল। রোকেয়াকে আত্মত্যাগের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, 'যদি সমাজের কাজ করিতে চাও, তবে গায়ের চামড়াকে এতখানি পুরু করিয়া লইতে হইবে, যেন নিন্দা-গ্লানি-উপেক্ষা-অপমান কিছুতে তাহাকে আঘাত করিতে না পারে, ... যেন ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্র-বিদ্যুৎ সকলই তাহাতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে'।

তিনি একাই অন্ধকার একটি পথে সফরে বেরিয়েছিলেন। সেই দুর্গমপথের অলিগলিতে কত ধরনের বিপদ লুকিয়ে থাকে তা সফরকালে টের পেয়েছিলেন। তিনি আগে কখনও সে পথে হাঁটেননি কাজেই পথটি ছিল তাঁর কাছে নিতান্ত অপরিচিত তবু নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ধীর পায়ে এগিয়েছেন তিনি। তাই স্কুল তৈরী করার পরেও তিনি শঙ্কিত। তিনিই বলতে পারেন 'স্কুলটা যে এত ঝঞ্ঝাবাত, এত শিলাবৃষ্টি এত অত্যাচার সহিয়া এখনও টিকিয়া আছে তাহা যথেষ্ট। ..... আমাদের ন্যায় অবরোধ-বন্দিনীদের পক্ষে যতটা সম্ভব তাহাই করিয়াছি, এবং অবরোধ-বন্দিনী বালিকাদের পক্ষে যতটা শিক্ষা পাওয়া সম্ভব তাহাই তাহারা পাইয়াছে'।

আজকের দিনে এই পরিস্থিতিতে তার সময়কার অসুবিধার কথা বোঝা বোধহয় আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আত্মীয়পরিজন, সমাজ সব জায়গা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে স্কুলটাকে শক্ত জমির উপর দাঁড় করাবার জন্য নিরন্তর লড়াই করে গেছেন তিনি। 'মাসিক মোহম্মদী'তে রোকেয়া সম্পর্কে আমীনউদ্দীন আহমদ যথার্থই লিখেছিলেন,

'শিক্ষাহীন বাঙালী মেয়ের জন্য নিজের জীবনকে তিলে তিলে ক্ষয় করেছেন'।

স্কুল ছাড়া তাঁর ব্যক্তিগত সুখ আয়েশ এসব ছিল না। রোকেয়ার কাছে শিক্ষার অর্থ ছিল মুক্তচিন্তার অনুশীলন। তিনি বলছেন '..... শিক্ষার অর্থ কোন সম্প্রদায় বা জাতি বিশেষের 'অন্ধ অনুকরণ নহে। ঈশ্বর স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা দিয়েছেন সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি করাই শিক্ষা। ঐ গুণের সদ্ব্যবহার করা কর্তব্য এবং অপব্যবহার করা দোষ'। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে রোকেয়া বুঝেছিলেন, মুসলমান মেয়েদের লেখাপড়া শেখা তাদের পরিবার ও সমাজ অনুমোদন করে না। স্ত্রী-শিক্ষা বলতে কেবল না বুঝে কোরাণ মুখস্থ করা! সেজন্য আরবি বর্ণমালার পরিচিতি ব্যস্।

তবে কোরাণ শিক্ষার প্রতি রোকেয়া অপরিসীম আস্থা প্রকাশ করেছেন কোথাও শেষজীবনে। নিজের এই বক্তব্যের সমর্থনে তাঁর যুক্তি ছিল। রোকেয়ার ধর্মকে শিক্ষার অঙ্গীভূত করার প্রস্তাবে অনেকেই বিস্মিত হন। কিন্তু রোকেয়াও রামমোহন বিদ্যাসাগরের মতো ধর্মের সাহায্যেই ধর্মীয় কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করতে চেয়েছিলেন।

ইসলাম ধর্মের বিবিধ আচার আচরণ এবং কোরাণের মধ্যে থেকে রোকেয়া আসলে খোঁজার চেষ্টা করেছেন একটি সূত্র যে সূত্রে আবদ্ধ করে মুসলমান মেয়েদের অন্ধকার থেকে জাগরণের পথ ধরে সূর্যমুখী করে তোলা যায়। ভোরবেলার আজানকে তিনি অবরোধবাসিনীর জাগরণধ্বনি হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। 'যাহা হউক, মাতা, ভগিনী, কন্যে! আর ঘুমাইও না - উঠ, কর্তব্যপথে অগ্রসর হও'।

রোকেয়ার জীবনের সব পথই ছিল আসলে কর্তব্যপথ। তিনি ঐ পথকেই একটা সার্বজনীন পথের চেহারা দিতে চেয়েছিলেন। এজন্য শুধু একটা স্কুল তৈরীতেই থেমে না থেকে একজন প্রকৃত পথদ্রষ্টার মতো তিনি নানাদিকে নিজেকে ছড়িয়ে দেন। তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের আর একটি স্মরণীয় পরিচয় তিনি একজন বিশিষ্ট সমাজকর্মী এবং সমাজ সংস্কারক।

নারীর ব্যক্তিসত্তার বিকাশের লক্ষ্যে তিনি চেয়েছিলেন নারীমুক্তি ও নারীস্বাধীনতা। এই চাওয়ার ফলস্বরূপ গড়ে ওঠে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল। অন্যদিকে মুসলিম নারীদের ঐক্যবদ্ধ করে, সমাজে তাদের নিজের অধিকার বুঝে নিয়ে তা প্রতিষ্ঠা করতে , দেশ ও জাতি সম্পর্কে সচেতন করতে রোকেয়া প্রতিষ্ঠা করেন 'আঞ্জুমানে

খাওয়াতিনে ইসলাম' বা নিখিলবঙ্গ মুসলিম মহিলা সমিতি, সেটা ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। এই সংগঠন Calcutta Mohamedan Ladies Association নামেও পরিচিতি লাভ করে।

শিক্ষিত হিন্দু ও ব্রাহ্ম মহিলারা বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। বিধবাবিবাহ ও নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য আন্দোলনকারী সমাজ সংস্কারকদের সমর্থন করেছিলেন তাঁরা। সমসাময়িক হিন্দু ও ব্রাহ্ম লেখিকারা নারীর প্রতি সামাজিক অনাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে কলম চালিয়েছিলেন। কামিনী রায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, মানকুমারী বসু, সরলা দেবী চৌধুরানী এ কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

বাংলায় তখনও পর্যন্ত কোনও মুসলমান নারীকল্যাণ সংগঠনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এসময়ে যুগযুগ ধরে প্রচলিত নানাবিধ সংস্কারের করাল গ্রাস থেকে টেনে বার করে এক মুক্ত সমাজে পুরুষের সমান অধিকারে মুসলমান নারীকে প্রতিষ্ঠা করতেই আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম গঠন করলেন রোকেয়া। মুসলমান মেয়েরা গৃহকোণ ছেড়ে প্রকাশ্য সভা সমিতিতে যোগদান করবেন একথা কেউ কল্পনা করতে পারেননি। ফলে রোকেয়াকে প্রভূতভাবে হেয় ও হাস্যস্পদ হতে হয়েছিল। হাল ছাড়েননি। দিনের পর দিন মুসলিম মেয়েদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন। এভাবে হতভাগিনীদের শৃঙ্খল কাটিবার চেষ্টায় রোকেয়া বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন। সেই সব অবরোধবাসিনীদের সভার উপযুক্ত করে নিতে হয়েছিল। এমন মেয়েদের জমায়েত হতে পারে, তাদের কিছু দাবীদাওয়া অভাব-অভিযোগের কথা আলোচনা হতে পারে সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন না তাঁরা।

'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' -এর কার্যাবলী ছিল বহুমুখী। তবে মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মহিলাদের স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা। নারীসমাজ সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা— বিবাহ, তালাক ইত্যাদি সম্পর্কে মহিলাদের সচেতন করে গড়ে তোলাও এই সমিতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য রক্ষা, শিশুপালন, দেশবিদেশের নারী প্রগতির খবর জানা ও জানানো ছিল এই সমিতির কাজ।

নারী আন্দোলনকে সফল করবার জন্য রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত আঞ্জুমান নানাভাবে মহিলাদের সচতেন করার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। সমিতির সদস্যরা বাড়ির বাইরে এসে সক্রিয়ভাবে স্বদেশী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হতে পারেনি ঠিকই কিন্তু মুসলমান মেয়েদের মধ্যে স্বদেশি ভাবধারা প্রচারে তাঁরা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। চরকা কেটে

প্রচুর পরিমাণে সুতো তৈরী করে খদ্দর বুনতে সাহায্য করেন। বিদেশী জিনিস বর্জনে সমিতির সদস্যরা এগিয়ে আসেন প্রশংসনীয়ভাবে।

রোকেয়া প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করলেও রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। কমলা দাশগুপ্ত রোকেয়াকে বিপ্লবী নেতা হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন — ''.....অবরোধবাসিনী পুস্তকে বাংলা ও বিহারের অবরোধবাসিনী মহিলাদের জীবনের যে বেদনাতুর চিত্র তুলে ধরেছেন তা সমাজব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত হানবার জন্য প্রেরণা জাগিয়েছে। এদিকে থেকে তিনি বিপ্লবী, প্রত্যক্ষভাবে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান না করলেও যে প্রচেষ্টা তিনি করে গেছেন তার মূল্য কম নয়।''

স্বদেশের স্বাধীনতা রোকেয়ার স্বপ্ন ছিল। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রোকেয়া উপলব্ধি করেন দেশের স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য সবচেয়ে আগে দরকার নারী স্বাধীনতা। তাই শুধু 'আঞ্জুমান খাওয়াতিনে ইসলাম'-এর বিপুল কর্মকাণ্ডের মধ্যে তিনি সমাজকর্ম সীমিত রাখেননি। 'নিখিল ভারত মহিলা সমিতি'র তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান সদস্য। এছাড়া স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত 'Bengal Womens Educational Confrernce' -এর সঙ্গেও রোকেয়া 'বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতি' শিরোনামে যে ভাষণ দেন সেটি সওগাত পত্রিকার চৈত্র ১৩৩৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

তখনকার দিনে (বিংশ শতকের গোড়ার দিকে) মুসলিম মহিলাদের বাড়ি থেকে বাইরে এনে সংগঠিত করা খুব সহজ কাজ ছিল না। তাঁরা না বুঝতেন সময়ের মূল্য না বুঝতেন শিক্ষার মূল্য। স্বাধীনতাহীনতা তাঁদের মনে কোন শূন্যতা সৃষ্টি করেনি। এই ধরনের পরিস্থিতিতে তাদের সংগঠিত করে শিক্ষাকেন্দ্র খোলা, লেখাপড়া শেখানো, পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিধি, শিশুপালন, হাতের কাজ, সেলাই শেখানো যে কতটা কঠিন ছিল তা আজকের যুগে দাঁড়িয়ে অনুধাবন করা দুঃসাধ্য। তখনকার কলকাতার মুসলমান মেয়েদের জড়ো করে তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা করেছে আঞ্জুমান। তাছাড়াও চেষ্টা করেছে বোঝাতে, পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অসহায়তা দুর্বলতা আর অজ্ঞতার কথা। শিক্ষা ছাড়া এ বন্ধন থেকে মুক্তি নেই।

অবরোধের কঠিন কঠোর আড়াল থেকে নারীকে মুক্ত করে শিক্ষাদানের মাধ্যমে তাকে পুরুষের সমকক্ষ করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টার ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্য সাধনাও ছিল রোকেয়ার এক অনন্য কীর্তি।

বেগম রোকেয়া যে সময় সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হন সে সময় বাংলা সাহিত্যে এমন কোনো শক্তিশালী লেখিকা ছিলেন না যিনি কাব্যচর্চার বাইরে সাহিত্যে সমাজচিন্তার স্বাক্ষর রেখেছেন। মোতাহার হোসেন সুফী তাঁর ''বেগম রোকেয়া ঃ জীবন ও সাহিত্য'' গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন — সমাজের কল্যাণ ও নারী জাগরণের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে সে যুগে একমাত্র রোকেয়াই লেখনী ধারণ করেছিলেন। সেদিক থেকে বিচার করলে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে বেগম রোকেয়ার সাহিত্য সাধনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এক ঘটনা। ।বরোধপ্রথার বিভীষিকা পর্দার নামে অমানুষিক অবরোধ প্রথা, স্ত্রী-শিক্ষা বিরোধী মনোভাব এবং সমস্তরকম সামাজিক গোঁড়ামির বিরুদ্ধে মসীধারণ করে তিনি আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। সমাজ জীবনে এর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল অত্যন্ত শুভ। বেগম রোকেয়ার শক্তিশালী লেখনীই যে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধন করে অগ্রগতির পথে যাত্রারম্ভ করেছিল তা অনস্বীকার্য।

রোকেয়ার সাহিত্যচর্চা এক বিরল ব্যতিক্রম। অনুবাদ সাহিত্য, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, উপন্যাস, কবিতা সবক্ষেত্রেই তাঁর ছিল অবাধ বিচরণ। রোকেয়ার সাহিত্যরাজি আকারে বিপুল আয়নত ছিল না, বৈচিত্রে ভরপুর ছিল। তাঁর গ্রন্থগুলির নাম - মতিচূর (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড সং কলন), Sultan's Dream,পদ্মরাগ,অবরোধবাসিনী। মতিচূর প্রথম খণ্ড ১৩১২ তে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পূর্বেই প্রাকশিত হয়। প্রকাশকাল অনুযায়ী রোকেয়ার দ্বিতীয় গ্রন্থ ইংরেজিতে রচিত Sultan's Dream ১৯০৫। ভাগলপুরে অবস্থানকালে রচিত এটি। সহজ সরল নির্ভুল ইংরেজিতে রচিত একজন অবরুদ্ধ নারীর কথা ঘরের চারদেওয়ালের মধ্যেই তার পৃথিবী। সূর্যালোক, চাঁদের আলো, খোলা হাওয়া তার জন্য নিষিদ্ধ। তিনি স্বপ্ন দেখেন যেখানে পুরুষেরা গৃহকোণে বন্দী, পুরুষ নারীর কথায় ওঠেবসে। সে এক Lady Land, যেখানে কোন কুৎসিত আচরণ নেই, অন্যায় নেই, তাই পুলিশও নেই। সে এক সত্য আর ভালোবাসার রাজত্ব। এমনই এক রাজ্যে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন রোকেয়া।

রোকেয়া রচিত একমাত্র উপন্যাস পদ্মরাগ। ১৯২৪ সালে মুদ্রিত হলেও প্রায় ২২ বছর আগে লিখিত। অন্যান্য রচনার মত এই উপন্যাসেও রোকেয়া নারীজাগরণকেই প্রধান উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এখানে সিদ্দিকা সমাজকে দেখাতে চায় একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারীজন্মের চরম লক্ষ্য নয়। ''সংসারধর্ম জীবনের সার ধর্ম নহে''। উপন্যাসের অনেক ঘটনাই রোকেয়ার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত।

অবরোধবাসিনী গ্রন্থটি কতকগলি ঐতিহাসিক ও চাক্ষুষ সত্যঘটনার হাসি কান্না

নিয়ে রচিত। তৎকালীন বাংলার প্রতিটি সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের মত পায়রাবন্দের জমিদার সাবের পরিবারের মেয়েরাও অবরোধপ্রথার শিকার ছিলেন। রোকেয়া স্বয়ং এই প্রথার ব্যতিক্রম নন। অন্তঃপুরবাসিনী নারীদের এই প্রাণঘাতী প্রথাকে সরস ভঙ্গিমায় অবরোধবাসিনী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। লেখিকার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি, তীক্ষ্ণ হাস্যরস বোধের পরিচয় এই কাহিনীগুলির ছত্রে ছত্রে উপস্থিত। রোকেয়া যদি সারাজীবন আর কিছু না-ও লিখতেন বা সমাজসেবামূলক কোনো কাজের সঙ্গে যুক্ত না-ও থাকতেন তবুও শুধুমাত্র এই অবরোধবাসিনী লেখার জন্যই বাংলা সাহিত্যে এক মর্যাদার আসনের দাবিদার হতেন। ১৯২৮ সালের মাসিক মোহম্মদী পত্রিকায় অবরোধবাসিনীর কাহিনীগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। অবরোধবাসিনীতে শুধু বাংলার মেয়েদের দুঃখের কাহিনী বর্ণিত হয়নি, বিহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাবের মেয়েদের কথাও আছে। ঢাকা, কলকাতা, লক্ষ্ণৌ, আলিগড় প্রভৃতি উন্নত শহরগুলিতে অবরোধ প্রথা বহাল ছিল। কুলবালাদের অবরোধ শুধু পুরুষের বিরুদ্ধে নয়, মেয়েমানুষদের বিরুদ্ধেও। অতিঘনিষ্ঠা আত্মীয়া ও চাকরানী ব্যতীত অপর কোন স্ত্রীলোক দেখিতে পায় না। যিনি যত বেশি পেচকের মত লুকাইয়া থাকিতে পারেন তিনি তত বেশি শরীফ। শুধু অন্দরবাসিনীরাই অবরোধপ্রথা মেনে চলতেন না। যে সব মহিলা বাড়ির বাইরে বের হতেন তাঁরাও নিজেদের বোরখার আড়ালে আচ্ছাদিত করে নিজেদের বংশের সম্ভ্রম বাঁচাতেন।

রোকেয়ার গোটা জীবনটা খুঁটিয়ে দেখলে নিঃসন্দেহে বলা যায় তাঁর স্কুল তৈরী, আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম গড়ে তোলা বা তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি, সবকিছুর পেছনে একটাই উদ্দেশ্য কাজ করেছে সবসময় - স্ত্রীশিক্ষার প্রসার এবং সেই শিক্ষাকে হাতিয়ার করে মেয়েদের সংসারের এক গুরুতর বোঝা থেকে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষে রূপান্তরিত করা। তাঁর এই লক্ষ্য পূরণের জন্য তিনি যে কোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কোনো কুৎসা-অপবাদ-অভাব-বিপর্যয় তাঁকে টলাতে পারেনি। পাঁচ-ছ বছর বয়স থেকে রোকেয়ার জন্য কাঠোর অবরোধ ব্যবস্থা হয়েছিল। কোনো শোনা কথা বা অন্যের কষ্ট দেখে সচেতনভাবে সমাজসেবা কিংবা তথাকথিত নারীমুক্তির জন্য রোকেয়া কোনো আন্দোলন শুরু করেননি। সমস্তটা শুরু হয়েছে তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার নিরিখে। তাঁর মা অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান ছিলেন। সেই ভাবধারায় আনুগত্য রেখে অবরোধপ্রথার পক্ষে ছিলেন। একবার পথে ষ্টীমারে তাঁর ছোট বোন হোমায়রার তীব্র ক্রন্দনেও মা ঘেরাটোপের বাইরে বের হননি তাকে শান্ত করতে। এসব দেখতে দেখতে বড় হওয়া রোকেয়া অবরোধবাসিনী গ্রন্থটি অবরোধের পক্ষ

নেওয়া মাকে উৎসর্গ করেন।

প্রবন্ধগুলির বিষয়বৈচিত্র আমাদের বিস্মিত করে। গুরুগম্ভীর বিষয়গুলিকে অত্যন্ত সহজভাবে তুলে ধরেছেন। ব্যক্তিজীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা, রক্ষণশীল চিন্তাধারা, রুচিবিকার, সমাজের নানা অসংগতি, গ্লানি ও কদর্যতার রূপায়ণ রোকেয়ার এই ব্যঙ্গধর্মী রচনার বৈশিষ্ট্য।

শুধু গদ্য সাহিত্য নয়, রোকেয়া বেশ কিছু কবিতাও লিখেছেন। কম সংখ্যক কবিতা রচনা করেও সাহিত্য সমালোচক মহলে কবিখ্যাতি অর্জন করেন রোকেয়া। রোকেয়ার রচিত কবিতাগুলির বেশিরভাগ প্রকৃতি বিষয়ক। দু-একটিতে তীব্র সমাজ ভাবনাও প্রতিফলিত হয়েছে।

বাংলাভাষাকে উর্দুর আচ্ছাদনে আবৃত রাখার প্রয়াসীদের চিরবিরোধী ছিলেন রোকেয়া। বিবাহিত জীবনে ভাগলপুরে, কোলকাতার কর্মজীবনে ছাত্রী, শিক্ষিকা ও কর্মচারীদের সঙ্গে কথাবার্তায় উর্দুভাষা ব্যবহারেও তিনি বাংলা ভাষা ভুলে যাননি।

বাংলাভাষার প্রতি রোকেয়ার শ্রদ্ধা ভালোবাসা তাঁর সাহিত্যে ছড়িয়ে রয়েছে। এখানকার মুসলমানরা মাতৃহীন অর্থাৎ তাদের ব্যবহৃত ভাষা বিকৃত উর্দু, শুনলে কষ্ট হয়। মাত্র চল্লিশজন বাঙালি ছাত্রী পাননি বলেই সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে বাংলা শাখা খোলা সম্ভব হয়নি। এটি তাঁর আক্ষেপ ছিল।

বেগম রোকেয়ার রচনারীতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তাঁর ভাষার সারল্যে, ভঙ্গির তীক্ষ্ণতায় এবং সূক্ষ্ম ব্যঙ্গে। সমাজ সমালোচনা ও ব্যঙ্গার্থক সকল রচনার জন্য চাই ভাষার ওপর প্রবল দখল ও ধারালো কলম। ব্যঙ্গরচনা ছিল রোকেয়ার স্বভাবজাত কারণ তিনি সমাজসংস্কারের জন্য মূলতঃ কলম ধরেছিলেন। অলস, ভীরু, কূপমণ্ডুক বাঙঅলির মূলে আঘাত করে চেতনা জাগাতে চেয়েছিলেন। তাঁর এন্ডি শিল্প প্রবন্ধে মধ্যবিত্ত বাঙালির চাকরির প্রতি তীব্র মোহকে ব্যঙ্গ করেছিলেন।

'চাকুরী চাকুরী চাকুরী!
চাকুরী মাথার মানিক!
চাকুরী বিনে বঙ্গবাসীর
জীবনধারণে ধিক্!'

নারী বিষয়ক প্রবন্ধমালায় রোকেয়ার তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণধর্মী ক্ষমতা বারবার প্রতিফলিত

হয়েছে যা কোথাও কোথাও আজও প্রাসঙ্গিক।

রোকেয়া কিন্তু কোথাও নারীকে বিদ্রোহিনী হয়ে ধর্মবন্ধন বা সমাজবন্ধন মুক্ত হতে ডাক দেননি। তিনি নারী-পুরুষের মধ্যে বুদ্ধিগত পার্থক্য দূর করতে চেষ্টা করেছেন। তাদের মধ্যে যে বিপুল ব্যবধান রোকেয়ার সেখানেই আপত্তি। নারীকে তিনি শিক্ষিত হয়ে নিজেকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হবার ডাক দিয়েছেন। শুধু অন্দরমহল নয়, সমগ্র বিশ্বের দরবারে হৃদয় নিয়ে দায়িত্ব নিয়ে নারী হাজির থাকুক পুরুষের পাশে।

রোকেয়ার আহ্বান —

''অতএব জাগো, জাগো গো ভগিনী! ..... আমরা সমাজেরই অর্ধ অঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? পুরুষের স্বার্থ আর আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে- একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই।''

এক্ষেত্রে তিনি আর নারীকে শুধু নারীত্বে আবদ্ধ রাখতে চান না। রোকেয়া চাইতেন মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ। সেখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষ। রোকেয়ার সময়ে একজন নারীর এরকম চিন্তাভাবনা দেশকে বিশেষ করে মুসলমান নারী সমাজকে যে আলোকবর্তিকার সন্ধান দিয়েছে সে জন্য তিনি নমস্য, আমাদের নমস্য।

আগের রাতে ১১টা পর্যন্ত তিনি 'নারীর অধিকার' নামে একটি প্রবন্ধ লিখছিলেন। ডিসেম্বর, ১৯৩২, তাঁর জন্মদিন, ভোর ৫:৩০, চলে গেলেন রোকেয়া। স্বাভাবিক দিন শুরু করেছিলেন। হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হ'লো। তাঁর প্রিয় কাজটি করতে করতে চিরশান্তি লাভ করলেন। তাঁর বয়স সেদিন বাহান্ন বৎসর।

রোকেয়ার ইচ্ছা ছিল স্কুলের আশেপাশেই যেন তাঁকে সমাহিত করা হয়। 'কবরে শুইয়াও যেন আমি আমার মেয়েদের কলকোলাহল শুনিতে পাই' - সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। তাঁর আত্মীয়স্বজনের ইচ্ছাতে সোদপুরের সুখচরে পারিবারিক গোরস্থানে রোকেয়ার মরদেহ কবরস্থ করা হয়।

পরদিন ১০ ডিসেম্বর ১৯৩২ তারিখে অমৃতবাজার পত্রিকা, দি মুসলমান ইত্যাদি পত্রিকাতেও রোকেয়ার মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হয়। The Statesman -এ লেখা হয়—

Death of prominent educationist Mrs. R.S. Hossain, the well-known educationist and founder of the Sakhwat Memorial Girls' High Enghlish School, died in Calcutta yesterday morning at the premises

of the school. She devoted her life and all her resources to the cause of education for girls founding the Sakhawat School in 1911.

কলকাতা কর্পোরেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করে। বাংলার তৎকালীন গভর্নর জন অ্যান্ডারসন একটি শোকবার্তা প্রেরণ করেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, বঙ্গীয় পরিশীলন সমিতি, নিখিলবঙ্গ মুসলিম ছাত্র সমিতি ও নিখিলবঙ্গ মুসলিম মহিলা সমিতির উদ্যোগে ১৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় অ্যালবার্ট হলে রোকেয়ার স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি শোকসভার আয়োজন করা হয়। এই শোকসভায় আব্বাসউদ্দিন গেয়েছিলেন —

''কোন কাঁদনের ঢেউ ওঠে আজ আসমানেরি দরিয়ায়
বেদন বাজে তারায় তারায় চাঁদ সুরজ আর জোছনায়''

** **

নূরের বাতি হাতে নিয়ে এসেছিলে উন্মনা
আজরাইলের ঐ কালোমুখ উজ্জ্বল রোশনায়ে
সজীব হলো হিমতনু তার তোমারি সে প্রাণ ছোঁয়ায়।[১১]

তথ্যসূত্র ঃ-

১) রোকেয়া জীবনী / শামসুল নাহার মাহমুদ

২) ৩০ এপ্রিল ১৯৩১ তারিখে লেখা চিঠি / উদ্ধৃত পত্রে রোকেয়া পরিচিতি/ মোশফেকা মাহমুদ

৩) ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম / রোকেয়া রচনাবলী

৪) ২৫.৪.৩২ তারিখে রোকেয়া এই চিঠিটি লেখেন বাংলার সরকারী জনশিক্ষা পরিচালক এবং রোকেয়ার শুভাকাঙ্খী খানবাহাদুর তোসাদ্দেক আহমদকে।

৫) রোকেয়া জীবনী / শামসুন নাহার মাহমুদ

৬) রোকেয়া জীবনী / শামসুন নাহার মাহমুদ

৭) স্মৃতির অর্ঘ্য / মাঘ ১৩৩৯

৮) স্ত্রীজাতির অবনতি / রোকেয়া রচনাবলী

৯) রোকেয়া রচনাবলী / পৃঃ ২৭১-৭২

১০) রোকেয়া জীবনী / শামসুন নাহার মাহমুদ

১১) স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী / কমলা দাশগুপ্ত / কলকাতা ১৩৭০

১২) রোকেয়া রচনাবলী

১৩) স্ত্রীজাতির অবনতি / রোকেয়া রচনাবলী

১৪) মাসিক মোহাম্মদী / মাঘ ১৩৩৯

চেনা অচেনা

মনোরঞ্জন ব্যাপারী

সারা দেশে আজ থেকে সাইত্রিশ বছর আগে বহে গিয়েছিল একটা মহা প্রলয়। তাজা রক্তের উষ্ণ প্রস্রবণে ভিজে গিয়েছিল দেশের সবুজ ঘাস ও মাটি। বহু মানুষ লাশ হয়েছিল এই দেশটার শ্রমিক-কৃষক-দলিত-দরিদ্র আদিবাসী জীবন থেকে না পাওয়ার অভিশাপ মুছে দিয়ে জীবনটাকে যন্ত্রণাহীন বানাবার দুর্বার বাসনায়।

সে ইতিকথা সম্ভবতঃ এখনও কিছু মানুষ ভুলে যেতে পারেননি। ভুলিয়ে দেবার বহু চেষ্টার পরেও। যারা এখনও নিভৃতে সেই নিঃস্বার্থ দেশ দরদীদের জন্য চোখের জল ফেলেন। চোখে আর বুকে আর কলমে আগুন জ্বেলে স্মৃতিতর্পণ করেন।

আমার ভাগ্য একদা আমাকে ঠেলে দিয়েছিল এইসব মহান মানুষদের মধ্যে। খুব কাছ থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম তাদের কিশোর চোখে। দেখতাম আর ভাবতাম স্বার্থপর সমাজে এমন স্বার্থহীন সমাজকর্মী কী করে - কোন মহামন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে উঠল জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য করে! এই প্রশ্নের কেন্দ্রে যে উত্তর তা হল - একটি দর্শন। সঠিক দর্শন, সঠিক নেতৃত্ব এবং আপামর জনগণের দুঃখ দুর্দশার দ্রুত বিমোচন, যার যথার্থ নাম বিপ্লব — সেই বিপ্লবী প্রেরণা এবং চেতনা তাদের উদ্বেল করে তুলেছিল এমন নির্ভীক সংগ্রামে।

ভুল কী তাদের ছিল না? কথাটা ভুলের নয় - উদ্যোগের। যে ভুল তারা করেছে তার মূল্যও তো তারা দিয়েছে। যে হাঁটে হোঁচট তো তারই লাগে। এই দেশে মতাদর্শের জন্য এমন অকাতরে প্রাণ আর কোন রাজনৈতিক দলের কর্মী কোনদিন দেয়নি। দেবে তেমন কোন দূর-লক্ষণ মানসগোচর নয়। এইখানেই তাদের মহত্ব- তাদের শ্রেষ্ঠত্ব।

একটা চুম্বক যদি একশো পেরেককে ছুঁয়ে থাকে, পেরেকগুলোও ছোট ছোট চুম্বক হয়ে যায়। আমি দেখেছি - ওই বৈপ্লবিক মতাদর্শে দীক্ষিত তরুণরা গ্রামেগঞ্জে, অস্তিবস্তিতে যেখানেই যেত- মেলামেশা করত মানুষ তাদের সাথে- তাদের সাহচর্যে অতি সাধারণ মানুষও যেন নিজের জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে তাদের ভালোবেসে ফেলত এবং যুক্ত হয়ে

পড়ত সেই রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নিজের লাভ-ক্ষতির বিষয় বিস্মরণ হয়ে।

সেই যে সেলিমপুর রেল বস্তির কানন দিদি দুই মেয়ের মা, স্বামী পরিত্যক্তা, বাবুর বাড়ি বাসন মেজে যার দিন গুজরান। যে কোন বিপদে পড়ে গেলে এনকাউন্টার না হোক কিছু বছরের বিনা বিচারে জেল নিশ্চিত। তখন তার চৌদ্দ-পনের বছরের যমজ মেয়েদুটোর কী হবে সেসব না ভেবে একদিন এলাকায় পুলিশি তৎপরতা শুরু হলে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় জুটের বস্তায় বইপত্র এবং অন্য অনেক কিছু ভরে মাথায় করে আর এক ঘাঁটিতে পৌঁছে দিয়ে আসে, যে এতখানি দুঃসাহসী আর সক্রিয় হয়ে ওঠে শুধু ওই তরুণদের সঙ্গ এবং সাহচর্যে!

কত নাম কত কত মানুষ যেসে সময়ে এমন পাগলপারা হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এক উথাল-পাতাল রাজনৈতিক ইতিবৃত্তের অঙ্গ হয়ে তার কী কোন গোনাগাঁথা আছে! কেউ কী সেইসব অখ্যাত অবজ্ঞাত মানুষদের কথা লিখে রেখে যাবে আগামী ইতিহাসের উপাদান হিসাবে?

সেই যে আলিপুর স্পেশাল জেলের এক চুরি কেসের বন্দি, যে স্বেচ্ছায় যুক্ত হয়েছিল রাজবন্দীদের জেল পলায়ন কর্মসূচির সঙ্গে। সবাই পালিয়ে যাবে, পালাতে পারবে না সে একা। রয়ে যাবে জেলে - প্রতিরোধ দায়িত্ব নিয়ে। যার ফলে অবশ্যই মৃত্যু হবে তার। সে মৃত্যু অতি কষ্টকর। তবু সে অটল দাঁড়িয়ে ছিল এগিয়ে আসা সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর সামনে পাহাড় হয়ে এবং বরণ করেছিল মত্যুকে।

সেটা জরুরি অবস্থার সময়। প্রেসিডেন্সি জেলে সেই জরুরি অবস্থা নকশাল বন্দীদের উপর চেপে বসেছিল ফাঁসির দড়ির মত দম বন্ধ হয়ে। প্রায় সারাদিনই বন্দীদের সেলে বন্ধ করে রাখা হচ্ছিল। কারও সাথে কারও দেখাসাক্ষাৎ কথাবার্তার সামান্যতম সুযোগ আর ছিল না। দমনপীড়ন অত্যাচার দ্বারা চেষ্টা করছিল প্রশাসন, বিপ্লবী যুবকদের মনোবল চূর্ণ-বিচূর্ণ করে তাদের পোষমানা পশুতুল্য বানিয়ে ফেলতে। মানসিক পরাজয় স্বীকার করে নিতে।

বিশাল জেল প্রেসিডেন্সি। বাহান্ন বিঘে জমিকে আকাশ ছোঁয়া পাঁচিল দিয়ে ঘিরে বানিয়ে তোলা হয়েছে এই জেল অবাধ্য, দুর্বিনীত, শাসনব্যবস্থার পক্ষে বিপদজনক ব্যক্তিদের আটকে রাখার জন্য। এই জেলেই বন্দী ছিলেন ঋষি অরবিন্দ, ছিলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন খ্যাত বিপ্লবী অনন্ত সিং। বাহান্ন জন নকশাল পন্থী এই জেলের গেট

ভেঙ্গে বের হয়ে গিয়েছিল বন্যার জলের মতো। কিছু সময়ের জন্য আমি এই জেলে ছিলাম সত্তর খাম্বা বাহাত্তর খিড়কির ওয়ার্ড - দড়ি হাজতে। ভীষণ নোংরা, আলোবাতাস অপ্রতুল, হাজারখানেক বন্দী আর হাজার কয়েক পায়রার একত্র সহাবস্থান। নোংরা গরম হট্টগোল পূর্ণ এই ওয়ার্ডে থাকাকালীন সময়ে ঘটেছিল সেই ঘটনা।

রাজবন্দীরা জেল ভেঙ্গে বেরিয়ে যাবার পর থেকে অসম্ভব কড়াকড়ি চলছিল জেলে। সমস্ত নকশাল বন্দীদের বিচ্ছিন্ন করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছল জেলের নানা প্রান্তে, সেলে সেলে। যেন কেউ কারও সাথে কোন যোগাযোগ করতে না পারে। বসানো হয়েছিল কঠোর পাহারা। তবে কোন প্রহরাই যে বিপ্লবী প্রেরণার কাছে নিশ্ছিদ্র নয় বার বার জেল ভেঙে পালিয়ে বিপ্লবীরা তা প্রমাণ করেছে।

জেলখানার রন্ধনশালায় রান্নার জন্য যেসব বাসনপত্র ব্যবহার করা হয় সেগুলো লোহার। যার নাম ড্যাগ। সেই বড় বড় লোহার ড্যাগ যেগুলো আগুন তাপে ফুটোফাটা হয়ে যায় সেগুলো ব্যবহার করা হয় ওয়ার্ড থেকে ওয়ার্ডে খাদ্য পরিবহনের জন্য। ছিদ্রস্থানটি বন্ধ করে দেওয়া হয় এক দলা মাখা আটা দিয়ে। নকশাল বন্দীরা এই আটার দলাকে ব্যবহার করল গোপন সংবাদ আদানপ্রদানের উপযুক্ত মাধ্যম হিসাবে। নানাবিধ রোগে ক্যাপসুল ওষুধ দেওয়া রোগীকে। ওরা সেই ক্যাপসুলের মধ্য চিরকুট ঢুকিয়ে গুজে দিত আটা গোলার মধ্যে। যখন সেই ড্যাগ বহন করে বাহকরা সেলে খাবার পরিবেশন করতে আসত। সেই ড্যাগ যখন জোলের আর এক প্রান্তে আর এক সেলে-ওয়ার্ডে খাবার বয়ে পৌঁছে যেত সেই সেল বা ওয়ার্ডের একজন আটার দলার মধ্যে লুকনো ক্যাপসুল গোপনে বের করে পড়ে, পেয়ে যেত পরবর্তী পরিকল্পনা বা প্রয়োজনীয় তথ্য নির্দেশ। আর এই পুরো প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন হতো সেইসব ড্যাগম্যান দের স্বাধীন সহযোগিতায়। যাদের পরিচয় চোর-ডাকাত-খুনি। জেল কর্তৃপক্ষ যাদের অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত থাকার কোন যুক্তি খুঁজে বের করতে পারবে না।

আলিপুর স্পেশাল জেলের গুদামে কাজ করত এক চুরি কেসের আসামি। জেলের এই গুদাম থেকে জেলের কর্মীরা রেশন বাবদ চাল চিনি গম পায়। গুদাম থেকে চাল গমের বস্তা বহন করে মেইন গেটে নিয়ে গিয়ে পাল্লায় মেপে মেপে তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয় প্রাপ্য চাল চিনির পরিমাণ। সন্ধে থেকে শুরু হয়ে রাত আটটা নটা পর্যন্ত চলে এই রেশন বিতরণ।

এই সময়ে আলিপুর ব্যাঙ্কশাল কোর্ট থেকে আসামি আসা শুরু হয়। যাদের কারও কারও বিচার পর্ব চলছে। জেল থেকে কোর্টে গিয়ে সারাদিন কোর্টে কাটিয়ে আবার ফিরে এসেছে জেলে। কেউ কেউ থানা থেকে কোর্টে গিয়ে সদ্য এসেছ জেল খাটতে।

জেল গেটে যত কড়াকড়ি কোর্ট লকআপে তত কড়াকড়ি থাকে না। সেখানে কোন চাঅলা বা বন্দীর বাড়ির লোক কোর্ট বাবুকে বিশ-পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে বন্দীর কাছে খাবার দাবার জামা কাপড় পৌঁছে দিতে পারে তল্লাশি ছাড়াই। জেল গেটে সেটা হবে না।এখানে তো বন্দীর অন্ডকোষ টিপে, পায়ুতে আঙুল ঢুকিয়ে প্রয়োজনে পরীক্ষা করা হবে কোন লুকানো পদার্থ আছে কিনা। সেটা দুবার। একবার জেল গেটে একবার আমদানী ওয়ার্ডে। যদি কোন কেউ গেটের তল্লাশিতে ধরা পড়ে আমদানী ওয়ার্ডে রক্ষা পাওয়া কঠিন।

সেই চোর বন্দীকে দেখেছি যে পরিতোষ ব্যানার্জীদের জেল পলায়ন কর্মসূচীতে একটা বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল যা সে ছাড়া আর একজন মাত্র জানত সে ওই পরিতোষ ব্যানার্জী, যে মারা গেছে।

যে চোর — চুরি তার ব্যবসা। তাই জেলে বারবার আসে আর যায়। আমার সঙ্গে তার দেখা হয় পচাত্তরের মাঝামাঝি তার পঞ্চম বা ষষ্ঠ জেল ভ্রমণের সময়। বলেছিল সে - কেউ জানেনা গুরু, কাউকে বলিনি, বললে বা কী হবে? যদি ওরা সাক্সেসফুল হতে পারত তাহলে বলতাম। ঝুটুমুট সব মরে গেল।

প্রতি শুক্রবার ছিল রেশন দেবার দিন। নকশাল বন্দীরা সেই দিনটাকে বাছাই করেছিল অস্ত্র আমদানীর উপযুক্ত দিন হিসাবে। যেদিন যার কোর্টের তারিখ থাকত - তাদের বাইরের সহযোগিদের কেউ জামাকাপাড় বা অন্যকিছুর মধ্যে লুকিয়ে কোর্ট লকআপে পৌঁছে দিত বস্তুটি। সে সেটা লুকিয়ে নিয়ে আসত জেল গেটে। কোর্টে ফেরত সব আসামিকে প্রথমে ডেপুটি জেলারের টেবিলের সামনে উবু হয়ে বসতে হয়। তিনি খাতা মিলিয়ে দেখেন কে কে ফেরত এল কে কে খালাস গেল। সেটা বড় সময়সাপেক্ষ বিরক্তিকর প্রক্রিয়া।

ঠিক এই বিরক্তিকর অলস মন্থর সময়ে লুকানো বস্তুটি বের করে সবার নজর বাঁচিয়ে সেটাকে চালান করে দেওয়া হতো অফিস ঘরের সার সার দাঁড়িয়ে থাকা কোন এক আলমারি তলায়- অন্ধকার আবর্জনার মধ্যে। বন্দী তল্লাশি দিয়ে চলে যেত নিজের

সেলে। সেটা সেখানে পড়ে থাকত সারারাত।

পরের দিন সকালে সেই চোর-গুদাম কর্মী, অফিসে আসত গুদামের চাবি আর খাতাপত্র নিয়ে যেতে। তখন সেখানে গেট ডিউটির এক সেপাই আর সে ছাড়া কেউ থাকত না। তার নজর বাঁচিয়ে গুদাম কর্মী সেটা লুকিয়ে ফেলত গুদামের কোন এক বস্তার মধ্যে। গুদাম থেকে কোন এক সুযোগে সেটা চলে যেত নকশাল বন্দীদের হাতে। আর এই সমস্ত কাজটা সে সম্পন্ন করত নিঃস্বার্থ-প্রাণের টানে। ''এই জেলে সব বাঞ্চোৎ এসেছে নিজের স্বার্থে, নোট কামাব, মস্তি মারব। আর ওরা? যা করেছে সব গরিব মানুষের জন্য। তাই যতটা পারি ওদের জন্য করি''। বলেছিল সে। অন্য একজম যার নাম কালুয়া, সেও চোর। এই ঘটনায় মারা যায়। পরিতোষ দা আমাদের পঞ্চাননতলার ছেলে। কতবার আমাদের বস্তিতে এসেছে। খুব ভালোলোক ছিল মাইরি। ভালোলোক বেশিদিন বাঁচে না। আক্ষেপ ঝরছিল আর গলা থেকে। ওই কালুয়াটাও ভালো লোক ছিল। চোর নাম ঘুচাতে নকশাল হয়ে মরে গেল।

এবার যে ঘটনাটা বলব সেটাও স্পেশাল জেলের। সেই জরুরী অবস্থার সময়ে ধানবাদ না কোথা থেকে যেন এসেছিল এক নকশাল বন্দী। পুলিশ মেরে কোমর ভেঙে দিয়েছিল তার। সেটা তারা স্বীকার করেনি। কোন কেসেই করে না। আমাদের মহান দেশের মহান আইনে কোন বন্দীকে শারীরিক নিগ্রহের অনুমোদন দেয় না। শুধু জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দিয়ে থাকে। সেটা গত সাত, দশ,চৌদ্দ বা এক দুমাসও হতে পারে। পুলিশ থানায় এনে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এতেই বন্দীর দেহ ক্ষতবিক্ষ হয়ে যায়। ওষুধপত্র ডাক্তারের দরকার পড়ে। মহিলা বন্দীর যোনীতে রুল, গরম ডিম এসব ঢোকানো, পুরুষের পুরুষাঙ্গে ইলেকট্রিক শক্ সবই সেই নিরামিষ জিজ্ঞাসাবাদ। রাত একটা দেড়টার সময়ে এক প্রায়ান্ধকার কক্ষে একদল হিংস্রলোক হাত পা বাধা এক বন্দীকে যা যা করে সেসব কে জানবে? কেউ সাক্ষী তো থাকে না।

সেই কোমর ভাঙা নকশাল বন্দী সর্বক্ষণ শুয়েথাকত সেলের মেঝেয় প্লাস্টার কোমর নিয়ে। তাকে দেখাশোনা করার জন্য জেল কর্তৃপক্ষ নিযুক্ত করেছিল এক বিচারাধীন বন্দীকে 'ফালতু' হিসাবে। এর বিনিময়ে সে একটু বাড়তি খাবার আর কয়েকাট বিড়ি পেত। জেলখানায় বিড়ি বড়ই মূল্যবান পদার্থ। চারটে বিড়ি দিলে একজন এক ঘণ্টা পা থেকে মাথা পর্যন্ত মালিশ করে দেবে। দুটো বিড়ি দিলে এক চৌকা লেবার এত ভাত দেবে যা একজনের পক্ষে যথেষ্ট। সেই বিড়ির জন্য 'ফালতু' হয়েছিল সেই আসামি।

আর শেষ পর্যন্ত যা হয় — এক নকশাল বন্দীর সাথে মিলেমিশে সেও কিছুটা সংক্রামিত হয়ে গিয়েছিল নকশাল রোগে। যার মুখে 'রা' সরার কথা নয় সেও সরব হয়ে উঠেছিল কর্তৃপক্ষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে। মটরে কেন পোকা, চিঁড়ে কেন তেতো এই নিয়ে সে চেঁচাতে শুরু করে দিচ্ছিল। কলাগাছ কাটতে কাটতে লোকে ডাকাত হয় এই প্রবাদটা কারও অজানা নয়। ফলে জেল কর্তৃপক্ষও সেটা জানে এবং বোঝে নকশালরা পরিচিত কোন প্রতিবাদী মুখ সামনে না এনে সাধারণ বন্দীদের এগিয়ে দিয়ে পেছন থেকে জেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একটা জনমত সংগঠিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। যেটা সফল হলে জেলখানায় একটা বিরাট বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। তেতো চিঁড়ে, পোকা মটর থেকে বন্দীদের ক্ষোভ জেল সেপাইদের গুদাম-রান্নাঘর হয়ে হাসপাতালের মালপাচার - নানা দিকে অভিযোগের গোলা হয়ে ছুটতে শুরু করবে। আর তাকে নকশালপন্থীদের আইনশৃঙ্খলা ভাঙার অপচেষ্টা বলে দেগে দিয়ে দমন-পীড়নের অজুহাত খাড়া করার একটা সমস্যা দেখা দেবে কারণ সামনে থেকে যে নেতৃত্ব দিচ্ছে সে নকশাল নয় - এক সাধারণ বন্দী।

বিয়ের রাতে বেড়াল মারতে হয়, এটাও একটা পুরাতন প্রবাদ। জেল কর্তৃপক্ষের মনে হয় ওই সাধারণ বন্দীর অসাধারণ কর্মতৎপরতার সূচনামুখেই এমন একটা আঘাত দেবে যেন সে আর কোনদিন কোন বিষয় নিয়ে প্রতিবাদ করার সাহস না পায়।

যে কোনও জেলখানায় - জেলকে সঞ্চালিত করার জন্য কর্তৃপক্ষ বন্দীদের মধ্যে থেকে কিছু লোককে বাছাই করে তাদের কিছু বিশেষ সুখ-সুবিধা দিয়ে চামচা বানিয়ে রাখে। যাদের দিয়ে অনেক অনৈতিক অন্যায় কর্ম সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করিয়ে নেয়। যা সাধারণ জেল কর্মচারীরা চাকরিজনিত কারণে অনেক সময় করার ঝুঁকি নেয় না। ওইসব চামচাদের সে ভয় নেই। তাদের নির্বুদ্ধিতা তাদের বোঝায় — কর্তৃপক্ষকে খুশি রাখলে আমার সুখের ভাঁড়ার উপচে উঠবে। আর জেল কর্তৃপক্ষ তাদের উপর এইজন্য নির্ভর করে যদি তারা কাউকে পিটিয়ে মেরেও ফেলে - দু'দল কয়েদির অন্তর্বিরোধ বলে দায়মুক্ত হয়ে যাবার একটা পথ খোলা থাকে।

এই জেলেও তেমন অনুগত একটা কয়েদিদের দল আছে। তারা থাকে সাত নম্বর ওয়ার্ডে। নকশাল হোক বা যে কোনও দুর্বিনীত বন্দী, যাকে জেল কর্তৃপক্ষ মনে করে 'বানিয়ে' দেওয়া দরকার, তাকে সন্ধ্যার গুনতির পরে ওয়ার্ড বদলি করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এই সাত নম্বর ওয়ার্ডে। যে একপাল শিকারি বেড়ালের মধ্যে একটা ইঁদুরছানা। রাত একটু গভীর হলে তখন সেই অনুগত চামচারা ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই বন্দীর উপর।

সারারাত ধরে চালায় অবর্ণনীয় অত্যাচার।

এণনই এক অত্যাচারী অনুগত কয়েদিকে অমি দেখেছিলাম এখানে। গভীরভাবে চিনে রেখেছিলাম। তারপর আবার দেখি কয়েকবছর পরে জেলের বাইরে। যার কথা আমি এখনও কোথাও লিখিনি। কোনদিন নিশ্চয়ই লিখব। সেকি কোনদিন জানত সব অন্যায় অত্যাচারের দাম দেবে পাল্লা মতো! তাকেও অন্ধকার রাত শিকারি বেড়াল হয়ে ঘিরবে, আর সে বাঁচাও বাঁচাও বলে ইঁদুর গর্তে ঢুকবে?

একদিন সেই ফালতু বন্দীকে এক সন্ধেয় ওয়ার্ড বদলি করে ঢুকিয়ে দেওয়া হল সাত নম্বরে। গুনতি জমাদার আর এক সেপাই বলে গেল - এ শালে কালুয়া বনেগা। আজকাল নকশালি বুলি বোল রহা। থোরা বানা দেনা। তাকি সুবহতক বাপকা নাম ভি ভুল য়ায়ে, নকশাল বুলি ইয়াদ না আয়ে।

আঠারো-কুড়ি বছরের ফালতু সেই বন্দী বড় রোগা। আঠারো কুড়িটা ঘুসি খেলেই মরে যাবে। তাকে দেখে দাঁতে দাঁত ঘষে বলে প্রধান চামচা - রাতভর তুই ভগবানকে ডাকবি আর বলবি আমায় মৃত্যু দাও। মরে যাওয়া কম কষ্টের। কিন্তু তুই মরবি না। সকালে তোর মনে হবে নতুন জীবন পেলি। একটু গাঁজা-টাজা খেয়ে নিই, তারপর তোকে ধরছি। বসে থাক গিয়ে ওই কোণটিতে।

আর রাত ঠিক দশটার পরে ধরল তাকে। কী দিয়ে মারছিল তাকে কে জানে। মারের সে কী আওয়াজ! যেন ..... ফেটে যাবে। সেই সাথে এক আর্তের করুণ চিৎকার — 'ওরে বাবা, মরে গেলাম'।

দশটা থেকে প্রায় বারোটা। থেমে থেমে - খেপে খেপে চলল সেই অত্যাচার। সচকিত হয়ে সারা জেল শুনলো সেই আর্ত চিৎকার। শোনা ছাড়া আর তো কারও কিছু করারও ছিল না। সবাই তো মোটা লোহার গরাদের এপারে বন্ধ।

সব রাতের শেষ আছে। এই রাতও শেষ হল এক সময়। সকাল ছটার গুনতির পরে সেই ফালতুকে ফিরিয়ে এনে ঢুকিয়ে দেওয়া হল তার পুরনো ওয়ার্ড - তিন /চার ওয়ার্ডে। প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন বন্দী থাকে এই ওয়ার্ডে। সবাই চোর ডাকাত ছিনতাইবাজ। শধু একজন নকশাল। খুব সম্ভবতঃ তার নাম গিরিশ। কোন কলেজের যেন ছাত্র।

ফালতু ছেলেটার এখন নকশাল সঙ্গী হিসাবে একটা বদনাম হয়ে গেছে। ফলে সাধারণ বন্দীরা তাকে সভয়ে সশ্রদ্ধায় এড়িয়ে গেল। সেভাবে এগিয়ে এসে কেউ

কোন কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করল না। চারদিকে সেপাই, কে দেখে ফেলবে আর কোন বিপদ হবে, কে বলতে পারে? একা ফালতু বসে রইল ওয়ার্ডের এক কোনে ভাঙাচোরা দেহ নিয়ে।

এক সময় নাস্তা ধরতে দোতলা ওয়ার্ড থেকে সব বন্দী নেমে গেল নিচে। সেই অবসরে ফালতু ছেলেটা গিয়ে দাঁড়াল গিরিশের সামনে। গলা নিচু করে বলে - দাদা, ওরা আমাকে নকশাল বলে মারেনি।

অবাক গিরিশ - তাহলে কি বলে মেরেছে?

মারেইনি।

তাহলে চিৎকার করছিলে কেন?

ওরা বলল - চিৎকার কর্। সবাই বুঝুক তোকে মারছি। নাহলে আমাদের রেকর্ড খারাপ হয়ে যাবে। তাই চেঁচালাম। গলাও ভেঙে গেছে চেঁচিয়ে। ওরা আওয়াজ করছিল।

একটু থেমে ফের বলল - আমি আগে যা ছিলাম তা থাকলে খুব মারত। এখন নকশাল হয়ে গেছি তো! তাই মারল না। বলল- মেঝেতে মারব তুই চেঁচাবি।

নকশাল নাম সবাইকেই এমন প্রভাবিত করে দিতে পারেনি সেটা সত্যি। তবে কিছু সাধারণ মানুষ,এমন কী কিছু কারারক্ষীও যে তাদের নাম আর কাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়েছিল তার বহু উদাহরণ আছে। এই স্পেশাল জেলের সেই কারারক্ষী যে পরিতোষ ব্যানার্জীদের নিহত হবার পর সেই থেঁতলে যাওয়া রক্তাক্ত দেহগুলো দেখে শোকে- দুঃখে রাতের অন্ধকারে জেলের দেওয়াল ভরিয়ে দিয়েছিল কবিতায় —

'বীরের এ রক্তস্রোত মায়ের এ অশ্রুধারা,

এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা?'

যাকে নিয়ে আমার উপন্যাস - বাতাসে বারুদের গন্ধ সে কোন রাজনৈতিক মতাদর্শে দীক্ষিত ছিল না। তবু অবচেতনে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল ওই আন্দোলনের সঙ্গে।

আর এই জেলের সেই পাগলা ডাক্তার! সেদিন সেই আটটা বীভৎসভাবে থেঁতলানো দেহ নিয়ে একা রাত জেগেছিল সবার অলক্ষ্যে। সাপের মতো পিটিয়ে পিটিয়ে মারা হয়েছিল তাদের। তখনও কোন কোন দেহে ধুকপুক করছিল প্রাণ। হাসপাতালে পাঠালে হয়তো কেউ কেউ বেঁচে যেত। কর্তৃপক্ষ সে চেষ্টাই করেনি। সীমিত সামর্থ্য

আর সমুদ্র সমান দরদ নিয়ে একা পাগলা ডাক্তার একা চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন - যদি একজনকেও বাঁচানো যায়।

অনেক রাতে জেলার, ডেপুটি জেলার পরিদর্শনে এসে পাগলা ডাক্তারের পাগলামো দেখে দাঁতে বিদ্রুপ উগলে বলেছিল — ফালতু রাত জাগছেন। ডেথ সার্টিফিকেট লিখে রেখে বাড়ি গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। কী লাভ বসে থেকে? গিয়ে বিশ্রাম নিন।

বলেছিল ডাক্তার — কিন্তু এখনো তো কারও কারও প্রাণ রয়েছে। কী করে তাদের ডেথ সার্টিফিকেট লিখব?

আপনার যা করার সেটা করে রেখে যান। বাকি যা করা সেটা হয়ে যাবে। ও নিয়ে আপনার চিন্তা করতে হবে না। জেলের বাইরে ডেডবডিই যাবে নিশ্চিন্ত থাকুন।

বলেছিল পাগলা ডাক্তার — যতক্ষণ ওদের দেহে প্রাণ আছে আমি চেষ্টা করব বাঁচিয়ে তোলার। সেটাই আমার কাজ। আমি ডাক্তার, জল্লাদ নই। জীবিতকে মৃত লেখার আগে তেমন হলে নিজের হাত কেটে ফেলব।

লেখেনি পাগলা ডাক্তার ডেথ সার্টিফিকেট যতক্ষণ তারা বেঁচেছিল। জেল কর্তৃপক্ষ রাতের অন্ধকারে দেহ পাচার করে দিয়ে বন্দী পালানোর গল্প বানাবার সুযোগ পায়নি তার পাগলামোর জন্য।

এইসব পাগল, যুক্তি-বুদ্ধিহীন, আবেগপ্রাণ মানুষই হয়ে ওঠে উপকথা, উপন্যাসের উপজীব্য। এদের পাদবন্দনায় পল্লী কবি গেয়ে ওঠে গান — ওর, যারে আগে চিনি নাই, এই মানুষেতে সেই মানুষ মিশে আছে ভাই। তারে চিনতে পারি নাই।

তবে মজার কথা এই যে - জেলখানায় যারাই এই পথের যাত্রী হয়েছিল তারা যেমন

বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দ ঃ দুই বিপরীতমুখী শিক্ষাভাবনা

আশীষ লাহিড়ী

১৮৮৬ সালের ৭ এপ্রিল কাশীপুরের বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে করতে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটান ইস্কুলের শ্যামপুকুর শাখার প্রধান শিক্ষক মনেন্দ্রনাথ গুপ্তর কাছে প্রস্তাব করেন, 'বিদ্যাসাগরের নূতন একটা স্কুল নাকি হবে? নরেনকে এর একটা কর্ম যোগাড় করে ....'। তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে নরেন্দ্রনাথ বলে ওঠেন, 'আর বিদ্যাসাগরের কাছে চাকরি করে লাভ নেই।' এর ন'দিন পর প্রশ্নটা আবার উঠল। নরেন্দ্রনাথের 'বাটীতে মা ও ভাইদের বড় কষ্ট -এখনও সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারেন নাই। তজ্জন্য চিন্তিত আছেন।' আবার ঐ চাকরির কথা উঠতেই নরেন্দ্রনাথ ঝাঁঝিয়ে উঠে বলেন, 'বিদ্যাসাগরের ইস্কুলের কর্ম আর আমার দরকার নেই। গয়াতে যাব মনে করছি। একটা জমিদারীর ম্যানেজারের কর্মের কথা একজন বলেছে।'। কিন্তু সে-চাকরিও হল না। অগত্যা অসীম আর্থিক সংকটে জর্জরিত নরেন্দ্রনাথ 'বিদ্যাসাগরের ইস্কুলের ' বউবাজার শাখার প্রধান শিক্ষকের চাকরি নিলেন ১৮৮৬ সালের জুন মাসে, ধরে নিতে পারি মহেন্দ্রনাথ গুপ্তর সুপারিশে।

কিন্তু এমন আদরণীয় চাকরি তিনি একমাসের বেশি রাখতে পারেননি। তাঁর বিরুদ্ধে শিক্ষকের দায়িত্ব পালনে গুরুতর অবহেলার অভিযোগ ওঠে। বিদ্যাসাগর নরেন্দ্রনাথকে বরখাস্ত করেন। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত-র মতে এটি এক চক্রান্ত। ইস্কুলের সচিব, বিদ্যাসাগরের জামাই সূর্যকুমার অধিকারী নরেন্দ্রনাথের ওপর প্রসন্ন ছিলেন না। তিনি উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের দিয়ে বিদ্যাসাগরের কাছে এই বলে লিখিত অভিযোগ করেন যে নরেন্দ্রনাথ ক্লাসে ঠিকমতো পড়াতে পারেন না। মহেন্দ্রনাথের বক্তব্য : 'কি বিপদ। যিনি সমস্ত জগতকে শিখালেন তিনি পড়াতে পারেন না ছেলেদের !'[১] (এখানে অবশ্য স্মরণযোগ্য, ১৮৮৬ সালে নরেন্দ্রনাথ 'সমস্ত জগতকে' শেখাতে পারেন, এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।)

কথাটা ভাববার মতো। বিবেকানন্দর মতো মেধাবী, বাক্‌পটু, সুকণ্ঠ, সুদর্শন যুবক ক্লাসে পড়াতে পারবেন না, এটা কী করে সম্ভব? উত্তরটা সম্ভবত এই যে ক্লাসে তিনি সিলেবাসের পড়া না পড়িয়ে রামকৃষ্ণ-সাধনার গুরুত্ব প্রচার করতেন। এই অনুমানের

একটা দূরাগত প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯০৯ সালে প্রকাশিত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবেকানন্দ-জীবনী থেকে। তাঁর এক বন্ধু ঐ ইস্কুলে 'স্বামীজীর ছাত্র ছিল। তার কাছে শুনেছি, তিনি নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষার উপর জোর দিতেন'।[২] নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতে এর অর্থ দাঁড়ায় : তিনি ক্লাসের পড়া না পড়িয়ে অথবা কম পড়িয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা ও হিন্দুধর্মের শিক্ষা প্রচারের ওপর জোর দিতেন। পরের ঘটনাটুকু আন্দাজ করে নিতে কষ্ট হয় না। ছাত্রদের কাছ থেকে নিয়মিত ফীড্‌ব্যাক নেওয়ার অভ্যেস ছিল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের। মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যাপক ক্ষদিরাম বসু লিখেছেন, 'প্রত্যেক শিক্ষককে তিনি মাঝে মঝে বলতেন তাঁর ক্লাসের দুটি ভাল ছেলেকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে। তিনি বাদুড়বাগানের বাড়ীতে তাঁর library-তে বসিয়ে ছেলে দুটিকে নিয়ে গিয়ে নানা কথার মধ্যে কোন্ শিক্ষক কিরকম পড়ান, তাঁর দোষগুণ কি এইসব ছেলেদের কাছ থেকে খুঁটিনাটি জেনে নিতেন'।[৩] সরকারি চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পর থেকে মেট্রোপলিটানই ছিল তাঁর প্রাণ। সেখানে তিনি নির্মম, আপোষহীন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পর্যন্ত তিনি ছেড়ে কথা বলেননি। নিজের জামাই সূর্যকুমার অধিকারীকেও বরখাস্ত করেছিলেন, তা নিয়ে সাংসারিক অশান্তিকে গ্রাহ্য না করেই। তাই, নরেন্দ্রনাথ যা করেছিলেন তা বিদ্যাসাগরের মতো নিয়মনিষ্ঠ শিক্ষাবিদের কাছে অমার্জনীয় মনে হয়েছিল।

তার ওপর বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শ ছিল ঈশ্বর-বর্জিত। তাই নরেন্দ্রনাথের বিরূপতা বেড়েই চলে। মেট্রোপলিটান থেকে বরখাস্ত হওয়ার এক বছর পরের (৮মে ১৮৮৭) একটি ঘটনায় তার বেশ তিক্ত প্রকাশ ঘটে। কথামৃতে ঘটনাটি এইভাবে বিবৃত হয়েছে :

> মাস্টার(নরেন্দ্রর প্রতি) - বিদ্যাসাগর বলেন, আমি বেত খাবার ভয়ে ঈশ্বরের কথা কাউকে বলি না।
>
> নরেন্দ্র - বেত খাবার ভয়?
>
> মাস্টার - বিদ্যাসাগর বলেন, মনে কর, মরবার পর আমরা সকলে ঈশ্বরের কাছে গেলুম। মনে কর, কেশব সেনকে যমদূতেরা ঈশ্বরের কাছে নিয়ে গেল। কেশব সেন অবশ্য সংসারে পাপ-টাপ করেছে। যখন প্রমাণ হল তখন ঈশ্বর হয়তো বলবেন, ওঁকে পঁচিশ বেত মার্। তারপর মনে কর, আমাকে নিয়ে গেল। আমি হয়তো কেশব সেনের সমাজে যাই। অনেক অন্যায় করেছি। তার জন্য বেতের হুকুম হল। তখন আমি হয়তো বললাম, কেশব সেন আমাকে এইরূপ

বুঝিয়েছিলেন তাই এইরূপ কাজ করেছি। তখন ঈশ্বর আবার দূতদের হয়তো বলবেন, কেশব সেনকে আবার নিয়ে আয়। এলে পর হয়তো তাঁকে বলবেন, তুই একে উপদেশ দিছিলি? তুই নিজে ঈশ্বরের বিষয় কিছু জানিস না, আবার পরকে উপদেশ দিছিলি? ওরে কে আছিস - একে আবার পঁচিশ বেত দে। (সকলের হাস্য)।

তাই বিদ্যাসাগর বলেন, নিজেকেই সামলাতে পারি না, আবার পরের জন্য বেত খাওয়া!'' (সকলের হাস্য)।

নরেন্দ্র - যে এটা বোঝে নাই, সে আর পাঁচটা বুঝলে কি করে?

মাস্টার - আর পাঁচটা কি?

নরেন্দ্র - যে এটা বোঝে নাই, সে দয়া, পরোপকার বুঝলে কেমন করে? স্কুল বুঝলে কেমন করে? স্কুল করে ছেলেদের বিদ্যা শেখাতে হবে, আর সংসারে প্রবেশ করে, বিয়ে করে ছেলেমেয়ের বাপ হওয়াই ঠিক, এটাই বা বুঝলে কি করে? যে একটা ঠিক বোঝে, সে সব বোঝে।'[৪]

বিবেকানন্দর এই শেষ মন্তব্যটির দুরকম ব্যাখ্যা হতে পারে। এক - বিদ্যাসাগর মুখে যাই বলুন, আসলে তিনি ঠিকই ঈশ্বর বোঝেন। নইলে দয়া, পরোপকার, স্কুল চালানো এতসব গুণের অধিকারী হলেন কী করে? মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্ভবত এই অর্থই করেছিলেন। কেননা বিবেকানন্দর ঐ মন্তব্যটির পরেই তিনি স্বগতভাবে বলেন ''যে ঈশ্বরকে জেনেছে, সে সব বোঝে''। কিন্তু বিবেকানন্দর অন্য কথাগুলির মধ্যে রয়েছে শ্লেষ: 'যে একটা ঠিক বোঝে সে সব বোঝে'-র আর এক অর্থ : যে একটা ঠিক বোঝে না, সে সবই ভুল বোঝে। যে ঈশ্বর বোঝে না, সে কোনো কিছুই ঠিক বুঝতে পারে না। তাই বিদ্যাসাগর ঈশ্বর বোঝেন না, কিন্তু এটা বোঝেন যে 'সংসারে প্রবেশ করে, বিয়ে করে ছেলেমেয়ের বাপ হওয়াই ঠিক'। পড়াশোনা সমাপনান্তে চাকরিবাকরি করে সংসারে প্রবেশ করে ছেলেপুলের বাপ হওয়ায় বিবেকানন্দর ঘোর আপত্তি। তাঁর মনে যৌন সংস্রব আর অতিপ্রজনন বাঙালি হিন্দু ভদ্রসমাজকে শেষ করে দিয়েছে। যে-শিক্ষা সেই পথ থেকে বাঙালি তরুণদের নিবৃত্ত করে না, সে শিক্ষা তাঁর কাছে শিক্ষাই নয়। এদিকে বিদ্যাসাগর যে শিক্ষার কারবারি তাতে ব্রহ্মচর্য পালন, নারীদের থেকে যোজন হস্ত দূরে থাকা, যৌনতাকে পাপ মনে করা ইত্যাদি নীতিশিক্ষার কোনো স্থান নেই। বিবেকানন্দর মতে, তার কারণ বিদ্যাসাগর ঈশ্বরবিশ্বাসী নন। যে মানুষ ঈশ্বরবিশ্বাসী

নয়, ঈশ্বরকে নিয়ে ঠাট্টাতামাশা করতে যাঁর বাধে না, তিনি প্রকৃত শিক্ষার মর্ম বুঝবেন কি করে? এটাই মনে হয় বিবেকানন্দর ঐ শ্লেষের গূঢ়ার্থ।

যৌনতা পরিহারী ব্রহ্মচর্যর দৌলতেই তাঁর স্মৃতিশক্তি এমন তীক্ষ্ণ, একথা বিবেকানন্দ নিজে বহুবার বহু উপলক্ষে বলেছেন। ১৯০১ সালে শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বলেন, 'একমাত্র ব্রহ্মচর্য পালন ঠিক ঠিক করতে পারলে সমস্ত বিদ্যা মুহূর্তে আয়ত্ত হয়ে যায় - শ্রুতিধর, স্মৃতিধর হয়। এই ব্রহ্মচর্যের অভাবেই আমাদের দেশের সব ধ্বংস হয়ে গেল'।[৫] বিদ্যাসাগর তাঁর শিক্ষাদর্শে সংযম ও শৃঙ্খলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিলেও, প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মচর্য আদর্শকে একেবারেই স্থান দেননি। তাই বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শ বিবেকানন্দর কাছে অর্থহীন শুধু নয়, ক্ষতিকারক। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় সম্বন্ধে তাঁর বহুপরিচিত মন্তব্য : 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ', 'গোপাল অতি সুবোধ বালক', - এতে কোন কাজ হবে না। ওতে মন্দ বৈ ভাল হবে না। রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ থেকে ছোট ছোট গল্প নিয়ে অতি সোজা ভাষায় কতকগুলি বাঙলাতে আর কতকগুলি ইংরেজীতে কেতাব করা চাই। সেইগুলি ছেলেমেয়েদের পড়াতে হবে'।[৬] তবে অন্য বহু প্রসঙ্গের মতো এ ব্যাপারেও তাঁর অন্য মতও পাওয়া যায় ঃ

> বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগ অনেকক্ষণ ধরে উল্টেপাল্টে দেখ্যে স্বামী বিবেকানন্দ একদিন বলেছেন - শিশুমনের সঙ্গে নিবিড় একাত্মতা অনুভব করে তাকে ধাপে ধাপে ভাষা শেখাবার চমৎকার ব্যবস্থা। বিদ্যেসাগর মশায়ের মতো পাকা শিক্ষকেরই উপযুক্ত কাজ। ভাষা শিক্ষানবীশদের জ্ঞানের স্তরভেদ, বর্ণ ও বাক্যবিন্যাস - যথাযথ এর মধ্যে করা হয়েছে'।[৭]

শিক্ষাদানের মনস্তত্ত্ব ও টেকনিক সম্বন্ধে মুন্‌শিয়ানা তাঁর কাছে প্রশংসনীয়, কিন্তু বিদ্যাসাগরের সেকিউলার শিক্ষাদর্শ নয়।

তরকারি আর ভাত

বিদ্যাসাগরের শিক্ষামুখী সেকিউলার শিক্ষাদর্শের পাল্টা যে-শিক্ষাদর্শ বিবেকানন্দ পেশ করলেন তাতে ধর্মের - তাঁর প্রকল্পিত নব্যহিন্দু ধর্মের - ভূমিকা মৌলিক : 'চাই Western Science -এর সঙ্গে বেদান্ত, আর মূলমন্ত্র ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা আর আত্মপ্রত্যয়'। লক্ষ্য স্পষ্ট করে দিয়ে তিনি বলেন, 'সবই শেখানো হবে বটে, কিন্তু গোড়ার কথা ধর্ম। ধর্মটা যেন ভাত, আর সবগুলো তরকারি। শুধু তরকারির খেয়ে হয় বদহজম, শুধু

ভাতেও তাই'।[৮] ম্যাজিক লণ্ঠন ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে শিক্ষিত যুবক সন্ন্যাসীরা দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানশিক্ষা পৌঁছে দেবে, এ ভাবনা তখনকার বিচারে সত্যিই অসাধারণ। ১৮৯৪ সালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কে লিখছেন :

> গোটাকতক ক্যামেরা, কতকগুলো ম্যাপ, গ্লোব, কিছু chemicals (রাসায়নিক দ্রব্য) ইত্যাদি চাই। তারপর তাদের Astronomy, Geography (জ্যোতিষ, ভূগোল) প্রভৃতির ছবি দেখাও আর 'রামকৃষ্ণ পরমহংস উপদেশ কর - সন্ধ্যার পর, দিন-দুপুর কত গরীব মূর্খ বরানগরে আছে, তাদের ঘরে ঘরে যাও - চোখ খুলে দাও। পুঁথি-পাতড়ার কর্ম নয় - মুখে মুখে শিক্ষা দাও।[৯]

কিন্তু 'কার্যত জনশিক্ষার অপেক্ষাকৃত কঠিন লক্ষটির চেয়ে অগ্রাধিকার পেয়ে গেল এই অভিজাতদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ'।[১০] যে প্রশিক্ষণের প্রধান অঙ্গ হলো হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বে নিরংকুশ বিশ্বাস স্থাপন। তাই অল্পদিনের মধ্যেই তাঁকে বলতে হল:

> জনসাধারণের শিক্ষা সম্বন্ধে আমার যে পরিকল্পনা ছিল, আমি উপস্থিত তা ছেড়ে দিয়েছে। ও ধীরে ধীরে হবে। এখন আমি চাই একদল অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত প্রচারক। বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা, সংস্কৃত ও কয়েকটি পাশ্চাত্য ভাষা এবং বেদান্তের বিভিন্ন মতবাদ শিক্ষা দেবার জন্য মাদ্রাজে একটি কলেজ করতেই হবে। ওর মুখপত্রস্বরূপ ইংরেজী ও দেশীয় ভাষায় পত্রিকা হবে, সঙ্গে সঙ্গে ছাপাখানাও থাকবে (১২ জানুয়ারি ১৮৯৫)[১১]

ঘরে ঘরে গিয়ে বিজ্ঞান শিখিয়ে 'গরীব মূর্খ'দের চোখ খুলে দেওয়ার কার্যক্রম অচিরে পরিত্যক্ত হলেও, মঠের মধ্যে ঘরে বসে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত প্রচারকদের সুষ্ঠু বিজ্ঞান-প্রশিক্ষণ প্রয়োজনটা, অর্থাৎ ভাত তরকারির সম্মিলনে সুষম আহারের প্রয়োজনটা বিশেষভাবে বুঝেছিলেন তিনি। আলমোড়া থেকে ১৮৯৭ সালে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখছেন:

> এক সেট Physics (পদার্থবিদ্যা) আর Chemistry -র (রসায়নের) বই ও একটা সাধারণ telescope (দূরবীক্ষণ) ও একটা microscope (অনুবীক্ষণ) ১৫০।২০০ টাকার মধ্যে সব হবে। শশীবাবু সপ্তাহে একদিন এসে Chemistry practical (ফলিত রসায়ন)-এর উপর লেকচার দিতে পারেন ও হরিপ্রসন্ন Physicsওইত্যাদির ওপর। আর বাঙলা ভাষায় যেসব উত্তম Scientific

(বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়) পুস্তক আছে, তা সব কিনবে।[১২]

এর কয়েকদিন পরেই স্বামী শুদ্ধানন্দর কাছে জানতে চাইছেন, কাজ কতদূর এগোলঃ

> আগে আমি একবার লিখেছিলাম, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধীয় কতকগুলি যন্ত্র যোগাড় করলে ভালো হয় এবং ক্লাস খুলে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন, বিশেষতঃ শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধে সাদাসিধে ও হাতেকলমে শিক্ষা দিলে ভালো হয়.....আর একটা কথা লিখেছিলাম, -যেসব বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ বাঙলা ভাষায় অনুবাদ হয়ে গেছে, সেইগুলি কিনে ফেলা উচিৎ। তার সম্বন্ধেই বা কি হলো?[১৩]

বাঙলায় বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ে তাঁর এই বিশেষ আগ্রহ খুবই উল্লেখযোগ্য তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু জনশিক্ষার সঙ্গে এমনকি ব্যাপক মধ্যবিত্তের শিক্ষার সঙ্গেও এর সম্পর্ক ছিল না। এ শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল কেবল মঠের চত্বরের মধ্যে, দীক্ষিত ও দীক্ষালাভেচ্ছু সন্ন্যাসীদের মধ্যে। তরকারি সহযোগে ভাত শুধু তাদেরই ভোজ্য।

শি া ও মুক্ত চি ন্া

ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের মতো তাঁরও একটি যথার্থ অভিযোগ এই যে ওটা কেবল 'চূড়ান্ত কেরানি-গড়া-কল বৈ নয়'। কিন্তু শুধু সেই কারণেই যে ঐ শিক্ষাব্যবস্থা ক্ষতিকর তা নয়। তাঁর মতে, ঐ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে 'মানুষগুলো একেবারে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস বর্জিত হচ্ছে। গীতাকে প্রক্ষিপ্ত বলবে; বেদকে চাষার গান বলবে'।[১৪]

এখানে কি সরাসরি অক্ষয়কুমার দত্ত ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দিকে, এমনকি খোদ বিদ্যাসাগরের দিকে, আঙুল তুললেন তিনি? কেননা, অক্ষয়কুমার দত্ত সত্যিই বলেছিলেন, মহাভারতীয় মূল উপাখ্যানের সহিত কৃষ্ণপ্রধান ভগবদ্গীতার কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। ঘোরতর যুদ্ধবর্ণনার মধ্যে একখানি পরমার্থ-প্রধান সঙ্কলিত দর্শন-শাস্ত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রকৃত হাটের মাঝে ব্রহ্মজ্ঞান। ঐ প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য কি জান? জীবাত্মার ধ্বংস হয় না, অতএব যত ইচ্ছা নর-হত্যা কর, তাহাতে কিছুমাত্র পাতক নাই'।[১৫] আর শাস্ত্রীমশাই সত্যিই বলেছিলেন, বেদ হল ভিন্ন ভিন্ন কালের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন মহাকবি প্রণীত কতকগুলি কবিতা গান আদি সংগ্রহ মাত্র। .....মানবজাতির তখন শৈশবকাল .....তাঁহারা জগতের যাবতীয় বস্তুকেই শিশুর চক্ষে দেখিতেন,কবির চক্ষে দেখিতেন'। [১৬] ১৮৫৩ সালে, ছাত্রদের

সংস্কৃত ও ইংরেজি একই সঙ্গে পড়ানো উচিৎ কি না তা নিয়ে জে আর ব্যালান্টাইনের সঙ্গে বিতর্কের সময় বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গক্রমে লিখেছিলেন, 'একথা মানতে হবে হিন্দু দর্শনে এমন অনেক অনুচ্ছেদ আছে যাকে স্বচ্ছন্দে, যথেষ্ট বোধগম্য ইংরেজিতে অনুবাদ করা যায় না; তার একমাত্র কারণ, তাদের সারবস্তু কিছুই নেই।'[১৭] এই বিশ্লেষণাত্মক, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি খড়্গহস্ত ছিলেন বিবেকানন্দ, কেননা তাঁর মতে শাস্ত্র অপৌরুষেয়; তাকে কাব্য-সংকলনের সঙ্গে তুলনা করা অনভিপ্রেত।

কিন্তু মতভিন্নতার প্রতি এতখানি অসহিষ্ণুতাই কি খুব অভিপ্রেত? শিক্ষার একটি মৌলিক উপযোগিতাই তো নিজস্ব চিন্তার, নিজস্ব বিশ্লেষণী দক্ষতার মান বাড়ানো, ঠিক যে -জিনিসটার জন্য বিবেকানন্দ এত মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। সেটাকে বাদ দিলে তো একমাত্রিক আপ্তবাক্যর চর্বিতচর্বণ ছাড়া আর কিছুই থাকে না। সেটাই কি বিবেকানন্দের মতে আদর্শ শিক্ষা?

সংক্ষেপে বলতে পারি, বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন শিক্ষা হবে ধর্মনিরপেক্ষ, বিবেকানন্দ বললেন, ধর্মই তাঁর শিক্ষা কার্যক্রমের প্রধান খুঁটি। বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন, বেদান্ত আর সাংখ্যের পথ ছেড়ে অভিজ্ঞতাবাদী (এম্পিরিসিস্ট)দর্শনের আলোকে বিজ্ঞানমুখী শিক্ষার বনেদ গড়তে হবে; বিবেকানন্দ বললেন, বেদান্তই তাঁর শিক্ষা-কর্মসূচির মূল অঙ্ক। বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন, প্রাচীন হিন্দু দর্শনের সঙ্গে মিলল কি মিলল না, সে বিচার বাদ দিয়ে আধুনিক বিশ্বজনীন বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসেবেই আয়ত্ত করতে হবে; বিবেকানন্দ বললেন, সর্বজ্ঞ ঋষিরা আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্যগুলি সবই জানতেন, আধুনিক বিজ্ঞানের কাজ হল তাঁদের প্রজ্ঞার সঙ্গে নিজেকে মেলানো।

দু'জনের শিক্ষাভাবনা সম্পূর্ণ বিপরীত দুই খাত ধরে বিকশিত হয়েছে।

বিদ্যাসাগর যে সাংখ্যর বিরোধিতা করেছিলেন তা অবশ্য প্রাচীন, অনীশ্বরবাদী সাংখ্য নয়। পরবর্তীকালের বেদান্ত ঘেঁষা ভেজাল সাংখ্য। দ্রষ্টব্য রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, বিদ্যাসাগর কোন্ সাংখ্যর কথা ভেবেছিলেন? বিদ্যাসাগর; নানা প্রসঙ্গ; চিরায়ত, কলকাতা ২০১১, পৃষ্ঠা১২২-১২৬

সুত্রনির্দেশ ঃ

১. রাজাগোপাল চট্টোপাধ্যায়, কলম্বো থেকে কামাখ্যা, লেখক-প্রকাশিত, ২০০১ পৃষ্ঠা ২৫৫

২. Manomohan Ganguly, *The Swami Vivekananda : A Study*(1909), 1962, Contemporary Publishers Pvt. Ltd., Calcutta, .29

৩. বিদ্যাসাগর নাই, (সম্পা সনৎকুমার গুপ্ত, শঙ্খমালা বসাক, সোমা চক্রবর্তী), বিশ্বকোষ পরিষদ, কলিকাতা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ৬৪-৬৭

৪. শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত দ্বিতীয় খন্ড, উদ্বোধন, কলকাতা ১৯৯৬ পৃষ্ঠা ১২৩৯

৫. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধন, কলকাতা ২০০১, পৃষ্ঠা ৫২৮

৮. বাণী ও রচনা, ৯-৪০৫

৭. ইন্দ্রমিত্র, করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, (১৯৬৯) আনন্দ, কলকাতা ২০০১, পৃষ্ঠা ৫২৮

৮. বাণী ও রচনা, ৯-৪০৫

৯. পত্রাবলী, উদ্বোধন, কলকাতা, ২০১২, পৃষ্ঠা ১৫৯

১০. সুমিত সরকার, কলিযুগ, চাকরি ভক্তি ঃ রামকৃষ্ণ ও তাঁর সময়(অনু দেবব্রত পালধি), সেরিবান(২০০২), কলকাতা ২০০৬, পৃষ্ঠা ৭৯

১১. পত্রাবলী, পৃষ্ঠা ২৮১

১২. পত্রাবলী, পৃষ্ঠা ৫৬১

১৩. পত্রাবলী, পৃষ্ঠা ৫৭৪

১৪. বাণী ও রচনা, ৯-৪০১

১৫. অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় দ্বিতীয় খন্ড (১৮৮৩) উপক্রমণিকা, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৯, পৃষ্ঠা ২৫৪

১৬. প্রতিরোধ, উৎস মানুষ, কলকাতা ১৯৯১, পৃষ্ঠা ৭১৭২

১৭. বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ৫২৭

মধ্যবিত্তের কল্পনাবিলাস ও বিবেকানন্দের শূদ্র জাগরণ

কণিষ্ক চৌধুরী

(১)

আমরা কথা বলছি বিবেকানন্দের শূদ্র জাগরণ নিয়ে। আলোচনাকালে অনেক কটু ও অপ্রিয় প্রসঙ্গ আসতে পারে। তাতে বিচলিত না হওয়াই ভালো। এমন পরমার্শই দিয়েছেন বিবেকানন্দের গুরুভাই সারদানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (২০১২)-র ষষ্ঠ খন্ডে প্রকাশিত 'বর্তমান ভারত' নামক প্রবন্ধের ভূমিকায় তাঁর পরামর্শটি এইরকম : ''নিন্দার কটু কশাঘাতে অভিজাত ব্যক্তির হৃদয়ে আত্মানুসন্ধান এবং সংশোধনেচ্ছাই বলবতী হয়, কিন্তু ইতর ব্যক্তির হৃদয় ঐ আঘাতে জঘন্য অসত্য, হিংসা, সত্যগোপন প্রভৃতি কু-প্রবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অবনতির পথে দ্রুতপদসঞ্চারে অগ্রসর হয়''(২০১২: খন্ড ৬: ১৭২)। বিবেকানন্দ ভক্তদের সারদানন্দ প্রদর্শিত পথেই গ্রহণ করতে অনুরোধ করছি।

(২)

বর্তমান আলোচনায় বিবেকানন্দের শূদ্র জাগরণের ধারণাটি নির্মাণের সামাজিক প্রেক্ষাপটটি যেমন বোঝার চেষ্টা করা হবে, তেমনি তিনি এ প্রসঙ্গে ঠিক কি বলতে চেয়েছেন তাও দেখা হবে। এই আলোচনায় মূলতঃ বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার উপরই গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং সেগুলিই এখানে তথ্য উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হবে। এভাবেই তাঁর ধারণাটির নির্মোহ বিচার সম্ভব বলে মনে করি।

(৩)

১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে দিয়ে দুটি সমস্যার সমাধান হল। প্রথমতঃ যে বিপুল পরিমাণ অর্থ দেশিয় বণিক, মুৎসুদ্দি, দালাল প্রমুখের হাতে জমে ছিল তাকে জমির দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া সম্ভব হলো। শিল্প বিপ্লবের সম্ভাবনা যতটুকু ছিল তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হলো। দ্বিতীয়তঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জন্ম দিল এমন এক জমিদার শ্রেণীর যারা ছিল ব্রিটিশ শাসনের প্রবল সমর্থক। এই বন্দোবস্ত সামন্ততন্ত্রকে নবরূপ দিল, আরও শক্তিশালী করে তুললো। এই ঔপনিবেশিক পর্বে

আবির্ভাব ঘটলো এক দ্বিতল অর্থনীতির। ওপরের তলায় 'সংগঠিত ক্ষেত্র'(Organised Sector) যেখানে থাকে আধুনিক কারিগরি কৌশল, জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, ব্যাংক, আমদানি-রপ্তানি ব্যবস্থা ইত্যাদি। আর নীচের তলায় প্রাক্-শিল্প বিপ্লব কুটির শিল্পের কারিগরি, কোম্পানির জায়গায় অতিক্ষুদ্র ব্যক্তিগত ব্যবসা, ব্যাংকের বদলে সনাতন মহাজন ও অন্তর্দেশীয় সওদাগরিতে পাইকার-ফড়ে-শেঠ-সরফদের সাবেকি চালচলন। এই দ্বিতল অর্থনীতিতে (dual economy) ওপর তলাটাকে আধুনিক বলা গেলেও নীচের তলাটা কখনই নয়। (সব্যসাচী ভট্টাচার্য। ১৪১৪ বাং :২২)

এই দ্বিতল অর্থনীতি আবার শিক্ষা, সংস্কৃতি, মনন, ভাবাদর্শ ও সমাজ ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও সৃষ্টি করেছিলো এক দ্বৈততার।

ঔপনিবেশিক পর্বের এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক দ্বৈততার মধ্যেই আবির্ভাব ঘটলো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। আঠারো শতকে এই শ্রেণীর ভ্রূণ সৃষ্ট হলেও উনিশ শতকেই তা পূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে উঠলো। ঔপনিবেশিক শক্তির বিকাশের সাথে সাথেই তাদের বাড়বৃদ্ধি ঘটলো এবং সমাজে নিজেদের গুরুত্ব ও প্রভাবকে দৃঢ় রূপে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলো। এরা ছিল সমাজের সেই অংশ যারা এই দ্বৈত ভাবাদর্শের চমৎকার প্রতিনিধিত্ব করতো। এরা মুদ্রাকে, মুনাফাকে দেবতা বলে মানতো, আবার একইসাথে হিন্দুয়ানির সকল অমানবিক দিকগুলির ওপর প্রবল আস্থাশীল। এবং তাদের কাছে এ দুয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না। প্রাক্-শিল্পবিপ্লব ও শিল্পবিপ্লবোত্তর সমাজের একটি অসামান্য সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হলো এই শ্রেণীর জীবনধারা, চিন্তা ও মতাদর্শের মধ্যে।

উনিশ শতরে দ্বিতীয় ভাগটি ছিলো মধ্যবিত্তের মোহভঙ্গের কাল। যে মধ্যবিত্ত মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭-৫৮) সময় দু'হাত তুলে ব্রিটিশ শাসনকে সমর্থন করেছিল, সেই শ্রেণীই ধীরে ধীরে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হতে থাকে। ক্রমবর্ধমান কৃষি সংকট, ব্রিটিশ শোষণের মাত্রাবৃদ্ধি, শিক্ষিত বেকারসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব স্পষ্ট হতে থাকে। বিশেষ করে নীল বিদ্রোহ (১৮৬০-৬১), ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট (১৮৭৮) এবং ইলবার্ট বিল (১৮৮৩) ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে তার প্রকাশ ঘটতে থাকে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তাঁরা ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করে স্বাধীন ভারত স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। এ স্বপ্ন দেখেছিলেন একমাত্র লোকায়ত সংগ্রামের নেতারাই।

একদিকে বাঙালী মধ্যবিত্তের একাংশ ব্রিটিশ প্রজা হিসেবে বেশ কিছু সুযোগসুবিধা আদায়ের জন্য আইনানুগ সভা সমিতি গড়ে তুললো, আর অন্য অংশ জরাজীর্ণ হিন্দু

সংস্কৃতির নিয়তিবাদী দর্শনের কাছে আত্মসমর্পণ করে পেতে চাইলো আধ্যাত্মিক শান্তি, প্রাত্যহিক জীবনের থেকে একধরনের মুক্তি এবং আত্মপরিচয়। এই দুটি অবস্থানই ছিল ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের দিক থেকে নেতিবাচক। ইতিহাস এই শিক্ষাই দেয় যে, যখন মানুষ শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে সচেতন সংগঠন গড়ে তুলতে, প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়, তখনই আসে কর্তৃত্বের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। উনিশ শতকের মধ্যবিত্তের হয়তো এটাই ছিলো ঐতিহাসিক নিয়তি। বিবেকানন্দের চিন্তাভাবনা এই পরস্পরবিরোধী টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠেছিলো। 'শূদ্র জাগরণে'র ধারণাটি ছিল তারই অন্যতম প্রকাশ।

(৪)

'শূদ্র জাগরণ' নিয়ে বিবেকানন্দ সবচেয়ে বেশি আলোচনা করেছেন 'বর্তমান ভারত' নামক রচনায়। উদ্বোধন পত্রিকার প্রথম বর্ষের (বাংলা১৩০৫-০৬) ৬,৭,৮,১০,১১ সংখ্যায় এবং দ্বিতীয় বর্ষের (বাংলা ১৩০৬-০৭) ৭,৮ সংখ্যায় 'বর্তমান ভারত' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ এটি তার জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তের রচনা। এখানে তিনি তাঁর শূদ্র জাগরণের ধারণাটিকে যুক্তিসম্মত করে তোলার জন্য ইতিহাসের আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর পদ্ধতিটি কিন্তু সমস্যাসংকুল ও সংকটাকীর্ণ। সমসাময়িক ইতিহাসচর্চার থেকেও তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন প্রাচীন ভারতের পুরাণ ও মহাকাব্যগুলির ওপর। বারবার তিনি ফিরে গেছেন দুই বা আড়াই বা তিন হাজার বছরের পুরনো সময়ে। মিথগুলিকে তিনি দক্ষতার সাথে কাজে লাগিয়েছেন তার ভাষ্য নির্মাণের ক্ষেত্রে। কিন্তু অনেক সময়ই তা হয়ে পড়েছে পরস্পর বিচ্ছিন্ন, অসংবদ্ধ ও কখনো অর্থহীন। এর পিছনে অন্যতম প্রধান কারণই হলো তার মধ্যবিত্ত পশ্চাৎপট। যে স্ববিরোধী সামাজিকবর্গের তিনি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাকে এড়াবেন কি করে?

তিনি ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে মাদ্রাজে 'ভারতের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই বক্তৃতার কোথাও 'শূদ্র জাগরণে'র কথা নেই। বরং এখানে শূদ্রকে ব্রাহ্মণ হয়ে ওঠার পরামর্শ তিনি দিয়েছেন। যা আবার 'বর্তমান ভারত'-এ পাওয়া যাবে না। রচনা দুটির কালগত দূরত্ব দুই বছর। কিন্তু চিন্তাগত দূরত্ব বিরাট। শিরোনাম দেখে এমনটা মনে হতে পারে যে, তিনি 'বর্তমান ভারত'-এ ভারতের সমকালীন সমস্যা, সংকট, যন্ত্রণা ও তার থেকে উদ্ধারের পথ নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং 'ভারতের ভবিষ্যৎ' বক্তৃতায় ভবিষ্যৎ ভারত কেমন হবে এবং কীভাবে তা গড়ে তোলা হবে— এমন পরিকল্পনাই রয়েছে। কিন্তু রচনা দুটি পাঠ করলে পাঠককে হতাশই হতে হবে। 'বর্তমান ভারত'-এ পৌরাণিক গালগল্প সহকারে তিনি ইতিহাস সম্পর্কে নিজস্ব একটি

ধারণা উপস্থিত করেছেন। এটি অবিমিশ্র সনাতন হিন্দু ধারণারই অনুসারী। তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী কেবল ভারতে নয় সারা পৃথিবীতেই চারিবর্ণ অবস্থান করে এবং তারা একে অন্যের পর পৃথিবী পরিচালনার কর্তৃত্ব লাভ করে। তাঁর ভাষায়, ''ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র — চারিবর্ণ পর্যায়ক্রমে পৃথিবী ভোগ করে''(২০১২:৬:১৮০)। তাঁর ইতিহাস সংক্রান্ত এই তত্ত্ব নিঃসন্দেহে অভিনব। কারণ এ ধারণা আর কারো মাথাতেই আসেনি। তাঁর সমসময়ে কেবল নয়, এখনও পর্যন্ত এরকম আজগুবি, অনৈতিহাসিক ধারণার সমর্থনে কোন ঐতিহাসিক বা সমাজতাত্ত্বিকের রচনা দেখতে পাওয়া যায় না। ভারতে বা ইউরোপ-আমেরিকাতেও নয়। এ ধরনের অদ্ভুত ধারণার উৎস তাহলে কী? নিঃসন্দেহে ভারতীয় পুরাণ ও মহাকাব্যদ্বয়।

চারিবর্ণের ধারণার পিছনেও তাঁর একই প্রেরণা কাজ করেছে। অর্থাৎ গীতা নির্দেশিত সত্ব, রজ, তম এই তিন গুণের ভিত্তিতেই চারিবর্ণের আবির্ভাব ঘটেছে। 'বর্তমান ভারত' -এ তিনি লিখেছেন, ''সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের বৈষম্য-তারতম্য প্রসূত ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ সনাতন কাল হইতেই সকল সভ্যসমাজে বিদ্যমান আছে'' (২০১২:৬:১৭৮)। কিন্তু তিনি আবার বলেছেন পৃথিবীর প্রচীনকালে কেবল ব্রাহ্মণই ছিল, অন্য বর্ণ ছিল না। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে 'ভারতের ভবিষ্যৎ'-এ তিনি দেখিয়েছেন : ''জাতিভেদের একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা মহাভারতে পাওয়া যায়। মহাভারতে লিখিত আছে : সত্যযুগের প্রারম্ভে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতি ছিলেন। তাহারা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন। জাতিভেদ সমস্যার যতপ্রকার ব্যাখ্যা শুনা যায়, তন্মধ্যে ইহাই একমাত্র সত্য ও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা। আগামী সত্যযুগে আবার ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই ব্রাহ্মণে পরিণত হইবেন'' (২০১২:৬:১৪৬)। তাঁর এই দুই ধরনের উক্তি যেসব সমস্যা সৃষ্টি করে তাদের কয়েকটি এইরকম ঃ

প্রথমত, 'প্রাচীন যুগ' পদটির ব্যবহারের পাশাপাশি 'সত্য যুগ' পদটিরও ব্যবহার করেছেন। এই দুটি পদ সমার্থক কিনা তাঁর লেখা থেকে তা বোঝবার যো নেই। 'প্রাচীন যুগ' পদটি ইতিহাস চর্চানুযায়ী হলেও 'সত্য যুগ' পদটি নয়। সত্য যুগের ধারণাটি একান্তভাবেই ধর্মীয় অতিকথার সাথে যুক্ত। এটি অস্বচ্ছ, অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট। অর্থাৎ এই ধারণাটির ঐতিহাসিকমূল্য খুবই নগণ্য। আবার প্রাচীন যুগ বলতে তিনি ঠিক কি বুঝিয়েছিলেন তাঁর রচনাতে বা বক্তৃতায় তা একেবারেই স্পষ্ট নয়।

দ্বিতীয়ত, 'ভারতের ভবিষ্যৎ' নামক বক্তৃতায় তিনি বলেছেন যে, 'সত্যযুগে' (প্রাচীন যুগ!) সমাজ ছিল বর্ণবৈষম্য মুক্ত। কারণ সে সমাজের সবাই ছিলেন ব্রাহ্মণ। কিন্তু এই

ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে তিনি 'বর্তমান ভারত'-এ দেখালেন, সনাতন কাল (সত্য যুগ!) থেকেই গুণের বৈষম্যভেদে চতুর্বর্ণের আবির্ভাব ঘটেছে।

তৃতীয়ত, 'বর্তমান ভারত'-এ বর্ণভেদের ভিত্তি সত্ত্ব, রজ ও তম গুণ ভিত্তিক। অর্থাৎ গুণের তারতম্য অনুযায়ী সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চতুর্বর্ণের আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু 'ভারতের ভবিষ্যৎ'-এ চতুর্বর্ণের সৃষ্টির পিছনে একটি অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন। অর্থাৎ ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বনের ফলেই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের আবির্ভাব ঘটেছে।

চতুর্থত, কোন গবেষণার ভিত্তিতে সমাজে চতুর্বর্ণের আবির্ভাব এবং চিরকালীন ও সর্বজনীন ঐতিহাসিক অবস্থান তার কোনো সূত্র বিবেকানন্দ নির্দেশ করেন নি। সমাজবিজ্ঞানের কাছে দায়বদ্ধ ছাত্ররা তা অনুসন্ধান করবেই। 'ভারতের ভবিষ্যৎ-এ তিনি যে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা রেখেছেন, তাও কতটা গ্রহণযোগ্য সে নিয়ে সন্দেহ থেকে যায়। মহাভারত একটি মহাকাব্য। এর মধ্যে কবি কল্পনা থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্বাদের মিশ্রণ রয়েছে। ইতিহাস হিসেবে এই মহাকাব্য কতটা মূল্য পেতে পারে তা প্রশ্নাতীত নয়।

(৫)

'ভারতের ভবিষ্যৎ'-এ শূদ্রকে তিনি ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি জাতিভেদ প্রথার অবসান চান নি। তিনি বলেছেন, ''উচ্চতর বর্ণকে নীচে নামাইয়া এ সমস্যার (জাতিভেদ) মীমাংসা হইবে না, নিম্ন জাতিকে উন্নত করিতে হইবে''(২০১২:৫:১৮৭)। চন্ডালকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করতে হবে(পূর্বোক্ত: ১৪৮)। ব্রাহ্মণেতর জাতিগণ সংস্কৃত শিখলেই ব্রাহ্মণের তূল্য হবে (পূর্বোক্ত:১৫১)। এবং ''ভারতে ব্রাহ্মণই একমাত্র মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ''(পূর্বোক্ত:১৪৬)। সুতরাং ব্রাহ্মণকে অনুসরণ কর। এই ভাবেই তিনি 'সংস্কৃতায়ন' প্রক্রিয়ার প্রতি সদর্থক সমর্থন জানিয়েছেন।

এখানে আরও একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন, যা অহেতুক জটিলতার সৃষ্টি করেছে। তা হল, বিবেকানন্দের মতে, ''সমগ্র ভারত আর্যময়, এখানে অপর কোনো জাতি নেই'' (২০১২:৫:১৪৫)। এবং স্বাভাবিকভাবেই শূদ্রেরাও আর্য (পূর্বোক্ত:১৪৬)। প্রথম প্রশ্ন হল, 'আর্য বলতে কোন জাতিকে বোঝানো যায় কি? দ্বিতীয়ত, যদি আর্য জাতিবাচক হয়, তাহলে ভারতবাসীদের মধ্যে দৈহিক আকার ও গঠনগত দিক থেকে এত ভিন্নতা কেন? অর্থাৎ তারা একই নৃকুলভুক্ত নয় কেন? তৃতীয়ত, ভাষাগত, সংস্কৃতিগত ও

ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকেই বা এত বৈচিত্র কেন? মজার কথা হলো এই বৈচিত্র তিনি নিজেও স্বীকার করে নিয়েছেন, ''আর্য, দ্রাবিড়, তাতার, তুর্ক, মোগল, ইউরোপীয় — পৃথিবীর সকল জাতির শোনিত যেন এদেশে (ভারতে) রহিয়াছে। এখানে নানা ভাষার অপূর্ব সমাবেশ আর আচার ব্যবহারে দুইটি ভারতীয় শাখাজাতির যে প্রভেদ, ইউরোপীয় ও প্রাচ্যজাতির মধ্যে তত প্রভেদ নাই'' (২০১২:৫:১৪০)। তবুও তিনি বলবেন ভারতের সবাই আর্য, ভারতবর্ষ আর্যময়। আধুনিক ইতিহাস কিন্তু ভিন্ন কথা বলে। আর্য ভাষাগোষ্ঠী যে বহিরাগত তা আজ প্রমাণিত সত্য। রোমিলা থাপার, সুকুমারী ভট্টাচার্য, রামশরণ শর্মা প্রমুখের গবেষণা দ্রষ্টব্য। তাই এ বিতর্কে প্রবেশ করা অর্থহীন।

'ভারতের ভবিষ্যৎ'(১৮৯৭) নামক বক্তৃতার দুবছর পরেই প্রকাশিত 'বর্তমান ভারত'(১৮৯৯)-এ যখন তিনি শূদ্র জাগরণের কথা বলেন, তখনও তাঁর কাছে 'শূদ্রত্ব' একটি নেতিবাচক শব্দ। ভারতবাসীর একটি গুণই তার নজরে এসেছে (বর্তমান ভারত) পশুত্ব, শূদ্রত্ব (২০১২:৬:১৮৭)। ভারতবর্ষ হলো শূদ্রপূর্ণ দেশ (পূর্বোক্ত ১৮৮)। শূদ্রদের বৈশিষ্ট বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন — তারা স্বজাতিদ্বেষী, অজ্ঞ, অশিক্ষিত, বিজাতীয় অনুকরণে সিদ্ধ ও একতাহীন। তাদের চেষ্টার তেজ নেই, উদ্যোগে সাহস নেই, মনে বল নেই, অপমানে ঘৃণা নেই, দাসত্বে অরুচি নেই, হৃদয়ে প্রীতি নেই, প্রাণে আশা নেই (পূর্বোক্ত:১৮৭-৮৮)। তবু তাঁর ভবিষ্যৎবাণী হলো এহেন শূদ্র একদিন প্রাধান্য পাবে, পৃথিবী ভোগ করবে। শূদ্র শাসন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীটিও লক্ষ্যণীয়। তিনি 'বর্তমান ভারত-এ লিখেছেন, ''..... এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্ব সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে। অর্থাৎ বৈশ্যত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্র জাতি যে প্রকার বলবীর্য বিকাশ করিতেছে তাহা নহে, শূদ্র ধর্মকর্ম-সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে আধিপত্য লাভ করিবে'' (২০১২:৬:১৮৮)। কিন্তু তাদের শাসনের ফল যে ভালো হবে না, তা বিবেকানন্দের রচনাতেই স্পষ্ট। কারণ, ''যুগ যুগান্তের পেষণের ফলে শূদ্রমাত্রেই হয় কুক্কুরবৎ পদলেহক, নতুবা হিংস্র পশুবৎ নৃশংস। আবার চিরকালই তাদের বাসনা নিষ্ফল; এ জন্য দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় তাদের একেবারেই নাই'' (পূর্বোক্ত : ১৮৮)।। অর্থাৎ, যারা দেখান যে, শূদ্র বা মেহনতি মানুষের ভবিষ্যৎ বিজয় ঘোষণার সদর্থক বার্তা বিবেকানন্দ দিয়েছিলেন তা একেবারেই শূন্যগর্ভ। তিনি শূদ্র চরিত্রকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন, সেই চরিত্র সম্পন্নরা যদি দেশের শাসক হয়, সমাজের মাথা হয়, তাহলে সে দেশের অবনতি হয়, কল্যাণ অসম্ভব এবং সুশাসন মরীচিকায় পরিণত হয়। তাই একথা বলাই যেতে পারে যে, আসলে তিনি শূদ্রশাসনকে ইতিহাসের বিকাশ সংক্রান্ত নিজস্ব তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেই তার অনিবার্যতার কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু তা তার আকাঙ্খিত ছিল না। যদি থাকতো তাহলে তিনি শূদ্র শাসনের সদর্থক দিকগুলিরও

উল্লেখ করতেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে তিনি একটি শব্দও ব্যয় করেন নি।

বিবেকানন্দ ব্রাহ্মণদের সমালোচনা করেছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রকে নয়। আবার সমালোচনার নির্বিষ বাক্যগুলির পাশাপাশি ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধাও প্রকাশ করেছেন। শূদ্রদের সম্পর্কে তাঁর নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীটি এই ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক মনোভাব দ্বারাই গভীরভাবে প্রভাবিত। শূদ্রকে সংস্কৃত শিক্ষা গ্রহণ করে ব্রাহ্মণ হবার কথা বললেও, তিনি মনে করতেন যে, শূদ্ররা সচেতন হলেও শূদ্রই থেকে যাবে। তিনি বলেছেন, ''জ্ঞানোন্মেষ হলেও কুমোর কুমোরই থাকবে, জেলে জেলেই থাকবে, চাষা চাষই করবে''(২০১২:৯:৬৮)। তাহলে দাঁড়ালো টা কী? শুদ্র শূদ্রই থাকবে, সে কোনোদিনই ব্রাহ্মণ হতে পারবে না। আর যেহেতু ব্রাহ্মণত্ব না পেলে শূদ্রের উন্নতি হবে না, তাই শূদ্রের আর উন্নতি সম্ভব নয়। এইভাবে শূদ্র জাগরণের গোটা তত্ত্বটা তিনি নিজেই খারিজ করে দেন। একইসাথে বাতিল হয়ে যায় তাঁর অপর আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী ঃ ''আগামী সত্যযুগে আবার ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই ব্রাহ্মণে পরিণত হবেন'' (২০১২:৫:১৪৬)।

(৬)

'শূদ্র' শব্দটির অর্থ বিবেকানন্দের কাছে বর্ণব্যবস্থার নিম্নতলে থাকা একটি সামাজিক গোষ্ঠী। যত্রতত্র তিনি 'শ্রেণী', 'সম্প্রদায়' ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু 'সামাজিক শ্রেণী' হিসেবে তাদের তিনি সংজ্ঞায়িত করেন নি। এবং বর্ণব্যবস্থার ক্রমোচ্চ স্তর বিন্যাসটি যে সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর সাথে সংযুক্ত বা এই বর্ণগুলি কোন সামাজিক ভূমিকা পালন করে এবং অন্যান্য অংশের সাথে কেমন সম্পর্ক তৈরি করে - তার কোনো উল্লেখ বিবেকানন্দের রচনাতে পাওয়া যায় না। যদিওবা কোথাও এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করে থাকেন, সেখানেও কিন্তু গভীর বিশ্লেষণ অনুপস্থিত। সমাজবিজ্ঞানের অপরিহার্য শর্ত হলো - কোনো তত্ত্বকে নির্মাণের জন্য প্রয়োজন প্রকল্প গঠন, ব্যবহৃত শব্দের সংজ্ঞায়ন, শ্রেণীকরণ ও যুক্তির পরম্পরা রক্ষা। তিনি তার ধারকাছ দিয়ে যান নি। তিনি বহুভাবনাকে জোর করে চাপিয়ে দিতে চেয়েছেন এবং অনাগ্রহীদের ভীতি প্রদর্শন করেছেন। ফলে তাঁর শূদ্র জাগরণের তত্ত্ব আর যাই হোক সমাজবিজ্ঞান হয়ে উঠতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, হিন্দু ধর্মের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত হতে না পারার দরুন ব্রাহ্মণকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন এবং শূদ্রকে হতমান করেছেন। লক্ষ্য করবার বিষয় হলো নিজে ব্রাহ্মণ না হওয়া সত্ত্বেও তার এই ধারণা এটা দেখায় যে তিনি কতটা পরিমাণে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র দ্বারা hegemonaized ছিলেন।

(৭)

শুরুর কথাতে ফেরা যাক। উনিশ শতকের বাঙালী মধ্যবিত্তের দ্বৈতসত্ত্বা অসাধারণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে বিবেকানন্দের এই ধারণার মধ্যে। বিবেকানন্দ স্বচ্ছলতা ও দারিদ্র উভয়কেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ঔপনিবেশিক শিক্ষার সুযোগে ইউরোপীয় যুক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে তাঁর পরিচয় ছিল বেশ ভালোভাবেই। কিন্তু সামন্ত সমাজের জারক রসে জারিত সামাজিক সংস্কৃতির উত্তরাধিকারও তিনি পেয়েছিলেন। ফলে তাঁর মধ্যে ছিল দারিদ্র পীড়িত মানুষের জন্য সহানুভূতি। নিম্নবর্ণের উপর ব্রাহ্মণদের অত্যাচার তাঁকে ব্যথিত করেছিল। সেই আবেগ দ্বারা পরিচালিত মানুষটি পথ খুঁজেছিলেন মানুষের দুঃখ মোচনের। ইউরোপীয় জাতি দাম্ভিকতায় অপমানিত হয়েও বাধ্য হয়েছিলেন আত্মসমর্পণে। ফলে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানকেও তাঁর পক্ষে পুরোপুরি গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ স্পৃহা তাঁকে ঠেলে দিল অতীতচারী হবার দিকে। তিনি 'সত্যযুগে'র সন্ধানে ব্রতী হলেন। হিন্দু ধর্মকে ভারতীয়ত্বের সাথে একাকার করে দিলেন। আর্যত্বের জয়গান গাইলেন। এসবই ছিল উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে পৌঁছনো বাঙালী মধ্যবিত্ত মানস। তারা শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করেছিলেন। এবং 'চামার' শাসন নিয়ে শঙ্কিতও ছিলেন। ধর্ম তাঁরা মানতেন, কিন্তু গোঁড়ামীগুলিকে পাল্টাতে চাইতেন, কারণ ব্যবহারিক জীবনে এগুলি ছিল অসুবিধাজনক ও পশ্চাৎপদতার চিহ্ন। আর এই সীমাবদ্ধতাই মধ্যশ্রেণীকে বিচিত্র কল্পনা বিলাসের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। বিবেকানন্দ এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পারেন নি। পরিণামে যা দাঁড়ালো তা হলো - একদিকে ব্রিটিশ ভজনা আর অন্যদিকে সত্যযুগের কল্পনাবিলাস। 'শূদ্র জাগরণ' তাই থেকে গেলো 'এক দূরতর দ্বীপ বিকেলে নক্ষত্রের কাছে'।

তথ্যসূত্র ঃ

১। স্বামী বিবেকানন্দ, ২০১২, বাণী ও রচনা। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও নবম খন্ড। কলকাতা ঃ উদ্বোধন কার্যালয়।

২। ভট্টাচার্য, সব্যসাচী। ১৪১৪ বাংলা। ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি। কলকাতা ঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

পুণা চুক্তি ঃ প্রেক্ষাপট, প্রসঙ্গ এবং ফলশ্রুতি

সুনীল কুমার রায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফলে ব্রিটিশ সরকার রীতিমত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। অতি দূরের উপনিবেশ ভারতের শিল্পে নিয়োজিত তাঁদের পুঁজির সিংহভাগ, অথচ যোগাযোগের পথ সুগম নয় মোটেই এবং ভবিষ্যতে দুর্গম হওয়ার আশঙ্কাই প্রবল। আতঙ্ক সে জন্যই। অতঃপর তাঁদের পুঁজিপতিদের ভারতে লগ্নীকৃত বিরাট পুঁজির ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের হাতে পর্যায়ক্রমে শাসনভার অর্পণ করার পরিকল্পনা ব্যতীত শ্রেয়তর পন্থা তাঁরা খুঁজে পেলেন না। সুতরাং তা কার্যকর করার জন্য মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসনসংস্কার প্রস্তাব (Montegu-Chelmsford Reforms Proposal, 1917) পেশ করা হল। ইতিমধ্যে বাংলার নমো, পৌণ্ড্র ও রাজবংশীদের উদ্যোগে প্রদেশে প্রদেশে নিপীড়িত জাতিবর্গের জনসংখ্যার অনুপাতে চাকরি এবং পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের দাবি জানাতে All India Depressed Classes Association গঠিত হয়েছে। প্রবল জনসমর্থনপুষ্ট এই সংগঠনের আন্দোলন সারাদেশে তীব্র আকারে ছড়িয়ে পড়ার সূচনাতেই ব্রিটিশ সরকার সংগঠনটির গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের মনোনয়নের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার এবং তাঁদের নিজেদের হাতে গড়া কংগ্রেস আর মুসলিম লিগকে ভারতীয় সংসদীয় রাজনীতিতে বিশিষ্ট স্থানে সংস্থাপনের লক্ষ্যে The Government of India Act, 1919 প্রণয়ন করে। তার ফলে এই আইনে Central Legislative Assembly তে ১ জন এবং প্রাদেশিক আইনসভাগুলির মধ্যে Central Province-এ ৪ জন, Bihar ও Bombay তে ২ জন করে এবং Bengal আর United Province -এ ১ জন করে নিপীড়িত জাতির প্রার্থীকে সরকারের মনোনীত সদস্যপদ প্রদানের বিধান ঘোষিত হয়। ["The Act of 1919 recognised for the first time in Indian history the existence of the Depressed Classes. Among tthe fourteen non-Official Members nominated by the Governor General to the Central Legislative Assembly. One was the representative of the .....Depressed Classes. In the Provincial Legislatures, they were represented by four nominees in the Central Province, two each in Bombay and Bihar and one each

in Bengal and United Province. In Madras 10 members were nominated to represent .....the Depressed Classes. - Dhananjoy Keer, Dr. Ambedkar:Life and Mission, P-48, Popular Prakashan Pvt. Ltd. Bombay (1971)" এইভাবে মনোনয়নের মাধ্যমে সরকারি কৃপাধন্য সদস্যপদ দিয়ে ব্রিটিশ রাজশক্তি নিপীড়িত জাতিগুলির সংগ্রামী নেতাদের প্রকৃতপক্ষে সংগ্রামবিমুখ তাঁবেদাররূপে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে এই জাতিগুলির আন্দোলন অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে চেষ্টা করেছিল। একথা সগর্বে উল্লেখ করতেই হয় যে, গুরুচাঁদের নেতৃত্বে চালিত নামোজাতি সেইসময় ব্রিটিশ সরকারের সেই দুরভিসন্ধিকে ব্যর্থ করে দিয়ে নিপীড়িত জাতিগুলির আন্দোলনকে ক্রমোন্নত স্তরে উত্তোলিত করতে পেরেছিলেন।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে বরিশাল থেকে নমোজাতির একমাত্র প্রার্থী নিরোদবিহারী মল্লিক জয়লাভ করেন। পৃথক নির্বাচনের অধিকারী মুসলমানরা ব্যতীত অবশিষ্ট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশের অধিক নিপীড়িত জাতিসমূহের আবাস বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা, যশোহর এবং খুলনা থেকে নমোজাতির আর কোন প্রার্থীই জয়লাভ করতে পারলেন না। ভোটার লিস্ট তৈরির পর্ব থেকে শুরু করে ভোট গণনা পর্যন্ত সকল পর্বে বিশেষ কারিকুরির দৌলতেই যে নির্বাচনে জমিদার, মহাজন, আইনজীবী ইত্যাদি অভিজাত ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রীদের জয়-জয়কার ঘটেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। ব্রিটিশরা এর মধ্য আশার আলো দেখতে পেয়েছিলেন।

নির্বাচনোত্তর কালে ভীষ্মদেব দাস সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্যরূপে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভায় প্রবেশ করেন এবং তার ফলে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে নমোজাতির ২জন প্রতিনিধি সর্বপ্রথম সংসদীয় সংগ্রামে যোগ দেন। তাঁরা নিপীড়িত জাতিগুলির জীবিকা, শিক্ষা, সরকারী চাকরি প্রভৃতি সংক্রান্ত বহুবিধ বাস্তব সমস্যার সমাধানের জন্য বিভিন্ন উপযুক্ত পরিকল্পনা পেশ করে, প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণে প্রশাসনিক ঔদাসীন্য অথবা শৈথিল্যকে নির্দেশ করে দিয়ে, সরকারি দ্বিচারিতাকে প্রকাশ্যে এনে এবং ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রীদের মেকি জাতীয়তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে আইনসভাকে সরগরম করে রেখেছিলেন। 'জাতীয়তাবাদী' স্বরাজিদের চলমান অসহযোগ আন্দোলন প্রসঙ্গে আইনসভায় নীরোদবিহারী মল্লিকের অসাধারণ ভাষণের অংশবিশেষ ছিল এইরূপ —

I know the term 'nation' in India is a misno-

mer.....responsible Government ..... cannot be established until and unless there has been an all round progress of all classes ..... If there is a desire in a certain quarter to establish a premature self-government by any such movement as that of non-cooperation the sooner the idea is banished from Bengal and from India the better.

-[Sekhar Bandyopadhyay, Caste, Protest and Identity in Colonial India, p - 119]

(আমি জানি যে, ভারতে 'nation' শব্দটি একটি ভ্রান্ত নামকরণ। সবশ্রেণির মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন ব্যতিরেকে এদেশে কোন দায়িত্বশীল স্বশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। .....যদি কোন অংশের মানুষের মধ্যে অসহযোগের মত আন্দোলনের দ্বারা একটি অপরিণত স্বরাজ স্থাপনের আকঙ্খা থাকে তাহলে বাংলা এবং ভারত থেকে যত দ্রুত এমন ভাবনা নির্বাসিত হয় ততই মঙ্গল।

এই স্বরাজিদেরই একদল তরুণ বয়সে বয়কট আন্দোলনে নেমে পুরুষদের অনুপস্থিতির সুযোগে এক নমোনারীর পরিহিত কাপড়খানি বিদেশী কিনা তা পরীক্ষা করার অছিলায় বস্ত্রহরণের ন্যায় দুষ্কর্মে উদ্যত হয়েছিলেন। ["In one instance they were said to have tried to strip a woman of the cloth she was wearing on the ground that it was foreign." Do,p-68] তাঁদের এবং তাঁদের পরিচালক অম্বিকাচরণ মজুমদার, অশ্বিনী কুমার দত্ত ইত্যাদি জমিদারি শোষণের প্রতিভূদের সম্পর্কে নীরোদবিহারীর বক্তব্য যে অত্যন্ত সমীচীন ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ভীষ্মদেব দাসও ছিলেন সুবক্তা। কৃষি ও কৃষকের উন্নতির স্বার্থে নানাস্থানে জলনিকাশি খাল খনন, গ্রাম্য অঞ্চলে সরকারি উদ্যোগে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন, নিপীড়িত জাতিগুলির চাকরি সংরক্ষণ প্রভৃতি দাবিতে মুখর তাঁর অসাধারণ যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য

বহুক্ষেত্রে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে এবং ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রীদের লা-জবাব অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়ে দিতে পেরেছিল। মোটকথা হল এই যে, সংসদীয় সংগ্রামের পুরোধা সেনাপতিরূপে অত্যন্ত উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে নীরোদবিহারী মল্লিক এবং ভীষ্মদেব দাস তাঁদের জাতির গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন। স্পষ্টতই ভীষ্মদেব দাস ব্রিটিশ সরকারের মনোনীত সদস্যরূপে নিজের অবস্থানটি পাকা না করে নিপীড়িত জাতিবর্গের স্বার্থে কার্যত নির্বাচিত প্রতিনিধির ভূমিকাই পালন করেছিলেন। তার ফলে ব্রিটিশ-ব্রাহ্মণ্য চক্র এতটাই সতর্ক হয়ে উঠেছিল যে, ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে স্বরাজ্য পার্টির (কংগ্রেস দলের) মোহিনী মোহন দাস ব্যতীত নমোজাতির আর কোন প্রার্থীই জয়লাভ করতে পারলেন না এবং কেউই সরকারের মনোনয়নও পেলেন না। অতঃপর মোহিনী মোহন দাস তাঁর পার্টির অজস্র বাধা-নিষেধের মধ্যে সাধ্যমত নিজ জাতির এবং অপরাপর নিপীড়িত জাতির মানুষের শিক্ষার এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন এবং সেগুলি বাস্তবায়নের দাবিতে সর্বদাই সরব ছিলেন। এর ফল হল এই, যে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে এই জাতির কোন প্রার্থীই জয়লাভ করতে পারলেন না; তবে নির্বাচনোত্তর কালে তাঁদের নেতা রেবতীমোহন সরকার ব্রিটিশ সরকারের মনোনীত সদস্যের পদটি লাভ করলেন এবং তিনি এককভাবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভায় নিপীড়িত জাতিসমূহের স্বার্থে তাঁর জাতির আপোষহীন সংগ্রামের ধারা বজায় রেখেছিলেন। এইবারের ত্রৈবার্ষিক আইনসভার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল The Bengal Tenancy (Amendment) Bill, 1928 পাশ। প্রস্তাবিত বিলের সম্পর্কে বহু সংখ্যায় আনীত সংশোধনীগুলি বিচার করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতেই হয় যে, জমিদারদের স্বার্থরক্ষাকারী সংশোধনীগুলি স্বারাজীরা এবং বিভিন্ন প্রকারের চাষী-কৃষকের স্বার্থরক্ষাকারী সংশোধনীগুলি মুসলমান সদস্যরা, নমোজাতির সদস্য রেবতীমোহন সরকার এবং রাজবংশী সদস্য রূপনারায়ণ রায়-ই পেশ করেছিলেন ওবং সংশোধনীগুলি সম্পর্কে ভোটাভুটিতে সম্পূর্ণ অভিন্ন ধারাই প্রতিফলিত হয়েছিল। তার ফলে স্বরাজিদের অর্থাৎ কংগ্রেসীদের জনবিরোধী রূপটি জনসমক্ষে নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। ["".....utter neglect of the peoples' causes by the Swarajists become more evident when the Bengal Tenancy Bill came up for debate .....in 1928. The voting patterns on various ammendments to the bill made it clear that while the Muslims and the members of the depressed classes, like the Namasudra leader Rebati

Mohan Sarkar and the Rajbanshi leader Rup Narayan Roy, voted for the rights of the sharecroppers, undertenants and tenants against those of the landlords, the Swarajya Party members voted consistently in favour of the landlord interest, allowing in the end the original bill to be passed intact." ibid, p -138-39]

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে স্বরাজ্য পার্টির মোহিনী মোহন দাসই কেবল নমোজাতির প্রার্থীরূপে জয়লাভ করলেন। নির্বাচনের পরে কোনও গূঢ় কারণে ব্রিটিশ সরকার আইন ভেঙ্গে দুইজন সদস্যকে (রেবতীমোহন সরকার এবং মুকুন্দ বিহারী মল্লিক) বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভায় সরকারের মনোনীত সদস্যপদ প্রদান করলেন এবং কংগ্রেস (স্বরাজ্য পার্টি) তাতে কার্যত সায় দিয়ে নীরব রইলেন। ব্রিটিশ-ব্রাহ্মণ্য চক্রের যৌথ চক্রান্তের উপক্রমণিকা স্পষ্ট হতে দেরি হল না, তবে আসল চক্রান্তটি স্পষ্টতর হতে কিঞ্চিৎ সময় লাগল বৈকি!

ইতিমধ্যে নিপীড়িত জাতিবর্গের জনসংখ্যার ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচনের দীর্ঘকালের দাবির যৌক্তিকতা বিচার-বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত সুপারিশ পেশ করার জন্য ব্রিটিশ সরকার The Indian Statutory Commission, 1928 গঠন করলেন। এই কমিশনএর চেয়ারম্যানের (Sir John Simon) নামানুসারে Simon Commission নামেই সমধিক পরিচিত। সাইমন কমিশন গঠনের সঙ্গে সঙ্গে যথারীতি কংগ্রেস প্রতিবাদ জানাল এবং নিপীড়িত জাতিগুলি স্বাগত জানাতেও দেরি করল না ঠিকই কিন্তু ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষদের পৃথক নির্বাচনের সঙ্গে তাদের বিষয়টি জুড়ে দেওয়ার মধ্যে যে ব্রিটিশ চাতুর্য ক্রিয়াশীল রয়েছে তাও তাঁরা বুঝে নিলেন।

এই কমিশনে সাক্ষ্যদানের সূত্রে সারা ভারতবাসী জেনে গেলেন যে, তৎকালীন বোম্বে প্রেসিডেন্সির এক নিপীড়িত জাতির ঘরের সন্তান ব্রিটিশ আশ্রিত বরোদা ও কোলাপুরের করদরাজ্যের অর্থানুকূল্যে দীর্ঘকাল ধরে আমেরিকা ও ইউরোপের নামী দামি উচ্চতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে রাশি রাশি জমকালো ডিগ্রি অর্জন করে দেশে ফিরে এসেছেন এবং তিনি পাশ্চাত্য আদর্শে নিপীড়িত জাতিগুলির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে 'বহিষ্কৃত হিতকারিণী সভা' গঠন করেছেন। ঐ সভার পক্ষ থেকে সেই মহাপণ্ডিত ড. ভীমরাও রামজি আম্বেদকর সাইমন কমিশনে এক অভিনব প্রতিবেদন পেশ করে ব্রিটিশ সরকারের এবং ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রীদের প্রচার মাধমের দৃষ্টির কেন্দ্রে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি

তাঁর সেই প্রতিবেদনে 'নিপীড়িত জাতিগুলির জন্য কিছুসংখ্যক সংরক্ষিত আসনে যৌথ নির্বাচন'-এর দাবি পেশ করেছিলেন।

এদিকে ঐ জাতিগুলির আর একটি সংগঠন o(The Madras Central Adi-Dravida Mahajana Sabha) প্রথাগত সরকারি মনোনয়ন বহাল রাখার এবং বাকি ১৬টি সংগঠন অভিন্নভাবে তাঁদের জনসংখ্যার আনুপাতিক সংখ্যক আসনে পৃথক নির্বাচনের দাবি পেশ করে সাইমন কমিশনকে তাঁদের দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য করেছিলেন। [Eighteen Depressed Classes Associations gave evidence before the Commission and placed their memoranda before it. Sixteen of them pleaded for separate electorates for the Depressed Classes. On behalf of the Bahishkrit Hitakaraini Sabha Amedkar submitted a memorandum to the Simon Commission demanding joint electorate with reserved seats for the Depressed Classes. --- Dhananjay Keer, *Dr. Ambedkar: LIfe and Mision,* P 116] তার ফলে সাইমন কমিশন যথাসময়ে ব্রিটিশ সরকারের কাছে পৃথকে নির্বাচনের সুপারিশই পেশ করেছিল। নিপীড়িত জাতিগুলির কাছে াপাত রম্য এই ঘোষণা নির্ভেজাল সদর্থক কিনা তা অবশ্য তৎক্ষণাৎ বোঝা গেল না।

সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সত্ত্বেও এতদিন এ বিষয়ে নীরব থাকা কংগ্রেস অকস্মাৎ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধির ডান্ডি অভিযানের (১২.০৩.১৯৩০) মধ্য দিয়ে তাঁদের অসহযোগ আন্দোলনকে সক্রিয় করে তুলল এবং সাইমন কমিশনের সুপারিশ প্রত্যাহারই তাঁদের দাবির শীর্ষে চলে এল। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে ঝিমিয়ে পড়া কংগ্রেসিরা অসহযোগ আন্দোলনে হঠাৎ তীব্র গতিসঞ্চারের অনুপ্রেরণার উপকরণ কি আম্বেদকরজির আলোচ্য প্রতিবেদনের মধ্যেই খুঁজে পেলেন?

কংগ্রেসের এই পর্যায়ের উদ্দীপনাময় অসহযোগ আন্দোলনের অঙ্গরূপে স্বরাজিরা বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভা থেকে নিজেদের সদস্যপদ পরিত্যাগ করলেন। তবে পদত্যাগের পূর্বে তাঁরা The Primary (Rural) Education Bill, 1929-30 এর বিরোধিতা করে তাঁদের জনশিক্ষা বিরোধী চরিত্রটি প্রকাশ করে দিয়ে গেলেন। ["Their (Swarajist leaders) opposition to the Primary (Rural) Education Bill in 1920-30 finally destroyed credibility of these Hindu nationalists

in the eyes of the depressed classes"Shekhar Bandyopadhyay, Caste, Protest and Identity in Colonial India, p-139]

কংগ্রেস অর্থাৎ স্বরাজ্য পার্টির সদস্যদের পদত্যাগের ফলে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে যে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা'তে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভায় নমোজাতির তিনজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁরা হলেন — অমূল্যধন রায় (যশোহর থেকে), ললিত কুমার বল(বাখরগঞ্জ থেকে) এবং শরৎ চন্দ্র বল(ফরিদপুর থেকে)। [In 1930, ...the Swarajists came out of the council and in the bye-election that followed, boycotted by the Congress, three more Namasudras were elected without contest. They were Amulyadhan Roy from Jessore, Lalit Kr. Bal from Bakarganj and Sarat Chandra Bal from Faridpur, ibid, p-141] তাঁদের নিয়ে প্রাদেশিক আইনসভায় তাঁদের জাতির প্রতিনিধিদের সংখ্যা হল ৫ জন, যেখানে বাংলার নিপীড়িত জাতিগুলির প্রতিনিধিরা হলেন সর্বমোট ১০জন। গোটা প্রেক্ষাপট অনুক্ত রেখে এই নমো প্রাধান্যের জুজু দেখিয়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকার Indian Franchise Committee -এর কাছে এরাজ্যে নিপীড়িত জাতিসমূহের পৃথক নির্বাচনের বিরোধিতা করলেন। [The situation indicated beyond doubt that this particular caste was most active politically and concessions given to depressed classes in general were likely to be monopolised by them. For this reason the Bengal Government in its recomendations to the Indian Franchise committee opposed the idea of granting separate electorate to the depresssed classes in this province, ibid, p-141]

অতঃপর বোঝা গেল যে, সাইমন কমিশন গঠন, ঐ কমিশনের ঘোষণা, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভায় নমোজাতির দুইজন সদস্যকে মনোনয়নদানের সরকারি বদান্যতা এবং তাতে স্বরাজিদের মৌনতাব্যঞ্জক সায় ছিল ব্রিটিশ-ব্রাহ্মণ্য চক্রের সেই ষড়যন্ত্র যাতে এই জাতির প্রাধান্যের অজুহাত সৃষ্টি করে বাংলার নিপীড়িত জাতিগুলির পৃথক নির্বাচনের দাবিকে নাকচ করা যায়।

প্রকৃতপক্ষে এটুকু ছিল নিতান্তই বাহ্য, শুধুই উপক্রমণিকা। তাই প্রাদেশিক সরকারের এই সুপারিশ ফাইলেই বন্দী হয়ে রইল ব্রিটিশ সরকারের মূল পরিকল্পনা। সকলের

অলক্ষ্যে অন্তঃসলিলা প্রবাহে শেষ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলল। আর দৃশ্যত সাইমন কমিশনের সুপারিশ প্রত্যাহারের দাবিটি কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের কেন্দ্রে আসার ইপ্সিত সুযোগটি সদ্ব্যবহার করার জন্য ব্রিটিশ সরকার অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠল এবং অবিলম্বে লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠক (Indian Round Table Conference) আহ্বান করে সেখানে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ভারতের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের এবং নিপীড়িত জাতিগুলির পৃথক নির্বাচনের বিষয়টি সমাধান করার চাতুর্যপূর্ণ খেলাটি শুরু করে দিল। সাইমন কমিশনে নিপীড়িত জাতিবর্গের পৃথক নির্বাচনের বিরোধিতায় অবতীর্ণ ব্যারিস্টার ড. আম্বেদকর-ই লন্ডনে গোলটেবিল বেঠকে ঐ জাতিগুলির প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক আহূত হলেন। All India Depressed Classes Association-এর অগ্রণী নেতৃবৃন্দ তাঁকে অভিনন্দন জানাতে বোম্বে ছুটে গেলেন, তাঁরা তাঁকে তাঁদের পৃথক নির্বাচনের বিকল্পহীন প্রয়োজন সম্পর্কে অবহিত করলেন এবং সেই মর্মে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণের জন্য তাঁকে আবেগমথিত আহ্বান জানালেন। শুধু তাই নয়, তাঁর লণ্ডনযাত্রার দিন জাহাজঘাটায় আয়োজিত বিশাল সমাবেশ থেকেও তাঁকে একই আহ্বান জানানো হল।

এদিকে ব্যারিস্টার এম.কে. গান্ধি গোলটেবিল বৈঠকে রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিত্বের জন্য ব্রিটিশ সরকারের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন। সুতরাং ভারতের নিপীড়িত জাতিগুলির এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির আমন্ত্রিত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ব্রিটিশ সম্রাট পঞ্চম জর্জ ১২.১১.১৯৩০ তারিখে লণ্ডনে Indian Round Table Conference -এর সূচনা করে দিলেন।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধিদের প্রত্যেকের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে রাজ্যে রাজ্যে পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠার ঘোষণার এবং All India Depressed Classes Association-এর দৌত্যের যুগ্ম প্রভাবে উদ্দীপিত ড. বি. আর. আম্বেদকর তখন ব্যক্তিগত মতামতের ঊর্ধে উঠে তিনি যাঁদের প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়েছিলেন সেই নিপীড়িত জাতিগুলির মতামতকেই তুলে ধরেছিলেন এবং বৈঠকে সমাগত প্রতিনিধিবৃন্দ তাঁকে সোচ্চারে সমর্থন করেছিলেন। তার ফলে গোলটেবিল বৈঠকে ব্রিটিশ সরকারের পরিকল্পনার সম্পূর্ণ বিপরীতে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই মর্মে গৃহীত হল যে, অতঃপর ভারতের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির প্রতিটি এবং নিপীড়িত জাতিগুলি এককভাবে রাজ্যে রাজ্যে তাঁদের নিজ নিজ জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে প্রাপ্যসংখ্যক আসনে

পৃথক নির্বানের মাধ্যমে তাঁদের নিজ নিজ প্রতিনিধিদের আইনসভায় প্রেরণের অধিকার ভোগ করবেন।

গোলটেবিল বৈঠকের এই অকল্পনীয় সিদ্ধান্তের কথাটি ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাটিগণিতের অঙ্ক কষে এদেশের ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রীরা নিজেদের নিদারুণ সংখ্যলঘুতার এবং অদূর ভবিষ্যতের ভোটযুদ্ধে রাজনৈতিক এবং অতঃপর সামাজিক প্রতিপত্তি হারানোর ভয়ে আঁতকে উঠলেন, প্রমাদ গুণলেন ব্রিটিশ প্রশাসকেরা এবং ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রীরা। প্রত্নতত্ত্বের ও নৃ-বিজ্ঞানের গবেষণার সূত্রে শেষোক্তদল ইতিমধ্যেই জেনে ফেলেছিলেন যে, ভারতব্যাপী প্রাগৈতিহাসিক কালের গর্বোন্নত সভ্যতার স্রষ্টা 'ময়দানবের' অদ্ভুতকর্মা বংশধরেরা অবস্থাবৈগুণ্যে চরম নির্যাতিত অবস্থার মধ্যেও তাঁদের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে নূতন উদ্যমে আবার জেগে উঠতে চাইছেন। গোলটেবিল বৈঠকে সূচিত ঐক্য দৃঢ়তর হলে অদূর ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতে নিপীড়িত জাতিগুলি তাদের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অবস্থানটিকে সংহত করে হয়তো এমন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন যাতে ব্রিটিশ শিল্প-বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ব হতে পারে, নয়তো আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরিকে নিজেদের ঐতিহ্যগত উদ্ভাবনী পদ্ধতি প্রয়োগ করে তারা ব্রিটিশ শিল্প-বাণিজ্যকে অপাংক্তেয় করে তুলতে পারেন। এসব সম্ভাবনা স্রেফ অবাস্তব কল্পনা বলে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রীরা বা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মোটেই উপেক্ষা করতে পারল না। সুতরাং ব্রাহ্মণ্য সার্বিক প্রাধান্য এবং ব্রিটিশি পুঁজির নিশ্চিত নিরাপত্তার অনিবার্য প্রয়োজনে নিপীড়িত জাতিগুলির ক্ষমতায়ন রোধের বিকল্পহীন কর্মটি সাধনের জন্য গান্ধিজির নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলনে (Civil Disobedience) ঝাঁপিয়ে পড়তে কংগ্রেসের একটুও দেরি হল না। আর সেই আন্দোলন দানা বাঁধতে না বাঁধতেই ব্রিটিশ সরকার অত্যন্ত 'বিচলিত' বোধ করলেন এবং দিল্লিতে ০৫.০৩.১৯৩১ তারিখে ভাইসরয় লর্ড আরউইন দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গান্ধিজিকে নিরস্ত করলেন। তার ফলে অন্যান্যদের সঙ্গে পূর্বেকার প্রতিনিধিরাও যথাসময়ে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণপত্র পেলেন।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে (১৯৩১) ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রীদের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করে গান্ধিজি নিজেকে সকল ভারতবাসীর একমাত্র প্রতিনিধি বলে দাবি করে অন্যান্য সকল আমন্ত্রিত প্রতিনিধির উপস্থিতিকে-ই অবান্তর বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে প্রথমেই পুরোপুরি ব্যর্থ হলেন। আমন্ত্রিত প্রতিনিধিরা তাঁর এই উদ্ভট দাবিটি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করলেন। তাছাড়া বহুধাবিভক্ত ভারতের বাস্তব অবস্থায়

তাঁর অখণ্ড ভারতের দাবিতে মহামিলনের সূত্র কী তা ব্যাখ্যা করতে না পেরে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির পৃথক নির্বাচনের দাবিকে কার্যত স্বীকার করে নিয়ে তিনি নিপীড়িত জাতিগুলির জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে প্রাপ্য আসনের এবং সেগুলিতে পৃথক নির্বাচনের বিরোধিতায় নিজেকে নিযুক্ত করলেন, তবে তাঁর এই বিরোধিতাকে তিনি কোনমতেই যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলতে পারলেন না। যাঁদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রীদের ধর্মাচরণ, খাওয়া-দাওয়া, বিবাহাদি সামাজিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ সেই নিপীড়িত জাতিগুলির রাজনৈতিক তথা সামাজিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা তো বহুদিন পূর্বেই মানবতা বিরোধী কর্ম বলে পাশ্চাত্যে নিন্দিত হয়েছে। সুতরাং তা নিয়ে লন্ডনে গান্ধিজিকে আস্ফালন করতে দিলে হিতে বিপরীত ঘটার সমূহ সম্ভাবনার মুখে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অকস্মাৎ দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক সমাপ্ত করে দিলেন।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধিজি ব্রিটিশ বণিক ও প্রশাসকদের হতাশ করেছিলেন বটে তবে তাতে তাঁরা নিরস্ত হয়ে বসে থাকতে পারেন নি; বরং তাঁরা তখন পথান্তরের অনুসন্ধানে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। সুতরাং ব্রিটিশ সরকার একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অঙ্গরূপে 4.8.1932 তারিখে ২৩টি প্যারাগ্রাফবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ Communal Award ঘোষণা করে দিলেন যার নবম প্যারাগ্রাফে নিপীড়িত জাতিবর্গের পৃথক নির্বাচনের প্রসঙ্গটিকে এইভাবে উল্লেখ করা হয়েছে —

> Members of the "depressed classes" qualified to vote will vote in a general constituency. In view of the fact that for a considerable period these classes would be unlikely, by this means alone, to secure any adequate representation in the Legislature, a member of special seats will be assigned to them..... These seats will be filled by election from special constituencies in which only members of the "depressed classes" electorally qualified will be entitled to vote. Any person voting in such a special constituency will, as stated above, be also entitled to vote in a general constituency.[Shekhar Bandyopadhyay, Caste, Politics and the Raj, P-75]

(নিপীড়িত জাতিগুলির ভোটাররা সাধারণ নির্বাচন ক্ষেত্রে যথারীতি

অন্যান্য ভোটারদের মতই ভোট দেবেন; কিন্তু বেশ কিছুকাল যাবৎ শুধু এইভাবে ভোট দিয়ে উপযুক্ত সংখ্যায় তাঁদের নিজেদের প্রার্থীদের জিতিয়ে আইনসভায় প্রেরণ করতে তাঁরা সমর্থ হবেন না। তাই তাঁদের জন্য কয়েকটি বিশেষ নির্বাচন ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করা হবে যেগুলিতে কেবলমাত্র তাঁদের মধ্যেকার ভোটাররাই ভোট দিয়ে তাঁদের প্রার্থীদের নির্বাচিত করবেন। এর ফলে এই ভোটাররা সাধারণ এবং বিশেষভাবে নির্ধারিত উভয় নির্বাচন ক্ষেত্রে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।)

Communal Award ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রীরা 'গেল গেল' রব তুললেন। ব্রিটিশ ও ব্রাহ্মণ্য প্রচার মাধ্যম তা বহুগুণে বিবর্ধিত করে চারিদিক মুখরিত করে রাখলেন যাতে নিপীড়িত জাতিগুলির উচ্চকিত হর্ষধ্বনি অশ্রুত থাকে। দুইপক্ষের প্রচার মাধ্যমের এই সাযুজ্যে তাঁদের অদূর ভবিষ্যতের কর্ম-প্রবাহের তাল-মিল-লয়ের পূর্বাভাসই সূচিত হল।

প্রচার মাধ্যমের প্রবল আনুকূল্য এবং ব্রিটিশের সুস্পষ্ট ইঙ্গিতকে পাথেয় করে কংগ্রেস অবিলম্বে Communal Award থেকে নিপীড়িত জাতিগুলির পৃথক নির্বাচনের ধারাটিকে প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে দিলেন এবং ব্রাহ্মণ্য জাতিভেদপ্রথার সরব সমর্থক গান্ধিজি আইন অমান্য করে পুণা জেলে আশ্রয় নিলেন। জেল থেকেই তিনি নির্যাতিত মানুষদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক প্রচেষ্টাকে অঙ্কুরে বিনাশ করার জন্য আমরণ অনশনের হুঙ্কার ছাড়লেন। গান্ধিজির এই আচরণ ছিল একান্তই অনৈতিক। কারণ দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের অন্তিমপর্বে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে Communal Award প্রস্তাবের উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা অন্যান্য প্রতিনিধিদের মতই তিনিও লিখিতভাবে অর্পণ করে এসেছিলেন। সুতরাং ঘোষিত Communal Award - সম্পূর্ণ মেনে নেওয়ার নৈতিক বাধ্যতা তাঁর ছিল। তিনি তার অন্যথা করায় প্রচার মাধ্যমকে সেই মুচলেকার বিষয়টি জানানো এবং তাঁকে অঙ্গীকার ভঙ্গকারী বলে সতর্ক করার দায়িত্ব ছিল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর। কিন্তু তিনি তা করলেন না। ["As a matter of fact he was a signatory to the requisition made to the British Premier at the time of the last meeting of the Minority Committee, empowering the Premier to artibtrate in the matter of the final solution to the Communal problem. So Gandhi was bound by the words Keer In *Ambedkar Life and Mission*, P-208]। গরজ বড় বালাই! তাই সেই হুঙ্কার

প্রতিধ্বনিত হতে না হতেই ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে দিলেন যে, গোলটেবিল বৈঠকের নিপীড়িত জাতিগুলির পৃথক নির্বাচনের প্রস্তাবক ড. আম্বেদকর স্বয়ং যদি সম্মত হন তাহলে সরকার ঐ ধারাটি প্রত্যাহার করে নেবেন।

ব্যক্তি আম্বেদকরজির অবস্থান তো সাইমন কমিশনে তাঁর প্রতিবেদনের সূত্রে সকলেই জানতেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রীরা তাঁকে সেই অবস্থানে ফিরিয়ে আনার জন্য তিনটি পন্থা অবলম্বন করলেন —

(১) পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, রাজা গোপালাচারী, তেজবাহাদুর সাপ্রু, ঘনশ্যাম দাস বিড়লা প্রমুখ নামী ব্যক্তিত্বদের নিয়ে গঠিত কমিটি (Leaders Com mittee) তাঁকে পৃথক নির্বাচনের বিকল্প দাবিতে আগ্রহী করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

(২) আইন অমান্য আন্দোলনের তীব্রতা বাড়িয়ে দিয়ে তাঁর মানসিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন যাতে প্রতিকূলতা এড়াতে তিনি তাঁর পূর্বেকার অবস্থানে ফিরে যান।

(৩) একই উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রের আর টেলিগ্রাফের মাধ্যমে অজস্র চিঠি দিয়ে তাঁকে বিব্রত করে তুলেছিলেন।

অপরদিকে, All India Depressed Classes Association -এর নেতা ও কর্মীবৃন্দও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, তাঁরা তাঁদের পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থাকে ধরে রাখার জন্য আম্বেদকরজিকে অটল অবস্থানে রাখতে—

(১) একদল অগ্রণী নেতাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে তাঁকে উৎসাহিত করতে চেয়েছিলেন।

(২) রাজ্যে রাজ্যে এবং জেলায় জেলায় বড় বড় সভার সিদ্ধান্তরূপে সোচ্চারে ঘোষণা করেছিলেন যে, গান্ধিজির জীবনের চেয়েও কোটি কোটি নির্যাতিত মানুষের রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার অনেক অনেক গুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে তাঁরা কোনক্রমেই তাঁদের পৃথক নির্বাচনের অধিকার ত্যাগ করবেন না।

(৩) পাঞ্জাবের নিপীড়িত জাতিগুলির অবিসংবাদী নেতা মাঙ্গুরাম ঘোষণা করে দিলেন যে, গান্ধিজির অনশনের বিরুদ্ধে তিনিও আমৃত্যু অনশন শুরু করবেন।

উভয়পক্ষের তৎপরতার মধ্যে ২০.৯.১৯৩২ তারিখে পুণা জেলে গান্ধিজি অনশনে বসে গেলেন এবং তার ফলে ব্রিটিশ-ব্রাহ্মণ্য প্রচার মাধ্যমে সোরগোল রোল ব্যতীত অন্য সবকিছুই গৌণ হয়ে গেল। তা সত্ত্বেও গান্ধিজির অনশনের প্রতিবাদে মাঙ্গুরামজির অনশনের সংবাদও রাষ্ট্র হতে দেরি হল না এবং সারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের নিপীড়িত জাতিগুলির বিশাল বিশাল সমাবেশ থেকে তাঁদের পৃথক নির্বাচনের অধিকার রক্ষার দৃঢ় অঙ্গীকরের প্রবল গর্জনকেও অশ্রুত রাখা গেল না। ঐ ২০.০৯.১৯৩২ তারিখেই পাবনায় প্রধানত নমোজাতির উদ্যোগে মধুসূদন সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিরাট সমাবেশ থেকে উচ্চারিত হল যে, নিপীড়িত জাতিগুলি তাদের পৃথক নির্বাচনের বিকল্পহীন অবস্থানটি যে কোন মূল্যে ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর। [Pabna Depressed classes Association, ... headed by a Namasudra leader called Madhusudan Sarkar held a meeting on 20th September, the day Gandhiji started his historic fast. The meeting unanimously resolved that 'the depressed class people ..... demand a separate electorate instead of joint electorate with the caste Hindus', for they believed that 'no welfare can be done to them by the caste Hindus'."– Sekhar Bandyopadhyay , Caste, Protest and Identity in Colonial India, p-157]

এইভাবে বাংলার এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত বিশাল বিশাল সমাবেশ থেকে নিপীড়িত জাতিগুলি সরবে ঘোষণা করে দিল যে তাদের পৃথক নির্বাচনের অধিকার তারা কোনক্রমেই পরিত্যাগ করবে না। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যে এই উপলক্ষে সর্ববৃহৎ সমাবেশটি ঘটেছিল ফরিদপুরে। ২২.০৯.১৯৩২ তারিখে অনুষ্ঠিত লক্ষ লক্ষ মানুষের সেই সভায় তাঁদের পৃথক নির্বাচনের দাবিই ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। a["Faridpur Depressed classes Association..... held a special general meeting on 22 September ..... The meeting, participated by the members of the various castes like Namosudra, Kapali, Chamars, Malo, Kaibarta etc., unanimaously resolved, to support and approve of the Communal Award', implicity, even at the risk of threatening Mahatma's life." ibid]

নিপীড়িত জাতিসমূহের মানসিক প্রতিক্রিয়া যেভাবেই প্রকাশিত হ'ক না কেন, ড. ভীমরাও রামজি অম্বেদকর গান্ধিজির অনশনোদ্ভূত সঙ্কটকালে নির্যাতিত কোটি কোটি

মানুষের জীবন সংশয়ের আশঙ্কায় নিজেকে ইস্পাত-দৃঢ় অনমনীয় চরিত্রের নায়কের স্থানে উন্নীত করতে পারলেন না। তিনি মারাত্মক ভুল পদক্ষেপে ব্রিটিশ-ব্রাহ্মণ্য ফাঁদে জড়িয়ে পড়লেন। সম্ভবত গান্ধিজির অনশনের সূচনাতেই তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং তাই তিনি সেদিন থেকে All India Depressed Classes Association -এর বোম্বে থেকে ছুটে আসা নেতৃবৃন্দকে এড়িয়ে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রী নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিপীড়িত জাতিগুলির পৃথক নির্বাচনের দাবি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। তা না হলে ২১.০৯.১৯৩২ তারিখে বোম্বেতে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রী নেতাদের সঙ্গে তিনি আলোচনায় বসে বিভিন্ন রাজ্যে নিপীড়িত জাতিগুলির সংরক্ষিত আসনের সংখ্যাগত তালিকা পেশ করলেন কী করে?

২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ তারিখে The Statesman পত্রিকার সংবাদদাতা জানিয়েছিলেন যে, সেই সভায় ড. আম্বেদকর পৃথক নির্বাচনের পরিবর্তে যৌথ নির্বাচনে মাদ্রাজে ৩০টি, বোম্বেতে ১৬টি, বাংলায় ৫০টি, পাঞ্জাবে ১০টি, সংযুক্ত প্রদেশে ৪০টি, বিহার ও উড়িষ্যায় ২০টি, মধ্যপ্রদেশে ২৯টি এবং আসামে ১১টি সংরক্ষিত আসন নিপীড়িত জাতিগুলির জন্য দাবি করেছিলেন [The Statesman, Calcutta, September 22, 1932]। মোটকথা, ভারতের অগণিত শোষিত মানুষের মুক্তিবিরোধী কালো দিনে পুণা চুক্তির মাধ্যমে ব্রিটিশ পুঁজির সুরক্ষার এবং ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রীদের নিরাপদ রাজ্যাভিষেকের পথ সুগম করে সম্পদ-স্রষ্টাদের অগ্রগতি রুখে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ব্যারিস্টার গান্ধি। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও ঘটনা সত্য যে, ড. আম্বেদকর তাঁর দোসর হয়ে গেলেন।

এদিকে বাংলার নিপীড়িত জাতিগুলির নেতৃবৃন্দ দীর্ঘকালের পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠার কঠোর সংগ্রাম এইভাবে ব্যর্থ হওয়ার মুখে গর্জে উঠলেন এবং তাঁরা আম্বেদকরের ন্যায় স্বৈরাচারী নেতার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকে কোনক্রমে মেনে নেবেন না বলে সমস্বরে ঘোষণা করে দিলেন।

> ["The Bengal Namasudra Association and the Depressed Classes Association in an emergency joint meeting on 26th September, unanimously resolved that 'the alleged settlement (ie Poona Pact) does not at all solve the problem so far as Bengal is concerned; and the De-

pressed Classes of Bengal at least are not bound by it'. Dr. Ambedkar, the two associations noted 'with extreme regret', had 'assumed the role of a dictator' and practically gave away the real cause of the depressed clases' without even consulting the All India Depresssed Classes Federatiion." - Sekhar Bandyopadhyay, Caste, Protest and Identity in Colonial India, p - 158]

তার পর দিনই The Depressed Classes Federation-ও পুণা চুক্তির এবং আম্বেদকরের ভূমিকার নিন্দা করল এবং ঐ সর্বনাশা চুক্তি অবিলম্বে বাতিল করার দাবি জানাল। ["".....the Depressed Classes Federation .....condemned the Poona Pact as 'Dr. Ambedkar's political blunder; and upheld the Communal Award.....", ibid, p-158] বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ প্রতিবাদের ঝড় তুলে পুণা চুক্তি বাতিল করার দাবিতে ইংল্যাণ্ডে রাজার কাছে আবেদন জানালেন। [Do, pp 284-85, Note No. 107] ; পাঞ্জাব ও মাদ্রাজেও প্রতিবাদের জোয়ার বয়ে গেল, কিন্তু পুণা চুক্তির ভাসাভাসা প্রতিশ্রুতিগুলি সংখ্যাগতভাবে আইনি ব্যধ্যতাদানের বেশি কিছু আর তাঁরা করে উঠতে পারলেন না। ফলত তাঁদের এই আন্দোলনের ফলে তাঁরা The Government of India Act 1935-এ তপসিলি জাতিগুলি 15% এবং তপসিলি উপজাতিগুলি 6% সরকারি চাকরির আইনি স্বীকৃতি আদায় করতে পেরেছিলেন।

ব্রিটিশ-ব্রাহ্মণ্য চক্রের মোক্ষম চালে পরাজিত ড. আম্বেদকর পুণা চুক্তি সম্পাদন করে জনসমর্থন হারিয়ে ক্রমশঃ অপাংক্তেয় হয়ে পড়েছিলেন। তার ফলে কেবল বোম্বে প্রাদেশিক আইনসভার ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে আম্বেদকরজি এবং তাঁর কয়েকজন সঙ্গী জয়লাভ করলেও ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে একাধিক কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে কোথাও তিনি জিততে পারলেন না, তাঁর পার্টির (All India Scheduled Castes Federation)প্রার্থীরূপে বাংলায় যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ব্যতীত সারা ভারতে কেউ কোথাও জিততে পারলেন না। সব রাজ্যে কংগ্রেসের জয়-জয়কার ঘটে গেল। এর অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংঘটিত Constituent Assembly-র নির্বাচনের ফলাফলে একই ধারা বজায় রইল, শুধু পার্থক্য এই যে, বাংলা থেকে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের পরাজয়ের বিনিময়ে আম্বেদকরজি জয়লাভ করলেন। এই ফলাফল বিস্ময়কর। কেননা, আম্বেদকর

ছিলেন বহিরাগত এবং স্বয়ং যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের আসনে তিনি বাংলায় আসেন। এমন ফলাফলের একটাই ব্যাখ্যা, যে ব্রাহ্মণতন্ত্রী কংগ্রেসের তরফে তাঁকে জেতানোর ও শ্রী মন্ডলকে হারানোর পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কেননা, আম্বেদকরের কেন্দ্র পাকিস্তানে পড়লে কংগ্রেস তাঁর নিজ সদস্য ডঃ এম.আর.জয়কারের পরিবর্তে ডঃ আম্বেদকরকে নির্বাচিত করে Constituent Assemblyতে আনে।

প্রাদেশিক স্তরের সেই নির্বাচনী ফলাফলের ভিত্তিতে অদূর ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতে নিপীড়িত জাতিগুলির পৃথক অংশভাগের যৌক্তিকতাকে প্রত্যাখ্যানের অসাধারণ সুযোগটির সদ্ব্যবহার করতে ব্রিটিশ রাজশক্তি একটুও দেরি করল না। Sir Stafford Cripps -এর নেতৃত্বে গঠিত ক্যাবিনেট মিশন ভারত ও পাকিস্তানের পরিকল্পনা ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পেশ করল। [".....Sir Stafford Cripps argued in the House of Commons ..... that ..... Congress made practically a clear sweep of the whole of the Depressed Class constituencies ..... Dr. Ambedkar's organisation ..... had failed in the elections and we could not artificially restore its position" ibid, 206]

স্বভাবতই অচিরে স্বাধীন দেশরূপে ভারত ও পাকিস্তান গঠনের সেই সুপারিশ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাশ হয়ে গেল এবং তার ফলে অক্টোবর মাসে কংগ্রেস ও ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে মুসলিম লিগ অন্তর্বর্তী সরকারের মন্ত্রীদের নামও ঘোষণা করে দিল, কিন্তু আম্বেদকরজি মন্ত্রিত্ব করা জন্য আহূত হলেন না। উপরন্তু তাঁর নির্বাচন ক্ষেত্র পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তিনি Constituent Assembly -র সদস্যপদটিও হারালেন। এই অবস্থায় পৌঁছে তিনি বুঝতে পারলেন যে, পুণা চুক্তি নিপীড়িত জনগণের ভোটাধিকার হরণ করে নিয়েছে। তাই তিনি তখন পুণা চুক্তি প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলনে নেমে ["Ambedkar at this stage ..... insisted on terminating the Poona Pact, which he thought had disfranchised the Scheduled Castes .....". ibid, p 297] অনিবার্যভাবে করুণ ব্যর্থতার সম্মুখীন হলেন।

অর্থাৎ, পুণা চুক্তি সম্পাদনের প্রায় ১৪ বছর পর তার পরিপূর্ণ বিষক্রিয়ায় জর্জরিত হয়ে ড. আম্বেদকর ঐ চুক্তির স্বরূপটি বুঝতে পারলেন। তাঁর এই অতি বিলম্বিত বোধোদয়ে আমরা, যারা পুণা চুক্তির ঔরসজাত দ্বি-জাতিতত্ত্বভিত্তিক স্বাধীনতায় সর্বস্ব হারিয়ে অবাঞ্ছিত উদ্বাস্তু অথবা বে-নাগরিক, তারা কী ক্রুদ্ধ, না উৎফুল্ল? অথবা

নির্বিকার !

— আমরা নির্বিকার।

ঘটনার পর ঘটনার সূত্রেই আমরা জানি, ড. আম্বেদকরের চরিত্রে পরস্পরবিরোধী দুটি সত্তা প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল। একটি প্রতিবাদী, অন্যটি ধার্মিক।

নিপীড়িত মানুষের মুক্তির সংগ্রামে ব্রতী প্রতিবাদী আম্বেদকর বারে বারে ব্রিটিশের মদতপুষ্ট ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রীদের রোষানলে পতিত হয়েছিলেন। এসব অবস্থায় বৃহৎ গণভিত্তি বিশিষ্ট দৃঢ় সংগঠনের বৈপ্লবিক তৎপরতার শীর্ষে আসীন কুশলী নেতৃত্বই কেবল তাৎক্ষণিক অনুকূল সুযোগের সদ্ব্যবহার করে শোষককুলের অনিচ্ছুক মুষ্টি থেকে ধাপে ধাপে জনগণের মুক্তির শর্তগুলি একে একে ছিনিয়ে নিতে পারেন।

ধার্মিক আম্বেদকরজির কাছে অবশ্য জনগণের বৈপ্লবিক তৎপরতা রুচিকর ছিল না; উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি তাঁর নিজের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতেন এবং জনগণকে আজ্ঞাবাহী অনুগামীরূপে ব্যবহার করতেন। [He had no taste for individual organisation. There were no regular conferences, or general meetings of the organisations with which he was connected. Where and when he sat was the venue of conference or the Working Committee had to fall in line with his arrangement. His followers were attracted to him by his integrity, ability, sacrifice and learning. - Dhananjay Keer, *Dr. Ambedkar. Life and Mission*.P-480]। তারফলে অতিমারাত্মক বিরুদ্ধ অবস্থায় তিনি জীবনসংশয়ের এবং নিপীড়িত জনগণের

শেখানো এবং শেখা

তীর্থ র চন্দ

ঘটনাটা যে কেবল ছোটদের ক্ষেত্রে ঘটে, তা না, বড়োদের ক্ষেত্রেও আমাদের অভিজ্ঞতা একইরকম। আমরা অর্থাৎ যারা নাটকের কাজের সঙ্গে যুক্ত তাদের, এবং এই অভিজ্ঞতা হয় বিশেষত কোনো প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে —সে ছোট-বড়ো যাই হোক। যেখানে আমরা কাজ করতে গেলাম, সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, অথবা ক্লাবের সংগঠক গোড়াতেই আমাদের একটা বিষয়ে সচেতেন করে দেন। '—আসলে কি জানেন, একেবারে অজ-পাড়াগাঁ, স্বাভাবিকভাবেই এখানে তেমনভাবে কালচারের কোনো চর্চাই নেই। একেবারে পিছিয়ে পড়া যাকে বলে',— আক্ষেপ করেন প্রধান শিক্ষকমশাই। আবার কেউ কেউ বলেন — 'একেবারে ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার'। কিন্তু একটা কথা কিছুতেই বোঝানো সম্ভব হয় না, ওঁরা যাকে কালচার বলছেন, তার ছাপ-ছবি হয়তো এ অঞ্চলে দেখা যায় না কিন্তু প্রত্যেকের নিজস্ব একটা সংস্কৃতিচর্চা তো থাকেই। এঁদের বেঁচে থাকাটাই যে এঁদের প্রচ্ছন্ন সংস্কৃতির প্রকাশ, সে দেখার চোখ নেই আমাদের। আমাদের বাঁচাকেই একমাত্র জেনে যখন সর্বত্র তা-ই প্রত্যাশা করি, উন্নাসিকতায় অন্যদের দূরে ঠেলি, তখন শুধু যে ওঁদেরই আঘাত করছি তা না, আমরাও যে সংস্কৃতিচর্চার বহুস্তরকে ধরতে অক্ষম, সেটারও প্রমাণ দিয়ে চলি। সর্বক্ষেত্রে এইরকম সঙ্কীর্ণতা আমাদের ক্রমশ পঙ্গু করে তোলে।

****

যাঁরা পাহাড়ি নদীর খরস্রোতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন, প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁদের সংগৃহীত পুরুষানুক্রমিক অভিজ্ঞতা আমাদের বিস্মিত করে বললে কম বলা হয়। উপর থেকে নেমে আসা জলের স্রোতের ধরন দেখে ওঁরা বলতে পারেন উৎস মুখের অবস্থাটা এখন কেমন! নদী যেখানে বাঁক ফেরে, প্রায় সময়ই সেখানে দহ তৈরি হয়। কাছাড়ের সিলেটি ভাষায় এগুলিকে বলে 'ডর। ড' আর 'র'-এর মাঝখানে হালকা একটা 'হ'-র উচ্চারণও থাকে কিন্তু শ্বাসাঘাত এত তীব্র না। তা যাই হোক, সেই 'ডর'-এ জমে মাছ। কারণ ঘুরপাক খেয়ে স্রোত এখানে নিচের মাটি ক্ষয় করে

ফেলে। গভীরতা তুলনায় অনেকটা বেশি। ওইখানের মাছেরা উপরের ছায়া মেলে ধরা গাছ থেকে কোনো ফল পড়লেই ঝাঁক বেঁধে সেইদিকে ছুটে যায় খাবে বলে। জেলেরা এটা জানেন খুব সহজাত অভিজ্ঞতায়। ওঁরা খুব ধীর পায়ে চলে এতো সামান্য ঢেউ তুলে হাঁটেন, কাছে- দূরের মাছেরা ভয়ও পায় না। জেলেদের হাতে থাকে ছোট্ট একটা পাথর। সুবিধেমতো জায়গায় এসে ওই ঢিলটা ছুঁড়ে দেন আকাশে, অনেক উঁচুতে। উপর থেকে সাঁ সাঁ করে নিচে নেমে সেই ঢিল যখন টুপ করে জলে পড়ে, মাছেরা ভাবে, ওই ফল পড়লো বুঝি! ছুটে আসে তারা ঝাঁক বেঁধে। আর যিনি এই কারিকুরিটি করেন, তাঁর কাছে ওই সময়জ্ঞানটা একেবারে নিখুঁত — ওই ঢিলের শব্দ হওয়ার পর ঠিক কতটুকু সময়ের মধ্যে ছুটে আসবে মাছেরা; আর কখন তাঁকে ছুঁড়তে হবে জাল! একসঙ্গে অনেক মাছ এসে পড়বেই। এর জন্য বিশেষ জাল প্রয়োজন। বোনেন তাঁরাই। বিশেষ গড়নের খালুই, যা পাহাড়ি নদীর পাথর ছড়ানো পাড়ে রাখার সুবিধে। এই খালুই-ও বাঁশ-বেত দিয়ে বোনেন ওঁরা। এই প্রবল বিস্ময়কর বিদ্যা ও বুদ্ধির সহজাত অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে জলের উজ্জ্বল শস্য নিয়ে যখন কাছের হাটে বা লোকালয়ে নামেন, তখন বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাইদের রোয়াব দেখে কে! প্রথমত তো সম্বোধনে 'তুই-তোকারি'ই স্বাভাবিক; কেউ 'তুমি' বললে তো আড়চোখে তাকেই একবার দেখে নেওয়া; আর 'আপনি'! ওরে বাপ্‌রে, এতো ভিড়মি খেয়ে যাবে।

এখন এতক্ষণ এই মৎস্য শিকারের বর্ণনা শুধু প্রাসঙ্গিক একটা কথার উত্তর দিতে — সংস্কৃতির কোনো একটা নির্দিষ্ট প্রকাশ ভঙ্গি হয় না— যাপন প্রক্রিয়াকে ক্রমাগত সংস্কার করতে করতে যে অভিজ্ঞতায় ভর করে প্রতিদিনের চলা, সংস্কৃতির নানারূপ ফুটে ওঠে তার মাঝখান দিয়েই। অবশ্যই এ অতি প্রাচীন কথা এবং সেই প্রাচীন কথকদের মান্যতা দিতেই বুঝি, এখনও আমরা জোয়ার ভাঁটা কিংবা দিন-রাত্রির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটা জানি। শুধু জানি না, কী করে খরস্রোতে প্রাণ বাঁচাতে হয়। এবার পূর্বসূত্রে ফেরা যাক।

****

নাট্যচর্চায় ওইরকম প্রান্তিক শিশুদের সঙ্গে প্রায়ই মোলাকাত হয় আমাদের এবং আমরা নিত্যদিন বহু কিছু শিখি। মনে হতে পারে, এ খুবই প্রচলিত বিনয়-বচন; কিন্তু আমাদের অনেকেরই মনে হয়, জীবনের গতিপ্রকৃতির লুকানো টান বুঝতে ওদের কাছে বন্ধুর মতই নিজেকে সমর্পণ করতে হয়। মাস্টারি প্রত্যাখ্যাত হবেই কারণ ওই পদ্ধতিটাই

দাঁড়িয়ে থাকে সেই গঠনের উপর যেখানে অম্বিকে মাস্টার উপরে আর গুবরে পোকা কাঠবিড়ালির জীবন মাধুর্যে বিমুগ্ধ ছেলেটা এবং ছেলের দলেরা থাকে নিচে। কোনো জ্ঞান দেওয়া নয়, মিশতে হবে ওদের সমতলে এসেই আর তখনই পারস্পরিক দেওয়া নেওয়া হবে সহজতর। কিন্তু ওই সম্মানীয় শিক্ষক কিংবা সাংস্কৃতিক দলের কর্মকর্তা গোড়াতেই শুরু করছেন এই ভেবে যে ওর বা ওদের কিছুই দেবার নেই। সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার নিয়ে উপস্থিত এই যে আমি, শিক্ষক-নেতা-নাট্যপরিচালক -পরিবারের কর্তা-ইত্যাদি ইত্যাদি। আসলে ওরা যা জানে, সেই তালগোল পাকানো জিনিসটা সম্পর্কে জেনে, সেইটা নতুন ব্যাখ্যায় বিশ্লেষণে ওদের কাছে ফিরে যাওয়া যেতে পারে। আবার সবটাই ওরা তালগোল পাকানো অবস্থায় জানে বোঝে— এমনটা ভাবাও বিপজ্জনক। ফলে শুরুতেই দাবড়ানি অথবা অস্বীকার - ভয়ঙ্কর বিপদ ডেকে আনে। যে আমাদের স্কুলে-সমাজসংগঠনে -পরিবারে সর্বত্র ।

অথচ সেই মানুষেরা, এবং নাট্যচর্চায় দুরু দুরু বক্ষে জড়ো হওয়া শিশু-কিশোরেরা নিজেরা যে কতটা জানে, সেইটা জানা এবং জানানোই তো কাজ। আর সত্যিই সেটা যখন ঘটে, তখন তারা প্রত্যেকেই একেবারে ভরতমুনির কাঙ্খিত নট। তারা হয়তো সূত্র মুখস্থ বলতে পারবে না, ভাব আর রস-এর পার্থক্য বললে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েও থাকতে পারে, কিন্তু যখন সঞ্চালকদের পদ্ধতিতে লালিত হতে থাকে ওদের এতদিনকার সব অভিজ্ঞতা, অবশ্য করেই খুলে যায় আলিবাবার গুপ্ত ভাণ্ডার। চমকিত তারাও, এতো যে আমার সঞ্চয়, আগে তো বুঝিনি! তাদের নিজেকেই নিজের কাছে অন্য আরেক, অন্য কেউ মনে হয়! সে উজ্জ্বল, গ্লানিহীন এক অবাধ স্রষ্টা। আমরা বুঝতে পারি অন্তত এইটুকু তো করা গেল যার ফলে সে উঠে এলো 'না' থেকে 'হ্যাঁ'-এর জগতে।

****

শান্তিপুর থেকে অনেকটা দূরে মালঞ্চ গ্রাম। একেবারে নিম্নবিত্ত মানুষদের বাস। খেত আর তাঁত মিলিয়ে কোনরকমে বেঁচে থাকা। সেইখানকার স্কুলে নাটকের কাজে যিনি গেলেন, তিনি গোড়া থেকে চাইছিলেন, ওদের ভেতরকার আমি-টাকে জাগিয়ে দিতে। নাটকের কাজ যখন হচ্ছিল তখন ওইখানকার গ্রামীণ মাতব্বরেরা যেন হঠাৎ খেপে উঠলেন। আরে! পড়াশুনোর ইস্কুল, এখানে আবার নাটক কী! এসব তো একেবারে গোল্লায় যাবার ব্যবস্থা! — একদিন চড়াও হওয়া গেল ইস্কুলে। ভীত সন্ত্রস্ত ছাত্রীরা বলেছিল, উত্তেজনার এমন চাপড়, দু-একটা ডেস্ক-বেঞ্চও গড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিল

মাটিতে। কিন্তু অদম্য সেই প্রধান শিক্ষক এবং ওই নাট্যকর্মী বন্ধু — আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন, একেবারে চূড়ান্ত সর্বনাশ হবে জেনেও আমরা সেই পথে হাঁটছি, এমনটা ভাববে না। পরীক্ষা আসুক, দেখা যাক। —এরমধ্যেই শান্তিপুর মিউনিসপ্যালিটির উৎসব, তার আগে ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা-র একটি প্রোজেক্ট-উৎসবে অংশগ্রহণ করলো ওই স্কুল । ওদের নাটকটি কোলকাতার মিনার্ভা হলে অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত হয়। এমন শহর, এমন প্রেক্ষাগৃহ— সিনেমা-দূরদর্শন ছাড়া আর কোথায় দেখেছে ওই কিশোরীরা! নাটক ভালো-মন্দ সে তো অন্য বিচার -লোকে বলেছে , বেশ ভালো। —আর ওরা আনন্দিত তার চেয়ে বেশি। এর কিছুদিন পরই মাধ্যমিক পরীক্ষা। উৎসাহী গবেষকরা ইস্কুলে গিয়ে একেবারে মার্কশীট ধরে মিলিয়ে নিতে পারেন ওদের রেজাল্ট। যতটা প্রত্যাশিত ছিল তার চেয়ে অনেক ভালো করেছে ওই প্রান্তিক কিশোরীরা। সেই ফল বেরোনোর আগে প্রবল উৎকণ্ঠিত সেই নাট্যকর্মী, শান্তিপুরের শমিত বন্দ্যোপাধ্যায় যখন সব জানতে পেরে টেলিফোনে খবরটা জানাচ্ছিলেন, স্বাভাবিক কারণেই বারবার গলা ধরে আসছিল তাঁর। আর আমরা যারা শুনছিলাম, মনে হচ্ছিল, এ তো বৈজ্ঞানিক সূত্রের মতো মিলে যাবার কথা। 'আমি পারি। আমি আর কেউ না, কিছু না নই। আর আমি যদি এইভাবে পারি, তাহলে ওইভাবেও তো চেষ্টা করে দেখা যায়? অবশ্যই , অবশ্যই, আমাদের সমাজ-রাষ্ট্রের নিয়ামকরা ওদেরকে প্রতিমুহূর্তে 'হেরোদের' দলে ঢুকিয়ে দেবার হাজারো বন্দোবস্ত করে চলেছেন। অত বড়ো শক্তির সঙ্গে এক্ষুনি হয়তো সবটা দিয়ে লড়তে পারি না, কিন্তু ওদের প্রচারিত সত্যকে তো মিথ্যা প্রমাণ করে দিতে পারি।

এরকম হাজারো অভিজ্ঞতা বহু নাট্যদলের নাট্যকর্মীর। অন্তত যাঁরা এই সত্যে বিশ্বাস করে নাট্যচর্চায় রত থাকেন।

যখন বারো বছরও হয়নি, পড়া ছেড়ে দিল সরবেড়িয়ার চনু। প্রথমত, ইস্কুলে গেলে বাড়ির জন্য যৎসামান্য যা রোজগার, সেটা হয় না - আর তার চেয়েও বড়ো কথা, ইস্কুলের কোনো টান নেই। মাস্টার কী বলে আর বইয়ে কী লেখা — মনে হয়, অন্যগ্রহের দুম্‌দাম্ সব ছিটকে পড়া ভাষা। এরচেয়ে 'তাইরে নাইরে না বলিয়া ছুটিয়া বেড়াইবার মাঠ' তো স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেশি আকর্ষণীয়। কোনো ধরনের শিক্ষায় ওর আগ্রহ নেই তো বটেই, পারলে মাস্টার এবং মাস্টারদের মাথা ঢিল মেরে ফাটিয়ে দেখে আসলে ওইখানে কী থাকে। - নাটকের কাজেও চনু চুপ করে বসে থেকে যাচাই করে নিল কিছুক্ষণ, আসলে দেখে নেওয়া, কী করতে চায় এরা, আমাকে

দিয়েই বা কী করাতে চায়। —কিন্তু ও যখন দেখল, ওর যা জানানোর সেইটে জানতেই আসা, আগ্রহী সবাই ওর অভিজ্ঞতার সামনে - নিজেকে কেমন অন্যরকম বলে মনে হলো। আর তারপরই ঝাঁপিয়ে পড়া সেই সৃষ্টিকর্মে, যা আদৌ সৃষ্ট কর্ম বলে ধরাই পড়ে না ওর কাছে। ও যত অবাধ, তত বিস্ময়কর ওর সেই খুলে যাওয়া অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড়ানো। আর সবচেয়ে বেশি মজাদার ওর কাছে, এবং আমাদের কাছেও, কতরকমভাবে ও মাস্টার ঠকানোর বুদ্ধি নিজের মগজে মজুত রাখে। চনু ত্রিকোণমিতি জানে না, গড়গড় করে 'বন্দি বীর' আবৃত্তি করতে পারে না, ইংরেজিতে তিনটি শব্দ পরপর উচ্চারণ করতে চারবার ঘাড় তুলে তাকায় - আত্মবিশ্বাস যাকে বলে একেবারে তলানীতে - কিন্তু ও যেখানে সম্রাট, সেই রাজ্যের হদিশ নিতে গেলেই দেখা যায়, কী অপরূপ সেই সাম্রাজ্য। আজ বাইশ-চব্বিশ বছরের চনু-নবী-ভোলা---- যে দায়িত্ব সামলায় সুন্দরবন শ্রমজীবী হাসপাতাল-এ সরবেড়িয়া কৃষিচক্র-র কাজে, তাহা তাহা বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই থই পাবেন না সেখানে। তার মানে এই নয়, যাদের অবকাশ আছে, তারাও বইপত্তর গুটিয়ে 'অন্য সাম্রাজ্যের হদিশে আছি' বলে সচিৎকারে নিজেকে স্বতন্ত্র করে নেবে। এ ক্ষেত্রে ওই অবকাশ যাপিত শিশুটির জীবনচর্চাই অন্যরকমের। তবে যাঁরা তথাকথিত শিক্ষিত বলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত, তাঁরা যেন অবশ্যই মনে রাখেন, ওই অশিক্ষিত শিশু বা কিশোর বা যুবক বা প্রৌঢ়েরও স্বতন্ত্র সব অভিজ্ঞতা সাম্রাজ্য রয়েছে। এক্ষেত্রে সমাজই তো—শিক্ষিতজনকে সম্মান করবে, বলে নীতিবাক্যে টাঙিয়েই রেখেছে। অশিক্ষিতদের সম্মান জানানোর পদ্ধতি শুধু ওই মানুষটিকে না, আমাদেরকেও সমৃদ্ধ করে, সেটা ভুলে গিয়েই বিপত্তি বাধাই আমরা।

বিভিন্ন জেলার ছোটদের নিয়ে বছরে একবার একটা মেলার আয়োজন হয়। এই মেলার কেন্দ্রে থাকে নাটক আর সঙ্গে থাকে আরো সব হাজারো কাজ। তো সেখানে বয়স অনুযায়ী ছোটদের যখন আলাদা করা হয়, তখন দেখা যায়, একই দলে হয়তো আছে সাউথপয়েন্ট অথবা নৈহাটি কাত্যায়নী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে রাজাবাজার ফুটপাথ এবং বীরভূমের প্রত্যন্ত কোনো গ্রামের ছোটরা। দুদিন কেটে যাবার পর যখন সবাই দেখতে পায়, যে এখানে ওই পড়াশুনো জানা বা না জানার দিয়ে তথাকথিত কোনো ভাগ নেই, প্রত্যেকেরই অবকাশ আছে নিজেকে জানান দেওয়ার , জমাটি -এর আসর বসে তখন। আর সাতদিনের মাথায় যে নাটকটি তৈরি হল, সেখানে রাজাবাজারের ওই শিশুটি, প্রতিদিন রাতে পুলিশের বুটের 'মৃদু' আঘাতে যার বাবা মা-র ঘুম ভাঙে ওর চোখের সামনেই, সে হয়তো আজ সেই রাজা

যে আশ্রয় দেয় এক সন্তানহারা ভিখারিনীকে, যে মেয়েটি নিজের ব্যক্তিজীবনে এসি গাড়ি করে স্কুলে-বাজারে যেতে আসতে ভাবে, এই যে এরা রাস্তায়-ফুটপাতে থাকে, আসলে এদের বাড়ি কোথায়। এরা এখানে কেন! —ছোটদের এই মিলেমিশে যাওয়াটা কোনো মিরাকল নয়, এ এক সহজ পথে হাঁটার জন্যই, যে পথটা বাঁকিয়ে রাখাই সমাজ নির্মাতাদের প্রবল প্রয়াস। যদি মেলা-টা এক সপ্তাহের না হয়ে বাকি বাহান্ন সপ্তাহকেও এর মধ্যে টেনে আনা যেত, তাহলে দেখা যেত, ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার হয়েও কত তাদের বংশপরম্পরায় সংগৃহীত জ্ঞান! আর যারা তথাকথিত শিক্ষার পথে মসৃণভাবে অগ্রসরমান, তাদেরও কত কিছু 'জানার এবং শেখার' বাকি রয়ে যায়। দু'দলই অসম্পূর্ণ, মেলানোর চেষ্টা, পারস্পরিক আদান-প্রদানে সম্পূর্ণ করে তোলার কাজই তো নাটকের। যে কোনো শিল্পের।

****

আমাদের মধ্যে আবার অন্য এক প্রবণতাও প্রায় ব্যধির মতই কাজ করে। আমরা যারা সমাজের নানা ধরনের বৈষম্য এবং শোষণে বিমর্ষ, ক্ষুব্ধ, সঙ্গত কারণেই যাঁদের প্রবল সহানুভূতি ওই নেইরাজ্যের শিশুদের জন্য, তাঁরা যেন প্রায় একইভাবে স্বচ্ছল শিশুদের প্রতি এক ধরনের ক্রোধ পুষে রাখি। এবং তার প্রকাশও ঘটে নানাভাবে। এটিও বেদনার, পরিতাপের। ওই শিশুটি তো এখনও জানে না, তার স্বাচ্ছন্দ্যের পেছনে থাকা সম্পদ আহরণের অমানবিক ইতিহাস। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জানে না অথচ সে অভ্যস্ত হতে থাকে এবং এটাকেই তার অধিকার বলে ধরে নেয়। কিন্তু শিশু-কিশোরদের নাট্যের পরিসরে যখন আমরা তাকে পাই, তখন আমাদের বিদ্রূপ, আমাদের তাচ্ছিল্য ওকে কিন্তু প্রকৃত যেদিকে তাকানো প্রয়োজন, সেইদিক থেকে বিমুখ করে তুলবে। বরং তার অভিজ্ঞতার উৎস থেকেই এমন এক সত্যের সামনে এগিয়ে যাওয়া যায়, যেখানে ওর জন্য এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করে আছে। তার নিজ-বিশ্বাসের ভূমিতেই উঠে আসবে অন্যতর চিন্তার অঙ্কুর। প্রয়োজন সেইটা। প্রহার বা প্রশ্রয়, জোর খাটানো অথবা প্রয়োজনের দোহাই দিয়ে ব্যবহার করে যাওয়া —কোনোটাই যে পথ নয়, এত দীর্ঘদিন পার হয়ে আসার পর এই অভিজ্ঞতাটুকু নিশ্চয় আমাদেরও সঞ্চয়ে থাকার প্রয়োজন।

নাহলে নানারকম ডিগ্রি বা বৌদ্ধিক জ্ঞানসম্পন্ন হয়েও, আমরাই প্রকৃতপক্ষে 'ফার্স্ট'

বাংলার নবজাগরণ ঃ তার ট্রাজিডি ও প্রহসন

দুলালকৃষ বিশ্বাস

উনিশ শতকের যে-সময়কে বাংলার নবজাগরণের বা নবজাগৃতির কাল বলে চিহ্নিত করা হয় সেই সময়কালের মধ্যে এই জাগরণের অন্যতম ব্যক্তিত্ব বিদ্যাসাগরের জীবন-সংগ্রাম অতিবাহিত হয়। নবজাগরিত বাংলার এমন এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের রচনা সংকলনের [বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ] ভূমিকায় লেখা হয়েছে ঃ

''..... ঊনবিংশ শতকের প্রধান প্রয়োজন ছিল - ভারতীয় সমাজের আধুনিকতা সাধন, আধুনিক যুগধর্মে সমাজের নবরূপায়ণ, আত্মার নতুন স্ফুরণ। তার অর্থ যে কী, বারে বারে তা বলা নিষ্প্রয়োজন — যুক্তির মুক্তি (র‍্যাশনালিজ্‌ম), ব্যক্তির মুক্তি (রাইট্‌স্ অব ম্যান-এর) প্রতিষ্ঠা, তারই মধ্যে নারীর ও নিম্নবর্ণের প্রতিষ্ঠা অন্তর্ভুক্ত, একথা না বললেও চলে; জাতির মুক্তি (ন্যাশনালিজ্‌মের উন্মেষ) ইত্যাদি —কোনোটাই কোনোটির অপেক্ষা গৌণ নয়। সকলের সমন্বিত উন্মেষেই ভারতীয় সমাজের যুগান্তর সম্ভব। সেরূপ যুগান্তরই ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সমাজের মূল দাবি।''

এই ভূমিকার লেখক শ্রী গোপাল হালদার। এখানে আধুনিক চিন্তাবিদ্‌দের কী প্রত্যাশা ছিল উনিশ শতকের নবজাগরণের নিকট তা খুবই স্পষ্ট করেই প্রকাশ পেয়েছে। এই নবজাগরণের যিনি অন্যতম পিতৃপুরুষ সেই মহান ব্যক্তিত্ব রামমোহন-এর প্রত্যাশাটাও আমরা জেনে নিতে পারি অন্য আর এক বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্ শ্রী সুশোভন সরকারের লেখা থেকে ঃ

''রামমোহন অনুভব করেছিলেন যে ইংরেজ শাসন ভারতবর্ষে এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম দিচ্ছে এবং এই শ্রেণীর নেতৃত্বেই গড়ে উঠবে স্বাধীনতার সর্বাত্মক আন্দোলন।'' [বাংলার রেনেসাঁস, পৃ - ১৯]

আমরা জানি, ইংরেজ শাসক এবং কৃষকদের মধ্যবর্তী একটা মধ্যশ্রেণি, জমিদার ও জমিদারি ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ নানা সুবিধাভোগী, যাঁরা ছিলেন প্রধানত ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রেরই সুবিধাভোগী অংশের মানুষ এবং চিরায়ত ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ধর্মীয় সাংস্কৃতিক

সুবিধাভোগীদের নিয়ে এই মধ্যশ্রেণি গড়ে ওঠে বাংলায়। উল্লেখিত উদ্ধৃতিতে যদিও ভারতবর্ষ সম্পর্কে এই উক্তি, তবুও একে বাংলার মধ্যশ্রেণির ঐতিহাসিক উৎস হিসেবে বিবেচনা করা, মনে হয়, আদৌ অযৌক্তিক হবে না।

অবশ্য একটা প্রশ্ন থেকে যায়, 'স্বাধীনতার সর্বাত্মক আন্দোলন' যাকে বলা হচ্ছে সেই আন্দোলনটা কি সকলের স্বাধীনতার জন্য সর্বাত্মক ছিল? এই মধ্যশ্রেণি বা মধ্যবিত্তরা কি আদৌ সকলের স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল ছিলেন? অবশ্যই স্বাধীনতা বলতে কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, তাকে হতে হবে আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা, ব্যক্তির মুক্তি তথা বিকাশের স্বাধীনতা।

আমরা জানি, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সুবিধাভোগীদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্যই কেবল রামমোহনের এই উদ্যোগ ছিল। শ্রী সরকারের ভাষায় অবশ্য ''সমাজের বিভিন্ন অংশকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যই এ আন্দোলন তিনি শুরু করেছিলেন।''[ঐ পৃঃ ১৯]

এ আন্দোলন ছিল বেদান্ত সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ সৃষ্টির প্রচেষ্টা। অথচ আমরা জানতে পারছি যে ''জাতিভেদ প্রথা-ই হচ্ছে আমাদের অনৈক্যের মূল কারণ''। [ঐ, পৃঃ১৯] আমরা আরো জানতে পারছি, ঐ উনিশ শতকেই ''১৮২৮ সালে লেখা চিঠিতে রামমোহন লেখেন যে এই জাতিভেদ প্রথা-ই মানুষকে দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে বাধা দিয়েছে' এবং 'মানুষের রাজনৈতিক সুযোগসুবিধা ও সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য'ধর্মীয় সংস্কারসাধন একান্তই জরুরী, কারণ ধর্মের চলতি ব্যবস্থাটা 'মানুষের রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষা করার পক্ষে খুব একটা মানানসই নয়।''[ঐ পৃঃ ১৯]

হিন্দু তথা ব্রাহ্মণ্যধর্মের এই 'জাতিভেদ প্রথা'-কে পরিহার করে বেদান্ত দর্শন-ভিত্তিক ব্রাহ্মধর্ম রামমোহন প্রচার করেন, যাকে গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেন ইউরোপীয় শিক্ষা থেকে আলোক-প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রেরই সুবিধাভোগী অংশের কিছু মানুষ। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের মধ্যে নিজেদের ধরে রেখে কিছু বিশিষ্ট জনও এই আন্দোলনে নিজেদের সামিল করেন। কিন্তু আসলে বৃটিশের আনা আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-নির্ভর উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থায় নিজেদের যুক্ত করার লক্ষ্যেই তাঁরা ইউরোপীয় শিক্ষায় আগ্রহী হন। এরই ফলশ্রুতিতে বাংলায় ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সুবিধাভোগীদের শিক্ষা-সংস্কৃতিতে যে অগ্রগমন ঘটে তাকেই অভিহিত করা হয় বাংলার নবজাগরণ বা নবজাগৃতি (বিনয় ঘোষ) বা বাংলার রেনেসাঁস (সুশোভন সরকার) নামে।

এবং কোনরূপ তথ্য উল্লেখ না করে দ্বিধা ব্যতিরেকেই বলা যায়, এই 'নবজাগৃতি'

বা রেনেসাঁস ঘটেছিল কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ঐ সুবিধাভোগীদের মধ্যে যাঁরা সমগ্র বাঙালি জাতির শতকরা পাঁচজন অথবা তথাকথিত হিন্দুদের শতকরা দশজনও নন। অধিকন্তু এই জাগরণ ঘটেছিল ঐ ক্ষুদ্র জাতগোষ্ঠিগুলির কেবলমাত্র সেইসব মানুষের মধ্যে, যাঁরা ছিলেন প্রায় সকলেই জমিদারি ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ সুবিধাপ্রাপ্ত।

প্রশ্ন স্বাভাবিক যে ধর্মীয় পথে বাঙালি তথা ভারতীয়দের জাগরিত করার প্রচেষ্টা কেন ভারতীয় বা বাঙালিদের সুবিপুল বৃহত্তর অংশের নিকট পৌঁছল না। এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া অবশ্যই জটিল কিছু নয়। প্রথমত রামমোহনের বেদান্ত দর্শনভিত্তিক ব্রাহ্মধর্ম কেবল শিক্ষিত জনের নিকটই আবেদন রাখতে পারে। দ্বিতীয়ত যেহেতু ব্রাহ্মধর্ম মৌলিকভাবে ব্রাহ্মণ্য দর্শন-জাত, তাই অচিরেই সে ধর্ম ব্রাহ্মণ্য জাত ব্যবস্থার শিকার হয়। স্বয়ং রামমোহনও এই ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক মানবেতর কুসংস্কার জাতিভেদ প্রথার উর্দ্ধে উঠতে পারেন নি। বৃটেন-গামী জাহাজে তাঁকে ব্রাহ্মণ পাচক সংগে নিয়ে যেতে আমরা দেখতে পাই।

বস্তুত রামমোহনের ব্রাহ্মধর্মও এক বৈদান্তিক ব্রাহ্মণ্য প্রচেষ্টা মাত্র। ভারতে উদ্ভূত কোন ধর্ম বা উপধর্ম কখনই ব্রাহ্মণ্য জাতপাতকে পরিহার করতে পারেনি। স্বয়ং বুদ্ধের নির্দেশও তাঁর পরবর্তী বৌদ্ধ ধর্মগুরুদের দ্বারা উপেক্ষিত হয়েছে এই জাতপাতের প্রশ্নে। এমনকী বহিরাগত ধর্মও ভারতের ব্রাহ্মণ্য জাতপাতের দ্বারা কমবেশি আক্রান্ত হয়েছে। বস্তুত ভারতীয় উপমহাদেশে মানব ঐক্য গড়ার পথ যে অন্তত ধর্ম হতে পারে না, সেই ইতিহাসকে অস্বীকার করার মধ্যেই হয়ত রামমোহনের ঐক্য প্রচেষ্টার ব্যর্থতার কারণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। ধর্মের পথে অগ্রসর হতে গিয়ে রামমোহনের 'বাংলার নবজাগরণ' প্রচেষ্টা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সুবিধাভোগীদের নবজাগরণেই বন্দী হয়ে পড়ে।

রামমোহন কর্তৃক সৃষ্ট নবজাগরণের পুরোধা পুরুষেরা তাই সমগ্র ভারত তো দূরের কথা কলকাতার বাইরের বাংলাকেও জাগিয়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছেন। মনুসংহিতা নামক মনুষ্যত্ব বিরোধী ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে মৃদু দুটো নিন্দাসূচক শব্দও এঁদের কারো মুখ থেকে নির্গত হয়নি। মানবতাবাদী সংবেদনশীল কবি রবীন্দ্রনাথও ব্রাহ্মণ্যধর্মের অমানবিকতা নিয়ে সামান্যই কিছু লিখেছেন। যদিও একমাত্র ব্যতিক্রম বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তিনি এই নবজাগরণের সুবিধা পাওয়া মানুষদের স্ববিরোধী চরিত্র এভাবে চিহ্নিত করেছেনঃ

''বাবুরা বাইরের বাড়ীতে, সহিস ও কোচম্যানের মারফত মুরগী

পোষেন ও তাহার কোর্ম্মা ভক্ষণ করেন - অন্তঃপুরে প্রবেশ কবিরার সময় গৃহিণী একটু গঙ্গাজল ছিটাইয়া শুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের গ্রহণ করেন .....এই রকম দোটানা জীবনের মধ্যে থাকার দরুণ গত ১০০ বৎসরের মধ্যে আমরা বিশেষ কিছু অগ্রসর হইতে পারিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। ব্যক্তিগতভাবেই হউক আর সমাজগতভাবেই হউক আমরা বিশেষ কিছু উন্নতি লাভ করিতে পারি নাই।'' [নির্বাচিত রচনা সংকলন, C.P.I-M রাজ্য কমিটি, পৃঃ১৪৩-৪]

আচার্য রায় এই নবজাগরিত মধ্যবিত্তদের সম্পর্কে আরো বলেন ঃ

''বাস্তবিক শিক্ষিত বাঙালি যুবকের ঘরে ও বাহিরে এত তফাৎ, তার চিন্তা ও কার্যে এত পার্থক্য, ভাবরাজ্য ও কর্মরাজ্যের ব্যবধান এরূপ সুপ্রশস্ত ও সুগভীর যে এই অসামঞ্জস্যের ফলে তার বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্মশক্তি ক্রমে ক্রমে ক্ষয় পাচ্ছে'') [ঐ, পৃঃ ১২৬]

এই যে ''শিক্ষিত বাঙালি যুবক'' এঁরাই হলেন নবজাগরণের মহান মানুষদের উত্তর পুরুষ। কেন এই যুবকেরা নবজাগরণের মহান মানুষদের মহান ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হলেন? কেন তাদের চরিত্রে এত স্ববিরোধিতা? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা পাইনি আচার্য রায়ের কাছে। এই আচরণকে আচার্য রায় চিহ্নিত করেছেন 'কপটতা' রূপে[ঐ পৃ ১২৬] প্রশ্ন হলো, কপটতার সংস্কৃতি কেন অর্জন করেন বাঙালি তথা ভারতীয় মধ্যবিত্তরা যাঁদের গর্বের স্থান জুড়ে আছে মহান নবজাগরণ?

একটা জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির থাকে একটা আর্থ ভিত্তি। কেননা সংস্কৃতি জন্মলাভ করে মানুষের জৈবিক জীবন-সংগ্রামের মধ্যে। নবজাগরণ নামক সংস্কৃতির কোন আর্থ-ভিত্তি গড়ে ওঠেনি তখনও। এ-সংস্কৃতি ছিল ইউরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির আর্থ-ভিত্তিহীন অনুকরণ মাত্র। এরই ফলে 'শিক্ষিত বাঙালি যুবক' শিল্প-বিপ্লবজাত ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সামন্ততান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মধ্যে ব্যবহারিক জীবনে দোদুল্যমান থেকেছেন। যে ইউরোপীয় জ্ঞানালোকে এই যুবকদের অবগাহন করানো হচ্ছিল সেই জ্ঞান-জগতের কোন আর্থ-ভিত্তি ছিল না এদেশের সমাজজীবনে, আর তাই ছিল না সেই আর্থ-ভিত্তিজাত সংস্কৃতি। আর এজন্যই —

''কলেজে জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যয়নকালে বাঙালি যুবক বুঝেন পৃথিবীর ছায়া সম্পাতে সূর্যগ্রহণ ঘটে; এদিকে বাড়ির ভিতরে এসে দেখেন আয়ীমা, ঠাকুরমা, দিদিমা, হাঁড়ি ফেলে দিয়ে গঙ্গাস্নান করে এসেছেন -- কেননা সূর্যদেব রাহুগ্রস্ত হয়েছিলেন।'' [ঐ,

পৃ ১২৬]

আর্থ-ভিত্তিহীন সংস্কৃতি হলো অনুকরণের সংস্কৃতি, যা সীমিত ছিল তথাকথিত বাংলার নবজাগরণে জাগরিত একমুঠো বাঙালির মধ্যে । এটাই হলো এই নবজাগরণের প্রহসন। প্রহসন, কেননা এই জাগরণ ঘটেছিল মাত্র একমুঠো ইউরোপীয় আলোকপ্রাপ্ত মানুষের মধ্যে, যে জ্ঞানালোকের কোন ভিত্তি ছিল না দেশে, যে জ্ঞানালোক এদেশের মানুষের জীবনসংগ্রাম থেকে অর্জিত নয়। এই ইউরোপীয় জ্ঞানালোক সমৃদ্ধ মানুষেরা সেই অর্জিত জ্ঞান দিয়ে তাঁদের নিজেদের সমাজকে, [যেমন চেয়েছেন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী শ্রী গোপাল হালদার] পরিবর্তনের কোন চেষ্টাও করেননি। বরং তাঁরা তাঁদের সাংস্কৃতিক উল্লম্ফনকে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সুবিধাভোগীদের মধ্যে সীমায়িত রেখে সভ্যতা যাদের সম্পদ সৃষ্টিকে অবলম্বন করে অগ্রসর হয়, সেই শ্রমজীবী ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ঘৃণ্যদের দূরে ঠেলেই রেখেছিলেন। এমনকী এদের মধ্যে জনশিক্ষা প্রসারেরও বিরোধিতা করা হয়েছিল ঐ নগজাগরণের ধারক পুরুষদের তরফে।

বাংলার তথা ভারতের এই তথাকথিত নবজাগরণের ট্রাজিডি হলো এই যে, ঐ নবজাগরণের আলোক বঞ্চিতরাও নিজেদের চেতনায় ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সুবিধাভোগীদের নবজাগরণকে নিজেদেরও নবজাগরণ বলে চিহ্নিত করেন। অথচ কার্যত এটা ছিল ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সমকালীন পুনর্জাগরণ মাত্র।

সংযোজন

উপরে আমরা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি সে বিষয়ে বিশিষ্ট গবেষক শ্রী বিনয় ঘোষের কথা আমরা জেনে নিতে পারি তাঁর পুস্তক ‘বাংলার নবজাগৃতি’ গ্রন্থের ‘প্রসঙ্গত’ নামক ঐ পুস্তকের প্রথম সংস্করণের ভূমিকা থেকে। যদিও তিনি ১৯৭৯-এর সংস্করণের ভূমিকায় আমাদের জানিয়েছেন যে “বাংলার নবজাগৃতি’’ যা একদিন ঐতিহাসিক সত্য বলে মনে হয়েছিল আজ তা মনে হয় ‘‘একটি অতিকথা’’।

তাঁর ভাবনার এই পরিবর্তন যাতে পাঠক বুঝতে পারেন তাই তিনি তাঁর গ্রন্থের মূল বিষয়ের কোন পরিবর্তন করেননি। এবং পরিবর্তিত ভাবনার সঙ্গে ‘সংযোজন’ দ্বারা তিনি পাঠককে পরিচিত করিয়েছেন।

নবজাগরণের প্রারম্ভকালের প্রায় একশত বৎসর পর ১৯৪৮-এ গবেষক শ্রী বিনয় ঘোষ 'বাংলার নবজাগৃতি' নামক গ্রন্থ কেন রচনা করলেন, সে সম্পর্কে আমাদের জানাচ্ছেনঃ

''ইংরেজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার পর পাশ্চাত্য অর্থনীতির ও সংস্কৃতির ঘাতপ্রতিঘাতে চারিদিকের পুঞ্জীভূত সংকট ও পর্বতপ্রমাণ ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও আমাদের দেশে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে যে নবজাগৃতির সূচনা হয়েছিল এবং যে-নবজাগৃতিধারা তরঙ্গায়িত হয়ে বিচিত্রপথে আজও এক বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, 'বাংলার নবজাগৃতি' গ্রন্থে তারই ইতিহাস রচনা করার চেষ্টা করেছি। আমার একার পক্ষে এ চেষ্টা সার্থক করা যে সাধনাতীত ব্যাপার তা আমি জানি। এই অসমসাহসের একমাত্র অনুপ্রেরণা হ'ল বাংলার বর্তমান ব্যাধিগ্রস্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ।'' (পৃ ৮)

এই ভূমিকা লেখার সময়কাল ১৯৪৮ এবং শ্রীঘোষ 'প্রসঙ্গত' নামক ভূমিকায় আমাদের জানাচ্ছেন যে এই নবজাগৃতি ''আজও এক বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে .....।'' কিন্তু এই নবজাগৃতির ইতিহাস রচনা তাঁর পক্ষে 'সাধনাতীত' হলেও তাঁর ''এই অসমসাহসের একমাত্র প্রেরণা হল বাংলার বর্তমান(১৯৪৮) ব্যাধিগ্রস্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ''।

অতঃপর আমরা স্বয়ং শ্রীঘোষের থেকে জানলাম, যে বাংলার নবজাগৃতির উত্তরপুরুষেরা অল্পাধিক একশত বৎসরের মধ্যেই আবার 'ব্যাধিগ্রস্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ' গড়ে তুলেছেন, যে-উত্তরপুরুষদের মধ্যে ঐ নবজাগরণ 'আজও এক বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে' বলে শ্রীঘোষ মনে করেন।

প্রথমে প্রশ্ন জাগে, তাঁর এমন এক 'সাধনাতীত' প্রচেষ্টার প্রারম্ভেই এমন স্ববিরোধী ভাবনা কেন? কেন তিনি নবজাগৃতির বিপুল সম্ভাবনাকে বাংলার ব্যাধিগ্রস্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ-এ পরিণত হতে দেখেন?

আমরা জানি, শ্রীঘোষও জানেন, ইউরোপীয় নবজাগরণের ভিত্তি ছিল সদ্যজাত বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থা ও তৎজাত জীবন-সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি ইংরেজের হাত ধরে পৌঁছায় এদেশের মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্তের নিকট, যাঁরা ঔপনিবেশিক শাসকদের সহায়ক ভূমিকা পালন করার জন্য তা গ্রহণ করেন। যেহেতু এদেশে ঐ নবজাগরণের কোন গণভিত্তিক আর্থ-ব্যবস্থা ছিল না, তাই তাকে মধ্যবিত্তরা ও দেশীয় ধনীরা নিজেদের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ রাখেন এবং এজন্যই এই নবজাগৃতি বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে

প্রবাহিত হয়ে শেষ পর্যন্ত গড়ে তোলে ব্যাধিগ্রস্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ। এ ব্যাধির অন্য চিরায়ত কারণ হলো ভারত ইতিহাসের স্থবিরতার উৎস ঃ ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র।

যদিও ইংরেজদের নিকট থেকে পাওয়া আধুনিক শিক্ষা ও তৎজাত সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ মানুষজনের সম্পর্কে বলা হচ্ছে বাংলার নবজাগরণ, তবুও আমরা লক্ষ করি যে এই নবজাগরণ ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে চ্যালেঞ্জ করেনি, বরং শিল্প-সংস্কৃতিতে ব্রাহ্মণের একাধিপত্যের সাম্রাজ্যে কিছু উত্তম সংকর শূদ্রকে শামিল করে এক তথাকথিত বর্ণহিন্দু ফ্রন্ট গড়ে এদেশের চিরায়ত শ্রমজীবীদের উপর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-সংস্কৃতির অবদমন বজায় রাখার চেষ্টা হয়েছে মাত্র। এদিক দিয়ে বিচার করলে, এই তথাকথিত নবজাগরণ আসলে দীর্ঘ মুসলিম শাসনকালে ব্রাহ্মণের রাষ্ট্রীয় সমাজে অস্বীকৃত আধিপত্যের পুনঃস্থাপনা মাত্র। এই অর্থে একে বলা যায় ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের পুনর্জাগরণ। ভারত তখন প্রবেশ করেছে সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায়, যে-উৎপাদন ব্যবস্থার সংস্কৃতি, টিকে থাকার স্বার্থে, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে অস্বীকার করতে বাধ্য। পুনর্জাগরণের বা তথাকথিত নবজাগরণের উত্তরপুরুষেরা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে আঁকড়ে থেকে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে তার পরিপূরক সংস্কৃতির বিরোধিতা করেছেন এবং তারই ফলশ্রুতিতে তাদের জৈবিক জীবন প্রক্রিয়াজাত সংস্কৃতি বিকৃতির শিকার হয়েছে।

উনিশ শতকে বাঙলায় যে 'জাতি' (nation) চেতনার উদ্ভব হয়, তা-ও ঐ ইংরেজের আনা শিক্ষা-সংস্কৃতির থেকে পাওয়া, ঐ ইউরোপীয় আলোকস্নাত নবজাগৃতির ফলশ্রুতি। এই নবজাগরণ যে এদেশের সাধারণ শ্রমজীবীদের থেকে মুখ ফিরিয়েছিল সে খবর আমরা জানতে পারি ঐসব নবজাগ্রতদের জমিদারিতে কৃষক বিদ্রোহ দমনে তাদের ভূমিকা থেকে। বস্তুত ইউরোপে রেনেসাঁস-এর কালে সামন্ত প্রভুদের কৃষক বিরোধী ভূমিকার সংগে বাংলার রেনেসাঁস-এর থেকে আসা জমিদারদের মিল অনেক বেশি। অর্থাৎ তাঁরা নতুন কোন মানুষ নন, তাঁরা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রেরই নবসংস্করণ এবং অতঃপর প্রতিক্রিয়াপন্থী।

আমরা আরো দেখি, নবজাগরণের 'জাতি' চেতনায় উদ্বুদ্ধ মধ্যবিত্ত যুবকেরা 'গীতা' হাতে স্বদেশী আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন, যে-গীতাকে ভিত্তি করে এদেশের সমাজে চিরায়ত বর্ণভেদ ও জাতপাত গড়ে উঠেছে। এ নবজাগরণ যে ইউরোপের 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা'র বাণী বহন করেনি, তা এ থেকেই বুঝতে পারা যায়। এই 'গীতা' হাতে স্বাধীনতার আন্দোলন থেকে একথাই স্পষ্ট হয়, যে স্বাধীন ভারতের ভাবী

শাসকরা হবেন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক। গীতা হাতে স্বদেশী বিপ্লবীরা এদেশকে স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন স্বশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে এবং আশ্চর্য হলেও সত্যি, যে ঐ একই গীতা হাতে অহিংস স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রবক্তা ছিলেন জাতীয়তাহীন ভারতজাতির পিতা শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধিও। এজন্যই এই নবজাগরণ বহিরঙ্গে ইউরোপের নবজাগরণের (Renaissance) সংগে তুলনীয় হলেও অন্তরে সে ছিল ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের পুনর্জাগরণ। আর এজন্যই মধ্যবিত্ত হিন্দুর সংস্কৃতির বিকৃতি ঘটেছে, যে বিকৃতি হেতু গড়ে উঠেছে ''বাঙলার বর্তমান ব্যাধিগ্রস্ত সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ''। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, শ্রী ঘোষ regeneration (rebirth -পুনর্জন্ম)-এর অনুবাদ করেছেন নবজাগরণ যা হওয়া উচিত ছিল পুনর্জাগরণ। এই পুনর্জাগরণের 'নব'হল এইটুকু যে, ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক সমাজকে সংস্কার করা হয়েছে ঐ ইউরোপীয় নবজাগরণের পোষাক পরিয়ে। যথার্থ ঐতিহাসিক 'নব' কিছু থাকলে তা এতদিনে উচ্ছেদ করত ভারত সমাজের এই অমানবিক অচলায়তনকে।

শ্রী ঘোষ আমাদের জানিয়েছেন, যে তিনি ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন মার্কসবাদ থেকে (পৃ ১০)। কিন্তু তিনি ইতিহাস রচনার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন ঊনবিংশ শতাব্দীর ''বাংলার নবজাগৃতি''র এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট থেকে, যিনি অবশ্যই ছিলেন বাংলায় ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের পুনর্জাগরণের এক অগ্রপথিক। আর হয়ত এজন্য তিনি কিছু ভাববাদী শব্দ প্রয়োগ করেন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রীদের অনুকরণে, তাঁর এই 'অসমসাহসী' প্রচেষ্টা দ্বারা নবজগরণের ইতিহাস রচনা সাধ্যাতীত না হয়ে, হয় 'সাধনাতীত'। কিন্তু মার্কসবাদ তাঁকে যথার্থ ইতিহাস রচনার পথে অনুপ্রাণিত না করলেও সঞ্চালিত করেছে, এমন স্বীকৃতির কথাও আমরা জেনেছি। অবশ্য তাঁরই রচিত গ্রন্থ শিরোনামের এই নবজাগৃতি যে যথার্থ বাংলার নবজাগরণ ছিল না সেকথাও শ্রী ঘোষ আমাদের জানিয়েছেন ঃ

"অবশ্য 'নবজাগরণ' প্রধানত পাশ্চাত্য ভাব-সংঘাতের আলোড়ন, এবং সেই আলোড়নও প্রধানত নগরকেন্দ্রিক নবশিক্ষিত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যেই গণ্ডিবদ্ধ ছিল ।''(পৃ ২৬)

অর্থাৎ এই নবজাগরণের সংস্কৃতি আদৌ বাঙালি জীবনের আর্থ-সামাজিক জীবন-সংগ্রাম থেকে উদ্ভূত হয়নি, এর জন্ম উৎস হলো 'প্রধানত প্রাশ্চাত্য ভাব-সংঘাতের আলোড়ন'। এবং অধিকন্তু যাঁদের নবজাগরণ ঘটেছিল তাঁরা হলেন নগরবাসী শিক্ষিত, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ। ঊনবিংশ শতাব্দীর এই নবজাগরিত মানুষেরা সমগ্র

বাঙালি জাতির ক'জন? কোন শতকরা হিসেবে কি এঁরা অনুবীক্ষণ যন্ত্রেও দৃষ্টিগোচর হবেন? সর্বোপরি এই নবজাগরণ শ্রীঘোষের মতে 'পাশ্চাত্য ভাবসংঘাতের আলোড়ন' থেকে উদ্ভূত, এর কোন স্বদেশীয় জীবনসংগ্রাম সম্পর্কিত ভিত্তি ছিল না। এটাই হলো বাংলার নবজাগরণের ঐতিহাসিক প্রহসন।

এই নবজাগরণ আরো এজন্য প্রহসন যে, যখন ইউরোপীয় পুনর্জাগরণ (Renaissance) সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধকে কেবল পরিহার নয়, উচ্ছেদ করেছে, তখন বাংলার নবজাগরণ সামন্ততান্ত্রিক তথা ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও উত্তরাধিকারকে মহিমান্বিত করেছে, যে-ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক উত্তরাধিকার প্রায় তিন হাজার বৎসর ধরে ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে এবং অতঃপর সংশ্লিষ্ট জীবন ও সংস্কৃতিকে স্থবিরতায় বদ্ধ করে রেখে ভারতের ইতিহাসকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল।

বাংলার নবজাগরণের অতিরিক্ত প্রহসন হলো এই, যে সে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রকে ঘষে-মেজে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সুবিধাভোগী শ্রমবিমুখ ধনী ও আনুবীক্ষণিক শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল মাত্র! এই ইউরোপীয় আলোকপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সুবিধাভোগীরা ইউরোপের আলোকপ্রাপ্ত মধ্যবিত্তদের [তখনও বুর্জোয়ারা সামন্ত প্রভুশ্রেণি ও ভূমিদাসদের মধ্যবর্তী স্তর] মত শ্রমজীবীদের সংগঠিত করে বুর্জোয়া বিপ্লবের মত কোন ব্রাহ্মণ্য সামন্ততন্ত্র বিরোধী বৈপ্লবিক জাগরণের নেতৃত্ব দেননি। বস্তুত এদেশীয় শ্রমজীবীদের যতটুকু নগণ্য জাগরণ ঘটেছিল তার ছিল যেমন আর্থ-ভিত্তি, তেমনি ছিল বৃটিশ-রাষ্ট্রশক্তির মদত, অবশ্যই বৃটিশ পুঁজি ও পণ্যের স্বার্থরক্ষা করার সুবাদে। এটাও এক প্রহসন, কেননা, এই জাগরণ ঘটেছিল বৃটিশ পুঁজিকে বিকশিত করতে গিয়ে বৃটিশের রাজনৈতিক স্বার্থের বিরুদ্ধে। এটা চিরায়ত ভারত ইতিহাসের বিরুদ্ধে ভারতের শ্রমজীবীদের পক্ষে ইতিবাচক, ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। ঘটনাক্রমে তাও বৃটিশের অবদান।

বাঙালির ইতিহাসে এই নবজাগরণের ট্রাজিডি হলো এই যে, যাকে বলা উচিত ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সুবিধাভোগীদের নিকট কালোপযোগী ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক পুনর্জাগরণ, তাকেই বলা হলো নবজাগরণ। এটা অবশ্যই ছিল ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সুবিধাভোগীদের এক আত্মপ্রতারণা। এই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের কালোপযোগী [ইতিপূর্বে উল্লেখিত রামমোহনের চিঠির কথা স্মরণ করা যেতে পারে] পুনর্জাগরণকে যাঁরা নবজাগরণ ভাবছেন, আসলে তা যে চিরায়ত ভারতীয় শ্রমবিমুখ সংস্কৃতিরই এক পুনর্নির্মাণ সেকথা হয় তাঁরা বুঝতে পারেননি, অথবা, অত্যন্ত সচেতন এক চিরায়ত ব্রাহ্মণ্য 'দার্শনিক প্রজ্ঞা'র দ্বারা সেকথা

তাঁরা গোপন করেছেন। এটা হয়ত তাঁদেরও ট্রাজিডি। অপরদিকে বৃটিশ শিক্ষাব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থা এদেশের ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অবদমিতদের যে সামান্য সুযোগ করে দিয়েছিল [ব্রাহ্মণ্য-প্রতিরোধ সত্ত্বেও] তাতে তাঁদের মানবিক সত্তার যে বিকাশ ঘটেছিল সেটাই হয়ত যথার্থই ছিল বাংলার নবজাগরণ। কিন্তু তাঁদের এই নবজাগরণের এই ট্রাজিডি হলো যে তাঁরা ঐ ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির নবজাগরণ নামক পুনর্জাগরণের ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক ভাবাদর্শে নিজেদের নবজাগরণকে সমর্পণ করেছেন। আর এজন্যই মানবতা-বিরোধী তথা ফ্যাসিবাদী ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র আজও স্বমহিমায় টিকে আছে।

ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অবদমিতদের এক আনুবীক্ষণিক সংখ্যার মধ্যে যে-নবজাগরণ ঘটেছিল বৃটিশের এদেশে আগমনের ফলে, সেই নবজাগরণের আরো ট্রাজিডি এখানে যে ঐ নবজাগরিতরা একদিকে তাদের এই জাগরণকে নিজ নিজ ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক জনগোষ্ঠীর শ্রমজীবীদের মধ্যে সঞ্চারিত করার কোন যথার্থ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করেন নি; বরং বিপরীতক্রমে, তাঁরা এমন পথ গ্রহণ করেছেন যাকে বলা যায় চিরায়ত ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে আত্মসমর্পণের প্রহসন যা তাদের স্বার্থবিরোধী ধর্মশাস্ত্র তাদের গিলিয়ে আসছে, এবং তাদের ভুলিয়ে দিয়ে চলেছে তাদের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্বার্থের কথা [ঈশ্বরের অবতার রাম কর্তৃক জ্ঞানচর্চারত শম্বুক হত্যা, অথবা স্বপ্রচেষ্টায় ধনুর্বিদ্যার্জনকারী একলব্যের কাছে দ্রোণ কর্তৃক গুরুদক্ষিণার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। উভয় ক্ষেত্রে এই ব্রাহ্মণের ছলনা জানা সত্ত্বেও এইসব নবজাগরিত অবদমিতরা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রাশ্রিত থাকেন] বোধহয় এদেশের শ্রমজীবীদের কাছে কেবল উনিশ শতকের তথাকথিত নবজাগরণ নয়, স্বাধীন তথাকথিত গণতান্ত্রিক ভারতের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা-সংস্কৃতিও একই সংগে এক সুবিপুল প্রহসন মাত্র।

ঊনবিংশ শতাব্দীর তথাকথিত বাংলার নবজাগরণ ইউরোপের রেনেসাঁস-এর বিপরীত অভিমুখিতাই গ্রহণ করেছিল। ইউরোপের রেনেসাঁস বা পুনর্জাগরণ ছিল জৈবিক জীবনসংগ্রাম থেকে অর্জিত এবং এজন্য এই জাগরণের সংস্কৃতি মানুষকে সাধারণভাবে করেছে ইতিহাস সচেতন তথা যুক্তি ও বিজ্ঞানচেতনা সম্পন্ন। এই নবজাগরণের দায়িত্ব ছিল সামন্ততন্ত্র-বিরোধী নতুন জীবনের উপযোগী সংস্কৃতি রচনার যা তাদের মুক্তি দেবে সামন্ততান্ত্রিক সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার থেকে। বিপরীতে ভারতের বা বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের চাষাবাদ করেছে মাত্র যা মানুষকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হওয়ার পরিপন্থী এক প্রচেষ্টার নামান্তর। যে-ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ভারতের ইতিহাস গড়ার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে তারই

পুনর্জাগরণের ঐতিহ্য নবজাগরণের দোহাই দিয়ে আজও প্রবহমান।

অতিরিক্ত সংযোজন ঃ

যে-ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র তার সুবিধাভোগীদের নিজ গৃহের নারীদেরও শ্রমজীবী তথা শূদ্রের পঙক্তিভূক্ত করেছিল, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সময়োপযোগী এই পুনর্জাগরিত অবস্থায় তাদেরও, ঐ শ্রমজীবীদের ক্ষেত্রে যেমন, আনুবীক্ষণিক নবজাগরণ ঘটিয়েছিল, একথা অস্বীকার করা যাবে না। বস্তুত ভারত ইতিহাসে নারীর এই নবজাগরণ ঐ ইউরোপীয় আলোকপ্রাপ্তির ফলশ্রুতি।

অন্য ফলশ্রুতি হলো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এক বৈপ্লবিক রূপান্তর; যাকে কোনক্রমেই ব্রাহ্মণ্য ভাষা ও সাহিত্যের পুনর্জাগরণ বলা যাবে না; যদিও একই সংগে একথাও সমান সত্য, যে এই নবজাগরিত বাংলা সাহিত্যকে ঐ ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রকে পুনর্জাগরিত করার কাজে এই তথাকথিত নবজাগরণের শুরু থেকেই ব্যবহার করা হয়েছে। একেও তাই বলা যায় ঐ নবজাগরণের প্রহসন, এবং ট্রাজিডিও বটে!

বস্তুত ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রকে অর্থাৎ হিন্দু ধর্মকে টিকিয়ে রেখে এদেশে সামাজিক অগ্রগমন সম্ভব নয়। স্বয়ং কার্ল মার্কস একথা আমাদের জানিয়েছেন। মনে রাখা দরকার ভারত সমাজে কখনই কোন সমাজ-বিপ্লব ঘটেনি। ঘটেছে সমাজ সংস্কার। সামাজিক অগ্রগমনের মার্কস কথিত চূড়ান্ত প্রতিবন্ধকতাকে (decisive impediment) এদেশের তথাকথিত 'নবজাগৃতি' বা 'নবজাগরণ' আড়াল করেছে চিরায়ত ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক কৌশলের উত্তরাধিকার দ্বারা। কেবল এই ইউরোপীয় 'ভাব-সংঘাত' কে গ্রহণ করার জন্য এই তথাকথিত নব জাগরিতরা একটা নতুন 'পুরাণ' রচনা করেন নি। সম্ভবত হয়ত এই পুনর্জাগরণের এইটুকুই কেবল 'নব'। ইতিহাস বলছে ভারতে কোনদিন সমাজ-বিপ্লব হয়নি এবং ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রেখে অতঃপর এই বিপ্লব হবেও না। এ পর্যন্ত বাংলার তথা ভারতের এই 'নব' জাগরণ এই অগ্রগমনের প্রতিরোধে যর্থাথই সফল।

ঝিঙাফুল

সংগ্রাহক বাবুলাল দাস

ঝিঙাফুল ফুটিলে ভোজনে বসে বাপো
কী দুঃখে আছি বাপো মাকে কই পাবো॥

তেলও বিনে মাথায় জটা বাপো
কী দুঃখে আছি বাপো মাকে কই পাবো।।

বস্ত্র বিনে গাছের বাকল বাপো
কী দুঃখে আছি বাপো মাকে কই পাবো।।

মাথারই ড্যাঙোর বানরে বাজে বাপো
কী দুঃখে আছি বাপো মাকে কই পাবো।।

গায়েরই ময়লা কোদালে চাছি বাপো
কী দুঃখে আছি বাপো মাকে কই পাবো।।

নাকে মোর নাক ঝলকা কানে মোর চিকসতারা
ঝুলে লো ঝুলো লো সজনি বাহার হেলে মালনি।।

সহায়ক ঃ কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স্ক শিক্ষা বিভাগ

পাতা গান

সংগ্রাহক বাবুলাল দাস

ফুলগাছটা লাগাইছিলাম ধূলামাটি দিয়া রে
সে ফুলও ফুটিয়া রইল অগমদইরার মাঝে রে॥

একটুকু পাখটা এক বেউ তার লেজটা
দেখনালে দিদি সুন্দর পাখটা।।

আম ধরে ঝোঁক ঝোঁকা তেঁতুল ধরে বাঁকা রে
এমন দেশে দেখে এলাম রাচির হাতে শাঁখা রে।।

একটুকু পাখটা হলুন বনে ঘোরে রে
কোন শালা মারি দিলে টহর টহর করে রে।।

পাতা গান

সংগ্রাহক রেবা মল্লিক

আম গাছে আম নাই যতই ফাবর মারো রে
তোদের দেশে আমি নাই যতই আঁখি ঠারো রে॥

চারকোনা পুকুরটা লবঙলতায় ঘেরা রে
ডালো ভাঙি মধু খাবো বিদেশী ভোমরা রে।।

যে হবে নদীপার তাকে দিব গলার হার
ঝাঁপ দিলে ডুবিয়া মরিব কেমনে নদী পার হব।।

নাচতে তো জানি নাই টানি আনিছে
ও খাল ভোলা রে নাচব তোর ছানা কোলে রে।।

ছানা করে মায় মায় শুকনো মাটি দাঁড়ায় নাই
চল যাব বাংলা ঘুরিতে। ছানা দুটা ভোকে কাঁদিছে।।

টুসু গান

সংগ্রাহক বাবুলাল দাস

পাহাড়ের উপরে লতা ফুল ধরে থোপা থোপা
ও মামা দিদিলো কেমনে বাঁধিব তোর খোঁপা॥

ভাদর মাসে বুড়া গেঁড়ি কুড়হাই আমি এক ঝুড়ি
ও বেহাই ছাড়ো বাট গেঁড়ি বিকলে সাঁজের ভাত।।

বুড়া নিল হালপাল বুড়ি নিল ছিঁড়া জাল
বুড়া ঝমকাইছে নাচলো শিয়াল ডাঙায়।।

আমি পাখিদের কথা বলছি

গৌতম আলী

আমি পাখিদের কথা বলছি
যাঁরা আকাশ চাইছে, সীমাহীন।
আমি সেইসব পাখিদের কথা বলছি
যাঁরা জলে-জঙ্গলে জীবন কাটাতে কাটাতে
স্বাধীনতার মানে বোঝেনি, দেশভাগের মানে বোঝেনি
অথচ দেশভাগের অভিশাপ বয়ে বেড়ায়, স্বদেশ হারায়।

আমাদের রাষ্ট্রনায়কেরা কেউ কেউ পরিযায়ী মানুষ, পাখি নন;
জন্মভূমি দেখতে যান, জন্মভূমি দেখতে আসেন
স্মৃতি মেদুরতায় ভোগেন। সাগরের জল বেগবান হয়।
পাখিদের জন্মস্থান থাকতে নেই। স্মৃতি মেদুরতা নেই।
তাই পাখিরা ঠেলা খায়, ভেসে বেড়ায়। ভাষাহীন দেশহীন।

পাখিরা কাঁদে। দেশে-উপমহাদেশে কাঁদে।
সে কান্নায় সাগর বেগবান হয় না। নো-ম্যানস্ ল্যান্ডে
দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হারিয়ে যায় বুকের মানিকেরা,
স্বপ্নেরা, সাধেরা। হাহাকার ঘুরে বেড়ায়।
তবু ভাবে - আমার সন্তান যেন .....

রাষ্ট্রনায়কদের উপহাসের ঝর্ণায় ঝরে নাগরিকত্বের মায়াজাল
১৯৫০, ১৯৬০, ১৯৭১, ১৯৮৫, ২০০৩.....
সীমানার বেড়াজালে আটকে পড়ে আকাশ
পাখিরা ডানা ঝাপটায়, আশ্রয় খোঁজে
ভাবতে চায় - আমার সন্তান যেন .....

আমরা, সোনার হরিণের ছায়া দেখেছি যাঁরা
নির্লিপ্ত থাকি, পাঁজরের ঝন্-ঝনানী উপেক্ষা করে
খাঁচা গাড়ি, নির্লিপ্ত থাকি।

বুকের তপ্ত নিঃশ্বাস পুরে পাখিরা আকাশের কথা ভাবে
এ পৃথিবীর শস্যকণা, বাসস্থানে তাঁর অধিকারের কথা ভাবে।

পাখিরা পরিযায়ী মানুষ হতে চায়॥

****
***

শ্যাদলা

গান শুনছিলাম, বেশ

দাসেদের ছেলে খবর দিল
জানাদের পোয়াতি বউ বিষ ঢেলেছে
বাপের ঘর মাইতি, দোর বন্ধ করেছে
ছোটাজাত ছেলের সাথে পালানোর দিনেই।
বলল - বেড়াজাল ডিঙ্গানো পাপ।

এরা কেউ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য নয়;
জাতের ছায়া আঙ্গুল রেখা, আলাদ আলাদা।

বেশ, এবার আয়েস হোক প্রতিরোধের গান॥

আমার দলিত দর্শন

সৌমিত্র দোস্দার

ভারতীয় সমাজ কাঠামো কতটা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দাপটে তা কলকাতা ছেলে এলিট স্কুল-কলেজে পড়া আমার পক্ষে দশ-বারো বছর আগেও বোঝা মুস্কিল ছিল। তার ওপর আবার আশৈশব বড় হয়েছি বামপন্থী পরিবেশে। গোটা দুনিয়ার জনগণকেই স্রেফ শ্রেণী বিভাজনে ভাগ করতেই অভ্যস্ত আমাদের কাছে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র — মনুসংহিতার বিধান যে এদেশের সমাজে কতটা গভীর তার জানা কিন্তু সত্যি কঠিন।

মার্কসবাদে, তার দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায়, ঐতিহাসিক বস্তুবাদে আজও আমার অমোঘ বিশ্বাস। তবু কেন জানি মনে হয় এদেশে জাত বিষয় নিয়ে আরো সিরিয়াস চর্চা করা উচিৎ। ধ্রুপদী মার্কসীয় তত্ত্বের পাশাপাশি এদেশের সমাজ কাঠামোয় জাতের অবস্থান নিয়ে অ্যাকাডেমিক বিশ্লেষণ খুবই দরকার।

দশ-বারো বছর আগে যখন তথ্যচিত্রকে পেশা হিসেবে নিই, তখন থেকে অন্য এক দেশের ছবি চোখের সামনে স্পষ্ট হতে থাকে। সে দেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলিত জনতার — যারা তথাকথিত উন্নয়নের ধাক্কায় ক্রমেই গরীব থেকে আরো গরীব হচ্ছে। তারাই মূলত মুক্ত অর্থনীতির দাপটে জল-জঙ্গল-জমি থেকে ক্রমেই উচ্ছেদ হচ্ছে। বিহারের ছবিটাই দেখুন, সেখানকার অর্থনীতি আজও প্রায় পুরোপুরি কৃষি নির্ভর। জমির মালিকানা প্রায় সবক্ষেত্রেই উচ্চবর্গের হাতে। ব্রাহ্মণ, লালা-বানিয়া-রাজপুত-ভূমিহার, সিং, মিশ্র, ঠাকুর ইত্যাদির হাতেই জমি। ভুমিসংস্কার হয়নি। নিম্নবর্গের দলিতরা ভূমিহীন ক্ষেতমজুর অথবা অন্যান্য রাজ্যে রোজগারের আশায় প্রতিবছর ছুটে যাওয়া কৃষি শ্রমিক। এই যে পাঞ্জাব-হরিয়ানার বহু ঘোষিত 'সবুজ বিপ্লব' তার পিছনেও রয়েছে বিহারের দলিতদের শ্রমও ঘাম। কয়েকবছর আগেও দলিত জনগণকে যখনতখন জমি থেকে উচ্ছেদ ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। দিনমজুরি ছিল যৎসামান্য। তাও আধিকাংশের জুটত না। তাছাড়া সামন্ত মনোরঞ্জনে বাধ্য থাকত বিহারের দলিত। কয়েকবছর আগেও ছিল মধ্যযুগীয় বর্বরতা — ডোলি উঠানো প্রথা। নিয়ম ছিল ডোলি বা পালকি বিয়ের কনেকে নিয়ে প্রথমে যাবে গ্রামের জমিদারের বাড়িতে। তিনি ইচ্ছেমত ভোগ করে মেয়েটিকে শ্বশুরাল

যাওয়ার অনুমতি দেবেন। উচ্চবর্গের আদেশ ছাড়া নিম্নবর্গের কারোর ভালো পোষাক পরারও অনুমতি ছিল না। নিয়ম না মানায় রামরুচি রাম ও তার স্ত্রী রাজকিশোরি দেবীকে দিনের বেলায় প্রকাশ্যে গুলি করে মেরেছিল উচ্চবর্গের নিজস্ব রণবীর সেনা।

দলিত হেনস্থা করতে উচ্চবর্গের মাতব্বরেরা একাধিক নিজস্ব লেঠেলবাহিনী গড়ে তুলেছিল বিহারে। রাজপুতদের কুঁয়ার ও সানলাইট, ভূমিহারদের রণবীর, মধ্যমবর্গ ইত্যাদি বিভিন্ন নামের 'সেনা'দের কাজ ছিল দলিতদের 'অবাধ্য' হলেই শাস্তি দেওয়া। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তারা প্রশাসনের মদত পেত। মনে আছে তখন হাইবাজপুরে দশজন দলিতকে খুন করা হয়েছে। ক্যামেরা ইউনিট নিয়ে তার দুদিন পরে পাটনা থেকে ষাট-সত্তর কিলোমিটার দূরের ওই গ্রামে নিহত পরিবারের কাছে গেছি। ভয়ে একজনও মুখ খুলছে না, শুধু অসম সাহসী এক দেহাতি প্রবীণ টানতে টানতে কিছু দূরের এক কুয়োর সামনে নিয়ে গেলেন। দলিতদের রক্ত দিয়ে সেখানে হোলি খেলেছে। গোটা বিহার জুড়েই রণবীর ও অন্যান্য সেনারা এ পথেই বছরের পর বছর দলিতদের রক্ত দিয়ে হোলি খেলে। কে না এখন জানে হোলির আগের দিন যে নেরা পোড়ানো হয় সেদিন দলিতদের গ্রামে আগুন দেওয়াও উচ্চবর্গের কাছে উৎসবের পরম্পরা।

ব্রাহ্মণ্যবাদী এই হিংস্রতার বিরুদ্ধে উনিশশো ষাট-সত্তর থেকে অবশ্য পাল্টা প্রতিরোধে নেমেছে দলিত জনতা। সত্তর-আশির দশকে যে গণবিদ্রোহ, জঙ্গি কৃষক আন্দোলন তা শুধুমাত্র শ্রেণী রাজনীতি দিয়ে বোধহয় ব্যাখ্যা করা যাবে না। ....., পাসোয়ান, কাহার, ধোবি, ..., চামার, ... ইত্যাদি পিছড়ে ও অতি পিছড়ে বর্গের যে লড়াই তার পিছনে জমির খিদে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের আকাঙ্খা নিশ্চয় ছিল ও আছে। কিন্তু তাছাড়া রয়েছে নিজেদের আইডেনটিটি ক্রাইসিস থেকে বেরিয়ে আসার তাগিদ। যে তাগিদেরই এক অন্য চেহারা দেখা যায় ঝাড়খণ্ড ওড়িশা বস্তারের বিস্তীর্ণ এলাকায় সংগ্রামী রাজনীতির বিপুল বিস্তারের মধ্যেও। অর্থনৈতিক শোষণ তো নিশ্চয় একটা কারণ কিন্তু অন্য কারণ নিঃসন্দেহে সামন্ত-জমিদারদের অসহনীয় অত্যাচার - যে সামন্ততন্ত্রের চালচিত্র নির্মাণ ব্রাহ্মণ্যবাদের দাক্ষিণ্য। বিহারের ডোলি উঠানো মতই দু'দশক আগেও মহারাষ্ট্রের গরচৌলিতে ছিল ব্লাউজ খোলা প্রথা। বিয়ের পরে পরে বিবাহিত মেয়েদের বাধ্য করা হত খোলা বুকে সামন্ত বা উচ্চবর্গের সমাজপতিদের সামনে হেঁটে-চলে বেড়াতে। অন্যথা হলেই শাস্তি অনিবার্য। সমাজপতিদের বিধানে জনসমক্ষে ধর্ষণও ছিল স্বাভাবিক শাস্তি প্রক্রিয়া।

দিনের পর দিন এই মাত্রাছাড়া অত্যাচারের বিরুদ্ধেই আজ দলিত জনতা মাথা তুলছে। কোথাও সশস্ত্র রাজনীতির পথে কোথাও আবার গান্ধীবাদী পথে। কুডানকুলামে যে গণবিদ্রোহ জেলেদের জীবিকা হারানোর আশঙ্কায় গান্ধীভাবনায় সত্যাগ্রহ অনশন-তাও কিন্তু দলিত জনগণের বাঙ্ময় হওয়া।

সারা দেশেই এই ছবিটা স্পষ্ট হচ্ছে। মুক্ত অর্থনীতি যত দেশকে ইন্ডিয়া ও ভারতে ভাগ করছে ততই এলিট-দলিত দ্বন্দ্বও তীব্র হচ্ছে। এদেশের রাষ্ট্রশক্তি মূলত বর্ণহিন্দুত্বের পৃষ্ঠপোষক। তাই নতুন জাহাজ বা কারখানার সূচনা হলেও নারকোল ফাটিয়ে পূজো করা রাষ্ট্রীয় প্রথা। বিহারের নালন্দা বা দক্ষিণ ভারতের সর্বত্র হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদীরা দেবোত্তর সম্পত্তির নামে একরের পর একর জমি বছরের পর বছর দখল করে রেখেছে। এমনকী তথাকথিত প্রগতিশীল রামকৃষ্ণ মিশনও যে সম্পদের ওপর নিজেদের সংস্থার বিবিধ কাজ করে যাচ্ছেন তা অধিকাংশই দলিত কৃষকদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে। রাষ্ট্র, সরকার, প্রশাসন, ঠিকাদার, জমির দালাল, জঙ্গল মাফিয়া, ধর্মীয় গুরু, সব মিলে যে অশুভ আঁতাত তা আসলে দলিতদের দাবিয়ে রাখার চক্রান্ত।

শ্রেণীসংগ্রাম আসলে লুকিয়ে আছে ভারতের জাতব্যবস্থার বিরোধের মধ্যে। ওড়িশায়, বিহারে, বস্তারে, মহারাষ্ট্রে গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে মনে হয় কোসম্বীকে অনুসরণ করে আমাদের মার্কসবাদ পাঠেও পরিবর্তন জরুরী।

দেশজুড়ে বিকল্প কৃষিকাজের খোঁজ

বিজয়া করসোম

> .....আমি এই সমস্ত ক্ষুদ্র চাষীকে আমার শিক্ষক মনে করতাম। আমি তাদের কাছ থেকে শিখেছিলাম রোগমুক্ত ও স্বাস্থ্যবান ফসল ফলাতে এবং কীভাবে কৃত্রিম সার ও তেল ব্যবহার বন্ধ করে চাষ করতে হয়।
>
> **স্যার অ্যালবার্ড় হাওয়ার্ড**

নারায়ণ রেড্ডি। বাঙ্গালোর থেকে পঁচিশ কিলোমিটার দূরে রয়েছে ছোট একটি শান্ত গ্রাম সোয়ানহানিজ। সেখানে রেড্ডি তৈরি করেছেন প্রাকৃতিক খামার। কী নেই তাতে? সেখানে রয়েছে জল, সার , প্রাকৃতিক কীটনাশক, পশুখাদ্য এবং বায়োগ্যাস। খামারটি থেকে শুধু রেড্ডি পরিবারের প্রয়োজনীয় খাদ্যের চাহিদা যে মেটে, তা নয়। এর বাইরেও প্রচুর ফসল ফলে। তা বিক্রি করে রেড্ডি পরিবারের বেশ লাভ হয়। দশ একরের এই খামারটির মাত্র চার ভাগের এক ভাগ শস্য, ডাল ও শাকসব্জি উৎপাদনের ব্যবহৃত হয়। বাকি অংশে রয়েছে বিভিন্ন ফল ও অন্যান্য গাছ।

রেড্ডি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলির আরোপ করা অনেক অবাস্তব ধ্যান-ধারণাকে নস্যাৎ করে দিতে পেরেছেন। যেমন জমিতে লাঙ্গল দেওয়া কৃষি বিশেষজ্ঞদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রেড্ডির মতে তা শুধু পণ্ডশ্রম। তিনি বলেন, 'মাটি জীবন্ত বস্তুতে সমৃদ্ধ। গভীরভাবে লাঙ্গল দিলে মাটি প্রাণহীন হয়েপড়ে'। খামার ঘিরে থাকা কাঁঠাল, তেঁতুল, নিম ইত্যাদি গাছ রেড্ডির কাছে মূল্যবান সম্পদ। এই গাছগুলি বাতাসের দাপট থেকে খামারকে রক্ষা করে, ভূমিক্ষয় রোধ করে। এছাড়া এগুলি জল সংরক্ষণ করে, আসবাব ও জ্বালানির জন্য কাঠ সহ ফল, মধু ইত্যাদি খাদ্যবস্তুর জোগান দেয়। গাছগুলি থেকে পাওয়া যায় ওষুধ, কীটনাশক, সার, জৈবপদার্থ ও পশুখাদ্য। তিনি জোর দিয়ে বলেন, 'তুচ্ছ আগাছারও প্রকৃতির পুষ্টিচক্রে এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। আগাছার দল মাটির জলসংরক্ষণে সাহায্য করে মাটিথেকে যতটুকু পুষ্টি তারা নেয়, এর চাইতে অনেক বেশি তারা মাটিতে ফিরিয়ে দেয়। এছাড়া, কীটপতঙ্গদের আকর্ষণ করে

তারা ফসলকে রক্ষা করে। ....ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ কোনও সমস্যা নয়। নিমের গুঁড়ো, বরবটি বা ঘৃতকুমারী জাতীয় উদ্ভিদের পাতার তরল মিশ্রণ ছিটিয়ে পোকা-মাকড়দের ফসল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া যায়। আর এতে উপকারী কীটপতঙ্গরাও বেঁচে থাকে'।

আশ্চর্যের ব্যাপার হল, সত্তরের দশকের প্রথমদিকে নারায়ণ রেড্ডি সরকার প্রচারিত সবুজ বিপ্লবকেই আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছিলেন। পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত মাত্র দেড় একর জমিতে তিনি বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিলব্ধ জ্ঞান ব্যবহার করে কৃষিকে খুব সাফল্য অর্জন করেন। তাঁর খামার সারা রাজ্যে একটি দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছিল। সর্বোচ্চ ফলনের পুরস্কার হিসেবে তিনি পেয়েছিলেন জেলা ও রাজ্যস্তরের পুরস্কার। কিন্তু এরপরই নেমে আসে দুর্দশা। খরচের সঙ্গে ফসলের উৎপাদনের তুলনা করে রেড্ডি দেখলেন তাঁর ক্ষতিই হচ্ছে বেশি। হতাশায় ভুগে তিনি চাষবাস ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। ওই সময় তাঁর সঙ্গে দেখা হল আমেরিকান অ্যালভিন ড্রাকারের। প্রাকৃতির চাষের পরামর্শ রেড্ডিকে দেন এই বিদেশি ভদ্রলোক। রেড্ডি চার বছর জমিতে জৈবসার ব্যবহার করতে থাকেন। মাটি ধীরে ধীরে তার হারানো স্বাস্থ্য ফিরে পায়। নারায়ণ এখন বিশ্বাস করেন, অর্থনীতির আঁটসাঁট বন্ধন শীঘ্রই জনগণকে প্রাকৃতিক চাষের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য করবে।

"আমরা এখানে স্বনির্ভর ধানের চাষ করি — কোনও রকম বহিরাগত জিনিস ছাড়াই এবং খামারের উৎপাদিত বস্তুর দক্ষ পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে। ফলে ধানের অধিক ফলন পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানে প্রতি হেক্টরে গড়ে ধান উৎপান চার টন। ধীরে ধীরে উৎপাদনের মাত্র বাড়ছে'। কথাগুলি পণ্ডিচেরীর কাছে 'গ্লোরিয়াল্যান্ড' খামারের ম্যানেজার মণীন্দ্রপালের। এই খামারটি দেশের সর্ববৃহৎ খামারগুলির মধ্যে একটি। সেখানে প্রাকৃতিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা হয়।

মণীন্দ্র জানান, 'ভালভাবে লাঙ্গল করা মাঠে ধানের বীজ হেক্টর প্রতি ৬২.৫ কেজি রোপণ করা হয়। এছাড়া, মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করতে জৈবগ্যাস উৎপাদনের পর অবশিষ্টাংশ ও গরুর মূত্র সেচের জলের সঙ্গে মিশিয়ে পাম্প করে জমিতে দেওয়া হয়। .....সাধারণত এই শস্যে কোনও ভয়ানক রোগ পোকার আক্রমণ হয় না। কারণ উর্বর এবং শক্তিশালী মাটি শক্তিশালী উদ্ভিদের জন্ম দেয়। গত সাত বছরে খামারটিতে ভয়ঙ্কর পোকা বা রোগের আক্রমণ হয়নি। যা হয়েছে, তা সামলেছে ব্যাঙ ও পাখির দল। ....খরচের তুলনায় খামারটিতে পঞ্চশ শতাংশ বেশি উৎপাদন হয়েছে। এ পর্যন্ত এখানে এক হেক্টর জমিতে সব থেকে বেশি প্রায় নয় টন ধান উৎপাদিত হয়েছে। পাশা

পাশি খড় উৎপাদনও খুব ভাল হয়েছে। বর্তমানে খামারটিতে জমি না চষে কৃষিকাজ করা হচ্ছে। এর ফলও উৎসাহব্যাঞ্জক। এ ক্ষেত্রে জমিতে খড় থাকাকালীন অবস্থায় মাটিতে সরাসরি বীজ রোপণ করা হচ্ছে। দেখা গেছে মাটি না চষে শস্য উৎপাদন পদ্ধতিতে পাঁচ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে চষা জমির উৎপাদনের থেকে।

বিজয়লক্ষ্মী ও বালাকৃষ্ণণ। দুই শিক্ষক-শিক্ষিকা। তাদের নিরলস প্রচেষ্টায় কেরলের পালকোড় জেলার আগালি গ্রামে এখন সৃষ্টি হয়েছে লক্ষাধিক টাকার বনজ সম্পদ। প্রায় আট হেক্টর জমি তারা প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে চাষ করে ভাল ফসল পেয়েছেন। কাজ শুরু করেন ১৯৮৩ সালে। তখন মাটি ছিল খাঁ খাঁ। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তারা মাটি ও জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেন। এরপর ঢালের আড়াআড়ি আল তৈরি করেন। জল ধরে রাখার জন্য চারটি পুকুরে হাতে তৈরি বাঁধও নির্মাণ করেন তারা। আগে জলের জন্য পাহাড়ের নিচে যেতে হত তাদের। কিন্তু এগুলো তৈরি করার ফলে শুখা মরশুমেও পর্যাপ্ত জল মিলতে লাগল। সোয়া সাত হেক্টর জুড়ে লাগানো হল বিভিন্ন গাছ। কয়েক বছরের মধ্যে গাছগুলি বড় হয়ে ভূমিক্ষয় রোধে ভূমিকা নিল।

খামারের সমস্ত সার আসে গাছ ও কেঁচো থেকে। বনে যেহেতু অনেক পাখি আসে তাই ফসলের পোকামাকড় তারাই খেয়ে ফেলে। কীটনাশকের আর দরকার পড়ে না। 'আমাদের মূল লক্ষ্য হল নিজেদের জন্য জ্বালানি, খাদ্য ও সব্জি পাওয়া। এখন আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য যথেষ্ট খাদ্য তৈরি করছি। অতিরিক্ত যা হচ্ছে তা দিয়ে যেগুলি খামারে পাওয়া যায় না, সেগুলি জোগাড় করে নিই। আমাদের বর্তমান লক্ষ্য, আরও অন্যান্য অঞ্চলে প্রাকৃতিক চাষ শুরু করার জন্য এই চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া', জানালেন বিজয়লক্ষ্মী ও বালাকৃষ্ণণ।

স্থান ঃ দক্ষিণ রাজস্থানের দুঙ্গারপুর জেলা। দেশ স্বাধীন হবার সময় জেলাটির সমস্ত জমির ৩৫ ভাগ ছিল বনভুমি। কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদের অধিক ব্যবহারের ফলে ১৯৮১ সালে বনের জমির পরিমাণ কমে দাঁড়ায় সাড়ে সাত ভাগে। ফলে শুরু হয় জলের অভাব, ভূমিক্ষয়, খরা ইত্যাদি। এই জেলায় আদিবাসীর সংখ্যা বেশি। বনজ সম্পদই ছিল তাঁদের বেঁচে থাকার অবলম্বন। হাঘরে মানুষগুলি পড়েন আতান্তরে।

মাটি ও জলের সংরক্ষণ ছাড়া জীবন ও জীবিকাকে সুস্থায়ী করা সম্ভব নয়। আর এ

জন্য দরকার বন সৃষ্টি করা। ব্যস্। সঙ্গে সঙ্গে কাজে নামা হল। শুরুতেই ধরা পড়ে, তাদের অঞ্চলে যে তিনশ রকমের গাছ-গাছড়া ছিল এর মধ্যে বেঁচে আছে মাত্র সত্তরটি। ফলে বীজ ও চারা কিনতে হয় তাদের। পরে নিজেরাই তৈরি করেন বীজ ব্যাঙ্ক। জেলার মহিলাদের কাছ থেকে কেনা হত তাদের উদ্বৃত্ত বীজ। মহিলারা তাতে দুপয়সা উপার্জনের স্বাদ পেলেন। পশুচারণ নিয়ন্ত্রণ করে পতিত জমিতে উৎপাদন, জলা সংরক্ষণ ও যেসব গাছ থেকে দরকারি জিনিস পাওয়া যায়, তার রোপণ করতে থাকেন তাঁরা। তাঁদের সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ শিবিরের মাধ্যমে তাঁরা বেশ কিছু গ্রামের সংগঠনকে একাজে টেনে নিয়ে আসেন। ১৯৮৯ সালের মধ্যেই এরকম প্রায় ত্রিশটি দলকে নিয়ে ৩০০ হেক্টর জমিকে বনে রূপান্তরিত করে ফেলেন। এখন সেখানে বৃষ্টি বেড়েছে, কমেছে খরা।

উপসংহারের বদলে ঃ এসব খবর পান না আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা? তারা শুধু জানেন, '...খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গেলে সরকারকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খাদ্য উৎপাদনের দিকে ঝুঁকতে হবে....'। তারা কি জানেন না 'আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি' মানে বহুজাতিক কোম্পানির প্রদর্শিত পথ ধারে এগিয়ে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের (যা এখনও অবশিষ্ট আছে) কু-ব্যবহার, জলে-স্থলে-বাতাসে নানা ধরনের বিষের বিস্তার আর মৃত্যুর হাতছানিকে মেনে নেওয়ার কথা? দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট সংস্থা সরকারি নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিকল্প কৃষিনীতি নিয়ে কাজ করছেন এবং এর সুফল পাচ্ছেন। সরকারি কর্তারা এসব দেখছেন না কেন? শুনছেন না কেন তাঁদের কথা? আমাদের দাবি, এসব নিয়ে অতি দ্রুত দেশজুড়ে জনমত তৈরি হোক। নইলে সামনে ঘোর অন্ধকার।

****

ভরসা গাঙ্গের ভরসা পানি, খেলুক সবার ভরসা হালে

মানুষের দেবতাকে স্বীকার করে এবং প্রণাম করে যাব, আমার জীবন দেবতা আমাকে সেই মন্ত্র দিয়েছেন।

রবীনদ্রনাথ ঠাকুর

আরও কিছু সুখবর এসে জমা হল। প্রথমেই বলে সাঁকরাইলের ভীমচন্দ্র দাসের কথা। নিজের বসতবাড়রি সংস্কার করতে পারেন না। অথচ প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা খরচে মেয়েদের হাইস্কুল গড়েছেন তিনি। তবে এর পেছনের গল্পটা বেশ বেদনাদায়ক। দু'বছর আগে এক মোটরবাইক দুর্ঘটনায় মারা যান ভীমচন্দ্রের ছাব্বিশ বছর বয়সী একমাত্র ছেলে অভিজিৎ। প্রথমদিকে একেবারেই ভেঙে পড়েন বাবা ও মা। পরে তাঁর স্মৃতিরক্ষায় নিজের জমি বিক্রি করে স্কুল তৈরির পরিকল্পনা নেন তারা। বলেন ভীমচন্দ্র, ''ভেবে দেখলাম ছেলের স্মৃতিতে কিছু করা দরকার। রাস্তার ধারেই আমার কয়লা ও কেরোসিনের দোকান। সেখানে বসে দেখি, আমার গ্রামের মেয়েরা বাস ও ট্রেকারে করে ঝুলে ঝুলে স্কুলে পড়তে যায়। এইসব দেখে ছেলের দুর্ঘটনার কথা মনে পড়ে যায় আমার। ওদেরও যদি কিছু হয়! ঠিক করলাম, গ্রামের বাচ্চা মেয়েদের বাইরে পড়তে যেতে দেব না। গ্রামেই একটা স্কুল করে দেবো''।

প্রস্তাবটি শোনামাত্র লুফে নেন গ্রামবাসীরা। কারণ সাঁকরাইলের ধূলাগড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বেশক'টি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও মেয়েদের জন্য আলাদা কোনও হাইস্কুল নেই। ফলে তাদের আট-দশ কিলোমিটার দূরের অন্য স্কুলে গিয়ে বড়তে হত। গ্রামের পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি জানান : ''এখানে প্রধান জীবিকা হল জরির কাজ। মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর জন্য বাস বা ট্রেকার ভাড়া জোগাড করতে পারেন না অনেক অভিভাবক। ফলে তারা পড়া ছেড়ে দেয়। আগেও এই সমস্যা মেটাতে গ্রামে মেয়েদের স্কুল গড়ার জন্য আমরা চেষ্টা করি। কিন্তু জমি বা স্কুলবাড়ি তৈরির টাকা আমাদের ছিল না। এখন আমাদের মেয়েরা পড়াশোনা করতে পারবে। ভীমচন্দ্র দাসের কাছে আমরা সত্যি কৃতজ্ঞ''।

গ্রামবাসীদের কাছে স্কুল তৈরির বিনিময়ে ভীমচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী রাধারানিদেবী একাই আবেদন রেখেছেন। সেটি হল, ''স্কুলটি যেন আমাদের ছেলে অভিজিৎ-এর নামে হয়।

ছোট ছেলেমেয়েদের আমার ছেলে খুব ভালবাসত। তারা স্কুলে এসে আমার ছেলেকে মনে করবে''। আবেদনটি মেনে নিয়েছেন গ্রামবাসী। স্কুল চালানোর অনুমোদনও মিলে গেছে। প্রথম পর্যায়ে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হবে। পরের বছর নবম-দশম শ্রেণির পাঠক্রম চালু হবে। স্কুলে আপাতত পঁয়ষট্টি বছর বয়সের নিচের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের নিয়োগ করা হবে। পরের বছর থেকে স্কুল সার্ভিস কমিশন শিক্ষক পাঠাবে।প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা ইতিমধ্যে খরচ করে ফেলেছেন ভীমচন্দ্র বাবু। রাধারানিদেবী জানালেন, দরকারে তিনিও তাঁর সব গয়না বিক্রি করে দেবেন। তবু স্কুলের কাজ যেন না আটকায়।

এবারে বলি শিলিগুড়ির একদল পাখিপ্রেমীর কথা। সাল ২০০২। শিলিগুড়ির চাঁদমণি চা বাগানের শতাধিক একর জমিতে 'উত্তরায়ণ' উপনগরীর গোড়াপত্তন হয়। তখন চাগাছের সঙ্গে উপড়ে ফেলতে হয় হাজার হাজার 'শেড ট্রি' অর্থাৎ ছায়াগাছ। তাতে রাতারাতি বেঘর হয় নানা প্রজাতির অসংখ্য পাখি। সাজানো-গোছানো উপনগরী তৈরি হওয়ার পর কিছুটা সবুজায়ন হলেও পাখিদের ফিরিয়ে আনার জন্য আলাদা করে কোনও পরিকাঠামো তৈরির কাজ কিন্তু হয়নি। ফলে নগরী থেকে পাখি উধাও হয়ে গেল।

তল্লাটে পাখি নেই এমন দৃশ্য দেখে আঁতকে উঠেন উপনগরীর অনেক বাসিন্দা। এদের মধ্যে একজন রীতা দত্ত। তাঁর নিজের কথায় পাই : "আমরা বাড়ি করে থাকতে শুরু করার পরে এলাকায় পাখিরা আসে না কেন ভেবে অবাক হতাম। শিলিগুড়ির পরিবেশপ্রেমীদের পাশে পাওয়ায় আমাদের মনের জোর আরও বেড়ে যায়''। রীতাদেবী নিজের বাড়ির গাছেপাখিদের জন্য বাসা বানিয়ে দেন। পাখিরা আসতে শুরু করে। মূলত তার কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে আরও অনেকে পাখি ফেরানোর কাজে হাত দিয়েছেন। '' আপাতত শিলিগুড়ির উপনগরী লাগোয়া এলাকায় পাখির কিচিরমিচির কিছুটা হলেও শোনা যাচ্ছে।

— ''কাকু, ডাল ভাঙলে গাছের লাগে?'' —''বলিস কি রে'', গাছের একটা বড় ডাল আমাদের পাঁজরের মতো। ভাঙলে যন্ত্রণা হবে না? গত বছর পাকুড় গাছটার গায়ে যখন প্রথম করাত পড়ল, পাতাগুলো কঁকিয়ে ওঠেনি?'' স্থান - হোগলবেড়িয়া।

প্রশ্নকর্তারা প্রাথমিক পড়ুয়া। আর যিনি উত্তর দেন, তিনি প্রৌঢ় বিশ্বনাথ মণ্ডল।

পাতাদের কঁকিয়ে ওঠা কিংবা ঝড়ে ভাঙা গাছের ডাল ছুঁয়ে কান্না নদিয়া সীমান্তের গ্রামীণ মানুষের অচেনা নয়। আর তাই, লড়ঝড়ে সাইকেল দাপিয়ে দিনভর গাছ কাটা রুখে কিংবা ছেলেপুলেদের গাছ বাঁচানোর 'ক্লাস' নিয়ে বেড়ানো বিশ্বনাথবাবুকে সযত্নে একটা নামও দেওয়া হয়েছে 'গাছকাকু' বলে। সীমান্তের বেআইনি গাছ কাটার কারবারিদের কাছে তিনি এক মূর্তিমান আপদ। নির্জন দুপুরে কিংবা বর্ষার সন্ধ্যায় কাঠুরেদের সঙ্গে অসম লড়াইয়ে বিশ্বনাথবাবু কয়েকবার মারধরও খেয়েছেন। এতে বিন্দুমাত্র দমেননি তিনি।

প্রথমদিকে একাই গাছ বাঁচানোর কাজ করতেন। এখন পেয়েছেন বেশ কিছু গ্রামবাসী আর স্থানীয় স্কুলগুলোর কচিকাঁচাদের সহযোগিতা। কী করে ছাত্রছাত্রী জোটালেন? বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে টিফিনের বা স্কুলশেষে গাছের উপকারিতা বুঝাতেন খুদেদের বিশ্বনাথ মণ্ডল। তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে গাছ চেনাতেন। কখনও বা ছোট্ট চারাগাছ হাতে দিয়ে দায়িত্ব সমঝে দিতেন। বলতেন, ''এটা তোমার বোন। একে তোমার বাঁচাতে হবে''। গাছকাকুকে আপদ বলে মানতে রাজি নয় ছোটরা। বরং, ''টিফিনের ঘন্টাটা পড়ার জন্য অপেক্ষা করি। বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকেন গাছকাকু। রোজ এসে গাছ চেনান। তঁর জন্যই আমাদের এত এত গাছ চেনা হয়ে গেছে''। আর তাই তাদের হাত ধরে সবুজ হয়ে আসছে এলাকাটা। বাসা বাঁধছে হরেকরকম পাখিও।

নিজের কাজ নিয়ে কী বলেন বিশ্বনাথবাবু? একবার আমরা শুনে নিই তাঁর কাছ থেকে : ''স্কুলে পড়ার সময় শিক্ষক বলেছিলেন বাবা, গাছ বাঁচলে আমরা বাঁচব। সে কথাটা মনে ধরেছিল। সামান্য কিছু জমি আছে। তা দিয়ে খাওয়া-দাওয়া চলে যাচ্ছে। তাই আর রোজগারপাতির ব্যবস্থা করতে হয়নি। গাছেদের নিয়ে দিব্যি আছি। সবাই মিলে চেষ্টা করলে রুখা জমি সবুজ হতে কতক্ষণ?'' আর কী বলেন বিশ্বনাথবাবুর সেদিনের গাছ বাঁচানোর স্বপ্ন ধরিয়ে দেওয়া সেই শিক্ষক মোহনলাল মণ্ডল? তিনি জানান, ''ওই দিনের টুকরো কথাটা মনে রেখে বিশ্বনাথ সারাটা জীবন গাছ নিয়েই থাকল। বিয়ে পর্যন্ত করল না। ও তেমন লেখাপড়া করেনি ঠিকই, তবে অনেক শিক্ষিত মানুষের থেকে বিশ্বনাথ অনেক বড় মানুষ। আমি গর্বিত ওর জন্য।''

এবারে বলি করিমগঞ্জ শহরের শ্যামলরঞ্জন দেব, নির্মলেন্দু দত্ত, অপর্ণা দেবদের কথা। অনেকদিন ধরেই কিছু একটা ভাল কাজ করার স্বপ্ন নিয়ে তাঁরা একজোট

হচ্ছিলেন। সাল ২০০৮। সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য তৈরি করলেন শান্তির আশ্রয় : 'বেলাভূমি'। শুরু করার পর থেমে থাকতে হয়নি। এগিয়ে এল আরও অনেকের সহযোগিতার আশ্বাস। আর তাই, প্রথমে ভাড়া বাড়িতে কাজকর্ম চললেও সম্প্রতি 'বেলাভূমি' পেয়েছে এক স্থায়ী ঠিকানা। সীতাংশু এবং সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য নামে দু'জন সহৃদয় ব্যক্তি তাঁদের করিমগঞ্জস্থ বাড়িটি দান করেছেন 'বেলাভূমি'-কে। ''বরাকে এখনও বৃদ্ধাবাসের প্রয়োজন হয়নি যারা বলেন, তারা বাস্তব সত্য থেকে অনেক দূরে বলে আমাদের মনে হয়। তবে আমরা কখনই কাউকে বাড়ি-সংসার ছেড়ে আসার ব্যাপারে উৎসাহ দিচ্ছি না। শুধুমাত্র সহায়হীন যারা আছেন — অগ্রাধিকার তাদেরই। আমরা এর পাশাপাশি 'সেবা' বলে একটি পত্রিকাও বের করি।''

চারপাশে এমন অনেক ভাল মানুষ আছেন বলেই আমরা এখনও এত হতাশা-বঞ্চনার মধ্যে থেকেও সুদিনের আশা ছেড়ে দিতে পারি না। এমন মানুষের চিন্তার ও কাজের প্রসার ঘটুক

****

-ঃ যে যেখানে লড়ে যায় আমাদেরই লড়াই ঃ-

''আজ পল্লীর জলাশয় শুষ্ক, বায়ু দূষিত, পথ দুর্গম, ভাণ্ডার শূন্য, সমাজবন্ধন শিথিল, ঈর্ষাকলহ কদাচার লোকালয়ের জীর্ণতাকে প্রতিমুহূর্তে জীর্ণতর করিয়া তুলিতেছে।''

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহা সমারোহে পাঁচ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়। মিটিং-মিছিল-আলোচনা -বিতর্ক-ক্যুইজ-প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতা ইত্যাদি সব হয়। তবে একটা সত্য কথা হল, পরিবেশ নিয়ে একগাদা খারাপ কথা শুনেছিও। খারাপ বলতে ভয়ের -আশঙ্কার কথাই বলতে চাইছি। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকাঠামো বিশ্বের জল-মাটি-বাতাস সবকিছুরই দফারফা করে দিয়েছে। সবকিছুতে বিষ মিশেছে। বেঁচে থাকার ন্যূনতম আশাও এখন আর আমাদের দেখাতে পারছেন না কেউ। পরিবেশ বাঁচানোর উদ্যোগ নেয়নি সরকার,

রাষ্ট্র, জনগণ সময়মতো। ফলে ভুগতে হবেই। এর কোনও অন্যথা নেই। থাকতে পারে না। তবু, এর মধ্য কিছু মানুষ থাকেন, যারা এসব জেনেবুঝেও মন খারাপ করেন না। নিজেদের মতো কাজ করে যান নীরবে। তাঁদের বিষয়ে এক সাক্ষাৎকারে দেশের প্রথমসারির অন্যতম এক জলদেবতা বা প্রকৃতিবিদ অনুমপ মিশ্র বলেছেন, সমাজ যখন ঘুমের ঘোরে চলে তাকে ডেকে সতর্ক করে দেওয়ার লোক থাকতেই হবে। কোনও সমাজে যদি সেইরকম লোকের অভাব ঘটে তাহলে সে সমাজ হোঁচট খাবে। নিচে পড়ে যাবে।

এমন এক মানুষ হলেন কর্ণাটকের অরুণ কুমার। তিনি ইঁদুর মারার এক নতুন কল তৈরি করেছেন। এটি ইঁদুর তাড়াতে খুব ভাল কাজ করছে। কলটি বানাতে তেমন কিছু লাগে না। একটা পুরনো ঝুড়ি, কয়েক হাত তার, কিছুটা প্লাস্টিকের দড়ি, নারকেল ফালি একটা আর একটি ইঁদুর ফাঁদ ব্যস্। আর কিছুর দরকার নেই। তবে যেখানে নারকেল নেই বা ফলে না, সেখানে অন্য ফলের টুকরো নেওয়া যেতে পারে। আগে আগে ফাঁদ পেতে ইঁদুর মারায় তেমন লাভ হত না। বড়জোর তিন-চারটে ইঁদুর মরতো। ওই ইঁদুরগুলি মরার সময় গা থেকে এমন এক ফেরোমেনের মতো সঙ্কেত বের করে যা পেয়ে অন্য ইঁদুরেরা সাবধান হয়ে যেত। আবার বিষ মাখিয়ে ইঁদুর মারা বিপদ অনেক। এতে অনেক পাখিও মরে যায়। কিন্তু অরুণকুমারের এই যন্ত্রে বিষ-এর ঝামেলা নেই। পাখি মারা যাওয়ার ভয় নেই। বরং এই যন্ত্র ইঁদুর মারার জন্য অব্যর্থ। বানানোর খরচও খুব কম। অরুণ এখন পর্যন্ত এক হাজারটি যন্ত্র বিক্রি করেছেন। দাম রেখেছেন ৩০-৩৫ টাকা। মাইসোর ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচালাল রিসার্চ-এর এক কৃষি সৃজন সম্মেলনে অরুণ অংশ নিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর যন্ত্রটি সমাদর পেয়েছে। এছাড়া, ইঁদুর খতমের এই যন্ত্রটি ফার্ম ইনোভেটর্স - ২০১০ নামক গবেষণামূলক বই-এ জায়গা করে নিয়েছে।

এবার বলি এক সবুজপ্রেমীর কথা। লবটুলিয়া, নাঢ়া বইহার, সপস্বতী কুণ্ডে নিজের উদ্যোগে গাছের চারা পুঁততেন যুগলপ্রসাদ। আর ওই ধারাকে বজায় রেখে ব্রহ্মপুত্রের বালুচরে দীর্ঘদিন ধরে গাছ লাগিয়ে চলেছেন যাদব পায়েং। ডাকনাম মলোই। তাই তাঁর তৈরি করা অভয়ারণ্যের নাম হয়েছে, 'মলোই কাঠোনিবাড়ি' বা 'মিনি কাজিরাঙ্গা'। ছোটবেলা থেকে আকাশ-মাঠ-নদীর প্রতি তাঁর অদ্ভুত টান। বড় হয়ে কী হবেন, তেমন প্রশ্নে দিশেহারা হতেন না। যোরহাটের উত্তর-পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্রের ধু ধু বালুচরে গরু চরাতে যেতেন মলোই। তাঁর কথায় : ''দেখতাম, খাদ্যে সন্ধানে গবাদি পশুরা কীভাবে চর থেকে চরে ঘুরে বেড়ায়। ওদের দেখে কষ্ট হত। একদিন ভাবলাম, পুরো বালিয়াড়ি

যদি ঢেকে দিতে পারি গাছের ছায়ায় কেমন হয়? এরপরই যখন যেখানে যা চারা বা বীজ পেয়েছি, বালিয়াড়িতে পুঁতে দিয়েছি। তিন দশক কেটে গেছে। একাই বালিদ্বীপকে সবুজ দ্বীপ বানাতে পেরেছি। এক জীবনে একটুকু করতে পেরে ধন্য আমি। ....না, আমি এর কোনও অধিকার পেতে চাই না। অরণ্য, বন সরকারের সম্পত্তি। আমি কেবল ভালবেসে দেখাশোনা করছি। কর্তাদের বলেছি, স্থায়ী নজরদারি চৌকি বসাতে। একা চোরাশিকাদিরে সঙ্গে তো লড়তে পারব না''।

যাদব বা মলোই-এর অভয়ারণ্য তিনশ হেক্টর জমি জুড়ে। প্রায় তিন দশক থেকে সপরিবারে তিনি আছে দ্বীপটিতে। হরিণ, বাঘ, হাতি, মোষ সবকিছু একসাথে পোষায় আপত্তি তুলেছিলেন গ্রামবাসী। মলোই তা গায়েও মাখেননি। পরে গ্রামবাসীর তাঁকে 'ত্যাজ্য' করেছেন। তেমন আহামরি সম্মানও জুটেনি মলোইয়ের। কাজিরাঙ্গাতে যা পাবেন, তার প্রায় সবকিছুই পাবেন 'মলোই কাঠোনিবাড়ি'তে। এখানে এখন প্রায় জাতীয় উদ্যানের পরিবেশ। হাতি, বাঘ, হরিণের পর এসে আশ্রয় নিয়েছে বুনো মোষেরাও। নেই কেবল গণ্ডার। তবে এ প্রাণীটি এখানে না এলেই মঙ্গল। কারণ, তখন সেখানে চোরাশিকারিদের আক্রমণ হবে। তবে যদি কোনও গণ্ডার অতিথি হিসেবে এসে পড়ে, যাদব তাকে ফেরাবেন কী করে? না, কাউকে তিনি ফেরাতে চান না।

হারিয়ে যেতে বসেছে ভারতের অনেক সাবেকি ধান। চিরতরে হারিয়ে গেছেও। প্রথম সবুজ বিপ্লবের ধাক্কায় ফলন বেড়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু ধান নিরুদ্দেশ হওয়ার পিছনে কাজ করেছে ওই বিপ্লবের মায়াবি যাদু। পরাধীন ভারতে প্রায় বিয়াল্লিশ হাজার ধানের প্রজাতি মাথা উঁচু করে মাঠে মাঠে হাওয়ায় দোল খেত। তবে সংখ্যাটি আনুমানিক। আরও একটু বেশিও হতে পারে। লম্বা-খাটো-শক্ত-দুবলা-রোমশ বা মসৃণ পাতাওয়ালা-সরু-মোটা-লাল-কালো-হলদে-সুগন্ধী বা গন্ধহীন — এরকম কত জাতের ধান যে এদেশের মাটিতে ফলত, এর সম্পূর্ণ হদিশ এখনও পাওয়া যায়নি। কী করে এতো বৈচিত্রে ভরে গেল দেশের কৃষিজগত সে সম্বন্ধে কৃষিবিজ্ঞানীরা জানান, 'ধানের এই বিপুল, বিস্তীর্ণ বৈচিত্র আপনা থেকে মানুষের কাছে ধরা দেয়নি। হাজার হাজর বছর ধরে এদেশের নাম-না জানা অগণিত কৃষক ধানের আদিম কোনও জাত থেকে পছন্দমতো নানা বৈশিষ্ট্য বাছাই করে নতুন নতুন অজস্র জাতের ধান সৃষ্টি করেছেন।' আর কী

মায়াবি নাম ছিল এসবের! সীতাশাল, রূপশাল, বাঁশকাঠি, কয়া, বকুলফুল, মধুমালতী, ঝিঙেশাল, কনকচূড়, বিন্নি, ভাসামাণিক, লক্ষ্মীচূড়া ইত্যাদি।

সেই হারিয়ে যাওয়া ধানদের আবার দেশের মাটিতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন কিছু ধানপ্রেমিক মানুষ ও নদিয়ার শান্তিপুর ব্লকেব 'ফুলিয়া কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে'র কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক অনুপম পাল। আজ থেকে দশ বছর আগে কাজ শুরু হয় তাঁর। অনুপমবাবু জানান, ''বাঁকুড়ার ব্রীহি বীজ বিনিময় কেন্দ্র থেকে প্রথম পাঁচটি প্রজাতির বীজ এনে ও পরে আসাম থেকে আটটি ও নাগাল্যান্ড থেকে সাতটি প্রজাতির বীজ এনে এখানে চাষ করা হয়। বর্তমানে এই কেন্দ্রে আটানব্বুইটি প্রজাতির বীজ সংরক্ষিত আছে। এর মধ্যে থেকে পঞ্চাশটি দেশি ধান রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। না, কোনও রাসায়নিক সার বা কীটনাশক ব্যবহার করা হয় না সেখানে। একেবারে প্রাকৃতিক উপায়ে কৃষিকাজে আমরা বিশ্বাসী। ফলন নিয়ে আমাদের কোনও চিন্তাই করতে হয় না। সবগুলি ধানের ফলন খুব ভাল। আর গুণের কথা আলাদা করে আর কী বলব! যেমন 'লালস্বর্ণ' চালের মতো চাল এখানে পাবেন। এর নাম 'কোমল'। এটি আনা হয়েছে আসাম থেকে। এই চালের এক বিশেষ গুণ হল, তিন থেকে চার ঘন্টা ঠান্ডা জলে ভিজিয়ে রাখলেই এর ভাত তৈরি হয়ে যাবে। আমাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বাইশ একর জায়গার মধ্যে তিন একর জায়গায় হারিয়ে যাওয়া ধানের চাষ হচ্ছে। সেখান থেকে খুব কম খরচে কৃষকদের কাছে চারা বিক্রি করি আমরা।''

সম্রাট সাজাহান তাজমহল তৈরি হওয়ার পর প্রধান কারিগর ঈশা খাঁ-র হাত কেটে নিলেন। কেন যাতে দ্বিতীয় আর একটি তাজমহল তৈরি করা হয় না কখনও। এ রকম মনের মানুষ নন অনিল গুপ্ত। তিনি আমেদাবাদে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টের অধ্যাপক। গ্রামেগঞ্জে যেসব ছোটখাটো কাজ ছড়িয়ে থাকে, সেসব তথ্য আদানপ্রদানের জন্য তৈরি করেন 'হানি বি' নেটওয়ার্ক। তাঁর কাছ থেকেই জানা গেল (ক) ফসলের ক্ষেতে পাম্প দিয়ে কীটনাশক স্প্রে করা হয়। প্রচলিত বড় পাম্পের দাম বেশি। তা ব্যবহার করা জন্য বেশি লোক দরকার। গুজরাটের কান্নাদিয়া তেরি করেছেন একটি ছোট পাম্প, যা ঘাড়ে ঝুলিয়ে ফসলের ক্ষেতে কীটনাশক স্প্রে করা যায়। একজন কৃষক একাই এ পাম্প ব্যবহার করতে পারেন। (খ) বাবলা জাতীয় এক

রকমের গাছ থেকে আঠা সংগ্রহ করে থাকেন গুজরাটের দরিদ্র মহিলারা। এ গাছ কন্টকাকীর্ণ। হাত কেটে যায়। খিমজিভাই বানিয়েছেন একটি ধাতব র‍্যাঁদা, যা একটি লাঠির আগায় লাগিয়ে দূর থেকেই আঠা সংগ্রহ করা যায়। (গ) বড় বড় নার্সারির জন্য মাটি যোগাড় করতে হয়। গুজরাটি মহিলারা ধীরে ধীরে প্লাস্টিক ব্যাগে এই মাটি ভরেন। খিমজিভাই প্লাস্টিক পাইপ ব্যবহার করে তৈরি করেছেন একটি যন্ত্র, যার সাহায্যে একবারেই সম্পূর্ণ ব্যাগটি ভরে ফেলা যায়। (ঘ) গ্রামে গ্রাম হাজার হাজার বছর ধরে জল তোলা হয়েছে কুয়ো থেকে। হাজার হাজার বছর ধরে কৌশলটি বদলায়নি। কপিকলের ওপর দিয়ে নামে দড়ি। সেই দড়ি থেকে ঝলবে বালতি। বালতি নামানো হবে কুয়োতে এবং ভরা বালতি টেনে তোলা হবে। হাত থেকে দড়ি পিছলে যাওয়া নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। বালতি বাঁচাতে গিয়ে কুয়োতে পড়ে গিয়ে প্রতি বছর কতজম মারা যাচ্ছেন তার কোনও হিসেব নেই এবং তাদের অধিকাংশই নারী।

অমৃতভাই উদ্ভাবন করেছেন একটি বিশেষ ধরনের কপিকল। তাতে লাগানো আছে এক বিশেষ ধরনের স্টপার। যার ফলে দড়িটা আর সহজে পিছলে যায় না। প্রাণহানি কমেছে। (ঙ) স্নান করার জন্য গরম জল চাই। বাথরুমে তাই বসানো থাকে গিজার। ঠাণ্ডা জলটা প্রবেশ করে ওপর থেকে। গরম জল পড়ে নিচ থেকে। বাঙ্গালুরুর শিবকুমার বানিয়েছেন এক নতুন গিজার, তাতে ঠাণ্ডা জল ঢোকে নিচে আর উষ্ণ জল প্রবাহিত হয় ওপর থেকে। বিদ্যুৎ খরচ কমে যায় পঁচিশ থেকে ত্রিশ শতাংশ।

দেশি-বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানির দাপটে আমাদের দেশের কৃষি আজ বিপন্ন, দীর্ণ। ঠিক এ সময়ে অরুণ-মলোই-অনুপমদের কাজকর্ম আমাদের ভরসা দেয়। সত্যিই যদি ফিরিয়ে আনা যায় বাংলার হারিয়ে যাওয়া ধানের প্রজাতিকে তাহলে তো দেশের মঙ্গল, জনগণের মঙ্গল। আমাদের দেশের মনীষীরা কবে বলে গেছেন দেশজ সম্পদকে সমাদর করতে, সম্মান জানাতে। রবীন্দ্রনাথের পল্লীভাবনায় বারবার গ্রামোন্নয়ন প্রাধান্য পেয়েছে। গান্ধীবাদী সমাজকর্মী হিমাংশুকুমার বলছন, ''প্রকৃত গণতান্ত্রিক দেশে নির্মাণে শহর ও গ্রামের মধ্যে সমবন্টন অত্যন্ত জরুরি। এটি না করা গেলে ক্ষমতাবান গোষ্ঠী বা দল দেশের সমস্ত সম্পত্তি এমনকি গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলিকেও কব্জা করে নেবে। তোমরা গ্রামে যাও, সেখানকার মানুষকে জান, গ্রাম গঠনে তাদের সঙ্গে বাস কর, এগুলি না করলে গণতন্ত্র গুণ্ডাতন্ত্রে পরিণত হবে।''

আমাদের আর পিছিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। একেবারে খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। একবার, তাঁদের কথা শুনেই দেখি না, আসুন।

****

-ঃ মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান ঃ-

জানি, চারিদিকে নিকষ অন্ধকার। কিন্তু সেই অন্ধকারে চুপ করে বসে থাকবো কেন? অন্ধকার কাটাতে কাউকে না কাউকে তো প্রদীপ জ্বালাতেই হবে। যাতে অন্যরা আলো দেখতে পায় ।

কে, উন্নিকৃষ ণ।

ওড়িশার কোরাপুট পাহাড়তলির গ্রাম পুটাশিল। সেখানকার ফুলোমণি জানি বলেন : ''আগে আমরা শুধু চাষ করতাম। এখন আমাদের গ্রামে একটি চালকল ও একটি ময়দাকল চলছে। আমাদের রোজগার বেড়েছে। আগে সূর্য ডুবলেই গ্রামে অন্ধকার নেমে আসত। এখন রাত দশটা পর্যন্ত ঝলমল করে আলো। ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে আলোর নিচে। মায়েরা হাতের কাজ করে রোজগার করছে। বিদ্যুৎ আমাদের জীবনটাই বদলে দিয়েছে''। কি করে হল এসব?

নব্বইটি কন্ধ পরিবারের বাস ওই গ্রামে। গ্রামবাসীদের শ্রম ও সরকারের টাকায় বেসরকারি সংস্থাটি একটি বিদ্যুৎ ঘর তৈরি করে। খরচ পড়ে আঠারো লক্ষ টাকা। ১৯৯৯ সালের জানুয়ারী মাসে এই বিদ্যুৎঘর তৈরির কাজ শুরু হয়। শেষ হয় আট মাসের মধ্যে। পাহাড়ি ঝর্ণার জলকে চেক ড্যামে বেঁধে তা দিয়ে টারবাইন ঘুরিয়ে তৈরি বিদ্যুতে ঝলমল করছে এখন পুটাশিল গ্রাম। ভোর তিনটে থেকে ছয়টা ও সন্ধ্যে পাঁচটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত বিদ্যুৎ পান পুটাশিলের কন্ধ আদিবাসীরা। ইঞ্জিনিয়ার বেণুধর সুতারো জানান : ''দুই গ্রামবাসীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে টারবাইন চালানোর। তাদের

প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে পণ্ডিচেরীতে। তারা ছোটখাট মেরামতও করতে পারেন। এই দু'জনকে মাইনে দেওয়া হচ্ছে চার হাজার টাকা করে। এছাড়া টারবাইন দেখভালের জন্য একুশ সদস্যের একটি কমিটি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে ছয়জন মহিলা আছেন। বিদ্যুৎ ব্যবহারের খরচ বাবদ প্রতিটি পরিবার মাসে বিশ টাকা করে দেয়''। গ্রামে বিদ্যুৎ আসায় বেজায় খুশি গ্রামবাসী। তাদেরই একজন ফুলোমণি জানি।

''ফিরে চল মাটির টানে/যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে'', বলতেন রবীন্দ্রনাথ। কবির ছিল এক গভীর আক্ষেপ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের গ্রামমুখী সভ্যতাকে ভেঙ্গে যে নতুন সভ্যতার উদ্ভব ঘটিয়েছিল, তা কবি মেনে নিতে পারেননি। তাঁর সমস্ত চিন্তাধারার কেন্দ্রে ছিল গ্রাম-বাংলার প্রতি তাঁর অশেষ ভালবাসা। আজ দেশের অধিকাংশ গ্রামজুড়ে শুধু বঞ্চনা আর হাহাকারের ছবি। তবু এরমধ্যে কিছু মানুষ অন্য রকম ভাবেন ও কাজ করেন। তাদের চলার পথ মসৃণ হোক।

স্বাগত 'গণতান্ত্রিক' ভারতবর্ষ

প্রেরণা রায় সেনগুপ্ত

কমনওয়েলথ গেমসের পর, কিরন বেদির(নাকি ক্রেন বেদি!) গরিবীর চিহ্ন বস্তি হঠাও অভিযানের পর ২০১২'র ঝাঁ চকচকে দিল্লি। অটোমেটিক দরজাওয়ালা কর্পোরেট বাসই সরকারি বাস পরিষেবা, দিল্লির বুক চিরে, এমনকি লাগোয়া হরিয়ানার গুরগাঁও ও উত্তরপ্রদেশের নয়ডা-গ্রেটার নয়ডা অবধি পৌঁছে গেছে মেট্রোরেল, ৩০ সেকেন্ড পরিষেবা বাতানুকূল সবকটি রেকের, সত্যিই ইন্ডিয়া সাইনিং। ইন্ডিয়া গেটের ঝলমলে উৎসব মেজাজে, ১২ মাস - ২৪ ঘন্টা। শহরের মধ্যে ৩টি বিশ্বদ্যিালয়, দেশের সেরা ৭টির মধ্যে গর্বিত আসনে, এশিয়ার ৫০ ও বিশ্বের ৮০টির মধ্যেও যারা উজ্জ্বল।

কি ভাবছেন? আনন্দিত হচ্ছেন দেশের এই ছবি দেখে? দেশ না হোক অন্তত দেশের রাজধানীর চেহারাটিকে দেখে? আরে দাড়ান দাদা - দিদিরা, এতো হচ্ছে ঐ কারুর কথায় — ''ঘোড়ায় চড়ে বাগান দেখা।'' আসুন, ঘোড়া থেকে নেমে বাগানটা দেখি, দেখি কতটা সাজানো এই চেহারা। আসুন, ঐ সাজানোর বাধা ভেঙে দেখি বাস্তবটা কিরকম। (দয়া করে দেখে চমকে যাবেন না, শক্ত হোন।)

দৃশ্য ১ — দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় (ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের মতে) স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় সেমিস্টার পরীক্ষার ফলাফল, কলা বিভাগ, প্রতি বিভাগে ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ৬০-৭০ (যেখানে মোট ছাত্রছাত্রী ১৫০ মতো)। এই পুরোপুরি ফেল করা বা কোনো না কোনো পত্রে ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীদের (যাদের ফেল করা পেপারটি পরের বার আবার দিতে হবে) মধ্যে প্রত্যেকে হয় দলিত, নয় আদিবাসী নয় সংখ্যালঘু, না, একজনও উচ্চবর্ণ পুরোপুরি বা কোনো একটি পত্রে ফেল করে নি। উচ্চবর্ণ বাদে অন্যরা কি এতটাই অযোগ্য? ঠিক বিশ্বাস করা যায় না, কারণ সেটা হলে দেশের ১নং বিশ্ববিদ্যালয়ে এরা এলো কিভাবে? হ্যাঁ সন্দেহটা আরো ঘনীভূত হয় যখন জানা যায় যে, এই ঘটনা হঠাৎ এই বছরই ঘটেছে এমন নয়, এটা একটা চলমান ধারাবাহিকতা, আরো শুনবেন? এই দেশের ১ নং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের মধ্যে মাত্র ৩জন দলিত ও ২ জন সংখ্যালঘু, আদিবাসী কেউ

নেই। ২জন সংখ্যালঘুর মধ্যে ১ জন খুবই পরিচিত, কাশ্মিরের মুক্তি ও সংগ্রামের সোচ্চার সমর্থক এস-আর গিলানী, যার আবার মিথ্যা মামালায় জেল খাটাও হয়ে গেছে। সেই এক প্রশ্ন, কেন যোগ্যতা নেই? নাকি যোগ্যতার পরীক্ষায় সচেতনভাবে আটকে দেয় মনুর আইন? বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংগঠনের সাথে যুক্ত এক অধ্যাপকের মতে (ইনিও উচ্চবর্ণ, তবে উচ্চবর্ণের দৃষ্টিতে আমারই মতো দলত্যাগী) দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে-এর সাথে খুব সামঞ্জস্যপূর্ণ, এই সিলেবাসে পড়লে নেট পাশ করার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। তাই যাতে নেট-এ দলিত-আদিবাসী-সংখ্যালঘুরা বসতে না পারে, বারবার খারাপ রেজাল্টের ফলে কোর্স শেষ করার আগেই হতাশ হয়ে পড়াশুনা ছেড়ে চাকরির ধান্দায় ঘুরতে থাকে। ভর্তির ৪ বছরের মধ্য কোর্স শেষ করার নিয়ম এখানে আছে তাতে আটকে যায় তাই বর্ণবাদী পরীক্ষকরা এইভাবে ফেল করাতে থাকেন। জানি হয়তো বিশ্বাস করতে অসুবিধা হচ্ছে, কিন্তু, এটাই বাস্তবতা, তবে চমকে ওঠার এখনো শেষ হয়নি। দাঁড়ান, হরিয়ানার হিসার থেকে মেথর সম্প্রদায়ের এক ছেলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসে। তাকে অধ্যাপক-অধ্যাপিকারাও 'পড়ে কি হবে, বাবার কাজই কর' বলে সরাসরি উপদেশ দিয়ে গেছেন বছরের পর বছর। তার বাবা সত্যিই বংশানুক্রমিক মল-মূত্র সাফ করার পেশায় যুক্ত, অনেক কষ্টে ছেলেকে পড়াতে পাঠিয়েছিলেন দিল্লি, যাতে ছেলেকে তার পূর্বপুরুষের মতো ঐ পেশায় না আসতে হয় (পেশাটি যে কতটা অমানবিক তা আমীর খানের 'সত্যমেব জয়তে' অনুষ্ঠানেই বোঝা গেছে)। যাই হোক শুধু উপদেশ নয়, যখন ছেলেটি স্নাতকোত্তর স্তরে পৌঁছল তখন তাকেও ফেল করানোর সম্মুখীন হতে হয়। তবে ততদিনে সে ছাত্রসংসদের নেতা, সে বুঝে গেছিল কিভাবে এই অমানবিক জীবনযাপন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, সে বুঝে গেছিল এই অমানবিক ব্যবস্থাকে শেষ করতে হবে। সে সমস্ত গরীব, দলিত, সংখ্যালঘু, আদিবাসী ছাত্র -ছাত্রীদের যে কোনো সমস্যায় পাশে দাঁড়ানো বন্ধু-দাদা। সেই সব ছাত্র-ছাত্রীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে, কারণ তারা জানত তাদের দাদা-বন্ধু ফেল করতে পারে না, ছাত্র-ছাত্রীদের চাপেই রিভিউতে বিশাল নম্বর বেড়ে গিয়ে সে পাশ করে। আজ সে এম.ফিল করছে। কিন্তু .....। হ্যাঁ এখানেও কিন্তু, তার এম. ফিল ক্লাসের সব উচ্চবর্ণের সহপাঠীরা যেখানে ক্লাশ শুরু হওয়ার ১ মাসের মধ্যে স্টাইপেণ্ড পেয়ে গেছে, সে পায়নি ৪ মাস পরেও। কারণ? অজানা (নাকি জানা)। দেশের ১ নং বিশ্ববিদ্যালয়ের মতাদর্শ আজও হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদ, আসলে ফ্যাসিবাদ। যাইহোক, এই ফেল করিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত করার মনুর শাসন যে কতটা সফল তার প্রমাণ স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাসগুলি। যেখানে প্রথম বর্ষে ১৭০-১৮০ জন ছাত্রছাত্রী শুরু করে, দ্বিতীয় বর্ষে

সেটা হয়ে দাঁড়ায় ৯০-১০০। দলিত-আদিবাসী-সংখ্যালঘুদের দেশ এটা কোনদিনই ছিল না। বিগত কয়েকটা বছরে ভারত রাষ্ট্র সরাসরি সামরিক যুদ্ধ ঘোষণা করেছে দলিত-আদিবাসী-সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ছবি আমি তুলে ধরলাম তাতে সেই যুদ্ধেরই মনস্তাত্ত্বিক দিকটা আপনারা দেখলেন। আর মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ চলছে দিল্লির মতো বড় শহরগুলিতে। এটা জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

দৃশ্য ২ — জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লির আরেকটি নামী বিশ্ববিদ্যালয়। দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ। ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে আয়োজিত মে দিবসের অনুষ্ঠানের শুরু হয় গণপতিমন্ত্র দিয়ে। মে দিবসের সাথে গণেশের কি যোগাযোগ তা হে মাকেটও জানে না নিশ্চিতভাবেই, কিন্তু , ছাত্র সংগঠনের নিয়ন্ত্রণে থাকা ছাত্র সংসদের অনুষ্ঠান বোধহয় বুঝিয়ে দেয় ডান-বাম-রাম সব মুলধারার দলগুলির মধ্যেই ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ-আর.এস.এস.। যাই হোক এই ঘটনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্র -ছাত্রীরা বেশ কিছুটা চমকে যান, তবে চমকের আরো কিছু বাকি ছিল। অনুষ্ঠান চলতে চলতেই মঞ্চে হঠাৎ গান শুরু হয় ''সন্ত্রাসবাদ নিপাত যাক। এই গানটির মধ্যে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বহু প্রাচরিত 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'র গুণ গাওয়া হয়, যা আসলে ইসলাম দুনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ, এক সচেতন মুসলমান বিদ্বেষ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত নানা গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিরা এটা মেনে নিতে পারেন নি, তারা প্রতিবাদ জানান। এরপরই অনুষ্ঠানের আয়োজক ছাত্রনেতারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নিরাপত্তারক্ষীদের সাথে ঐ প্রতিবাদী ছাত্র-ছাত্রীদের অনুষ্ঠান থেকে বের করে দিতে চেষ্টা করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নির্দেশ জারি করে যে বিশ্ববিদ্যালয় হোস্টেলে বা ক্যাম্পাসে কোথাও গরু ও শুয়োরের মাংস খাওয়া যাবে না। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংগঠন এর প্রতিবাদ জানায়। তারা ছাত্র সংসদের সাধারণ সভা ডেকে ছাত্র সংসদের তরফ থেকেই আন্দোলনে নামতে চান। কিন্তু, ব্রাহ্মণ্যবাদী ছাত্র সংসদে ক্ষমতাসীন সংগঠন সাধারণ সভায় দাবি করে যে, কর্তৃপক্ষের এই নির্দেশিকা আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক। মুসলমানরা শুয়োর খান না, গরু খান, আর হিন্দুরা গরু খান না, শুয়োর খেতে তাদের ধর্মে নিষেধ নেই। তাই গরু ও শুয়োর দুটোই খাওয়া নিষিদ্ধ করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রক্ষা করা হল। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে আসলে হিন্দুরা আমিষ বলতে বর্তমানে ডিম, মাছ, মুরগি, পাঁঠা খেয়ে থাকেন। শুয়োর প্রায় খান না বললেই চলে। কিন্তু, মুসলমানরা গরুটা প্রায় সবাই খান। তাহলে খাদ্যাভ্যাসে হস্তক্ষেপটা প্রকৃত অর্থে কাদের ওপর হলো?

আরো একটা ব্যাপার, আদিবাসীরা কিন্তু গরু-শুয়োর দুই-ই খেয়ে থাকেন। ফলে ঐ নির্দেশিকা আদিবাসী-সংখ্যালঘুর স্বাভাবিক খাদ্যাভ্যাসেই হস্তক্ষেপ। নরম ব্রাহ্মণ্যবাদ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতার মহান নিদর্শন।

দৃশ্য ৩ — জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রই নিহত হল (বলা ভাল খুন হল) ভারত রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর হাতে - ইন্ডিয়ান মুজাহিদীন নামক জঙ্গিগোষ্ঠীর সদস্য অজুহাতে। যে ঘটনা 'বাটলা হাউস এনকাউন্টার' নামে খ্যাত। পরে প্রমাণিত হয় এই এনকাউন্টার ছিল ভুয়ো। ঐ ছাত্ররা শুধু ছাত্রই ছিল, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন নয়।

এতো গেল সরাসরি আক্রমণের কথা,আসুন এবার ঢুকে পড়ি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরমহলে। মোট ১১টি বিভাগে পড়াশুনা করানো হয় স্নাতকোত্তর স্তর অবধি। প্রতি বিভাগের প্রতি ক্লাসে ৪০টি করে আসন। মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ৩২টি। মজার কথা হল কোনো বছরের কোনো ক্লাসে এই কোটা পূর্ণ হয় না, ব্যাকলগ লেগেই থাকে। আবার সেই অপ্রিয় বর্ণমালা,কেন? দিল্লি-উত্তরপ্রদেশে মুসলমান জনগণ যথেষ্টই। দেশের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেখানে আবার তাদের জন্য ৮- শতাংশ সংরক্ষণ সেখানে সারা দেশ থেকেই মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের আসাটাই স্বাভাবিক ছিল। তাও ব্যাকলগ কেন? তাহলে বছরে ৩২x১১ = ৩৫২ জন মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীর ক্ষমতা নেই দিল্লিতে এসে পড়াশুনা করার (হায় সাচার কমিটি!) নাকি তারা অযোগ্য? সংরক্ষণ দরকারের চেয়ে বেশি হয়ে গেছে? যে কেউ স্বাভাবিক বুদ্ধিতেই বুঝবেন শেষ দুটি কারণ অবান্তর। (হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী ফ্যাসিস্ট না হলে) যদি কারণ প্রথমটি হয় তাহলে এটা লজ্জা ছাড়া কিছু নয় (কার লজ্জা, এতো উচ্চবর্ণের হিন্দুর দেশ)। এ ছাড়াও আছে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই ব্যাপার, ওখানে বর্ণবাদ, এখানে সাম্প্রদায়িকতা। এটা কোনো দুর্নীতির বিষয় নয়, এটাই ভারত রাষ্ট্রের নীতি. ছলে-বলে-কৌশলে শিক্ষা-চাকরি-প্রশাসন থেকে দূরে রেখে শোষণ করো। বর্তমান অবস্থার সাথে মাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য জনগণের সামনে ঝোলানো হয় খুড়োর কল, কখনো বিভীষণ-মীরজাফরের দল কিছু, হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দালাল দলিত-আদিবাসী-সংখ্যালঘুর মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী মায় রাষ্ট্রপতিও , আবার কখনো কখনো সুপ্রিম কোর্টে গৃহীত হয়ে যায় মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট, তৈরি হয় জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়(.....চলতে থাকে, দুর্নীতি নয় হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী রাষ্ট্রের নীতি)।

গো বলয়ে দাপিয়ে বেড়ানো বাহুবলি, ভূমি সেনা, রণবীর সেনা, সানলাইট সেনা, সাবর্ণ লিবারেশান ফ্রন্ট সবই হল সামরিক বাহিনী হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদীদের, যারা দরিদ্র

দলিত -আদিবাসী-সংখ্যালঘু গ্রামীন জনগণকে শোষণ করার হাতিয়ার উচ্চবর্ণের জমিদার জোতদারদের জন্য। অনেক ক্ষেত্রে আবার সামান্য পয়সার লোভ দেখিয়ে এই দলিত-আদিবাসী -সংখ্যালঘু জনগণের থেকেই তৈরি করা হচ্ছে এই সশস্ত্র বাহিনী, এবং লড়ানো হচ্ছে তাদের নিজেদের ভাইবোনদের বিরুদ্ধেই। রণবীর সেনারা তবু সরকারীভাবে স্বীকৃত নয় (যদিও এদের অত্যাচারকে রোখবার কোনা ব্যবস্থাই নেয়না সরকার থেকে পুলিশ-প্রশাসন। উল্টে যারা লড়ে এদের বিরুদ্ধে শোষিত জনগণকে সঙ্গে নিয়ে তাদেরই পেছনে পড়ে যায়)। কিন্তু এই তুলনায় নতুন বাহিনী আবার তৈরি করে পুলিশ-প্রশাসনই। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ ছত্তিশগড়ে সালওয়াজুডুম-এস.পি.ও.। যদিও বিশাল আন্দোলনের চাপে সুপ্রিম কোর্টে সালওয়া জুডুমকে অসাংবিধানিক আখ্যা দেয়, তবু প্রকাশ্য ঘোষণা না করেও আজও চলছে তা। কিন্তু ঐ অঞ্চলের মাটির তলায় থাকা মূল্যবান ঘনিজ যে বিদেশী প্রভুদের হাতে তুলে দিতে চুক্তিবদ্ধ ভারত রাষ্ট্র এবং তা স্থানীয় আদিবাসীদের বঞ্চিত করেই। তাদের বাড়ি, চাষের জমি, জঙ্গল, তাদের নিজেদের উদ্যোগে গড়ে তোলা নিজেদের উন্নয়ন প্রকল্পকে ভেঙে দিয়ে উচ্ছেদ করতে হবে তাই। আধাসামরিক বাহিনী-সেনাবাহিনীও হাজির, হাজির প্রভুদের দেশে প্রশিক্ষণ নেওয়া বিশেষ বিশেষ বাহিনী। চলছে অপারেশন গ্রীন হান্ট, দলিত-আদিবাসী-সংখ্যালঘু জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত রাষ্ট্রের যুদ্ধের চূড়ান্ত রূপ।

হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত রাষ্ট্রের সরকারী সামরিক শক্তি বহুদিনই ঝাঁপিয়ে পড়েছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ও কাশ্মিরে। কারণ ওখানকার জনগণ মানতে চায়নি মনুবাদের আধিপত্য। সামরিক শাসনেই তারা লড়ে চলেছে। এখানে সামরিক অভিযানের অজুহাত বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গি গোষ্ঠী, কোথাও আলফা, কোথাও প্রিপাক, কোথাও পিএলএ, কোথাও মুইডা, কোথাও লস্কর এ তৈবা তো কোথাও জৈশএ মহম্মদ। আর সর্বত্র থাকবেই থাকবে চীন ও পাকিস্তানের আই.এস.আই। সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও কাশ্মীরে জারি আছে সশস্ত্র বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন, যা এক ফ্যাসিস্ট আইন। সারা দেশের জন্য চালু হয়েছে বেআইনি কার্যকলাপ নিরোধক আইন, ছত্তিশগড়ে চালু আছে ছত্তিশগড় বিশেষ ক্ষমতা আইন, সবগুলিই এক একটি ফ্যাসিস্ট আইন। সংবিধানে দেওয়া যৎসামান্য মৌখিক অধিকারও যাতে খর্বিত। এইসব আইনে বন্দী বা অভিযুক্ত কারা দেখুন, সিংহভাগ দলিত-আদিবাসী-সংখ্যালঘু। অভিযুক্ত কিছু উচ্চবর্ণের হিন্দুও, তারা ঐ দলিত-আদিবাসী-সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এই যুদ্ধে ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসনের পক্ষে দাঁড়াননি। তাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক বিনায়ক সেন, বুকার পুরষ্কার বিজয়ী অরুন্ধুতী রায়, মানবাধিকার আন্দোলনের কর্মী ও অ্যামনেস্টি

ইন্টারন্যাশনালের থেকে প্রশংশিত সীমা আজাদ বহু রাজনীতিবিদের থেকে বেশি শিক্ষিত ও ডিগ্রি থাকা নেতা কোবাড গান্ধী আছেন। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গিলানী, কেরালা হাইকোর্টের আইনজীবী শানওয়াজ খান বা আইরম শর্মিলার কথা না হয় বাদ রাখলাম। কারণ তারাও খ্যাতনামা হলেও তো ঐ দলিত-সংখ্যালঘু-আদিবাসীদের মধ্যেই পড়েন। তাই তাদের তো ভবিতব্যই এটা। বাদ রাখলাম মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত পত্রিকা বিদ্রোহী'র সম্পাদক সুধীর ধাওয়ালের নামও।

এটা যুদ্ধ পরিস্থিতি। কেউ চাক বা না চাক,, এই যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ছোটো ছোটো চাওয়া পাওয়া, ছোটো ছোটো আনন্দের পথেও আজ বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদ। এই শাসনে নিজের উৎসবের দিনেও বাড়ি থেকে হাজার মাইল দূরে থেকে সামান্য আনন্দ করার জন্য গরু বা শুয়োর খেতে পারবেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে। গরু বা শুয়োর দূরে থাক, আমিষই খেতে পারবেন না দুর্গাপূজোর দিনগুলিতে বাঙালিরা তাদের ভাড়া বাড়িতে বাড়িওয়ালার আপত্তিতে, কারণ তাদের নাকি প্রথা এটা। যে মতাদর্শ (হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদকে আমি কোনো ধর্ম বলে মনে করিনা) যারা জন্মগতভাবে একই মতাদর্শের মধ্যে আছে (তারা সেটা মানুক বা না মানুক) তাদের প্রথার প্রতিও সহিষ্ণুতা দেখায় না তো অন্য ধর্মের প্রতি কি দেখাবে? ইচ্ছেমত, পছন্দমত প্রেম করা স্বাধীনতা, রাস্তায় একা ঘুরতে বা কাজে বেরনোর স্বাধীনতাতেও হস্তক্ষেপ করে খাপ পঞ্চায়েত, সংসদে সম্মান রক্ষার্থে হত্যাও খাপ পঞ্চায়েতের বৈধতা দাবী করেন সাংসদ। সেই সব কিছুতেই অনুমতি দেয় হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদ। তাই পথ নেই এই যুদ্ধ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার। বিশেষ করে মহিলাদের ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে। কারণ

দুর্গাপূজোর অন্তরালে

সমুদ্র বিশ্বাস

বর্তমানে বৃহৎ বাংলা এক মিশ্র সংস্কৃতির দেশ। বিভেদের মাঝে দেখ মিলন মহান। পুজো-পার্বণ প্রিয় কৃষিজীবী তথাকথিত হিন্দু বাঙালীর অতি জনপ্রিয় উৎসবের নাম দুর্গাপুজো। বিশেষ করে শরৎকালীন বা শারদীয় দুর্গাপুজো। দুর্গা কর্তৃক সুরা নারীতে আসক্ত নয় অ্যাসিরিও সভ্যতার উত্তরসূরী অসুর সম্রাট মহিষাসুর কে হত্যা করার দৃশ্য পুজো করার নামই দুর্গাপুজো। বেদ-পুরাণ ও নানারকম ধর্মীয় আঞ্চলিক কাব্য-কাহিনি পড়লে অনুসন্ধিৎসু মনে দুর্গা সম্পর্কে এ বিষয়ে অনেকগুলি প্রশ্ন জাগে। যেমন দুর্গা আদিতে কী ছিলেন? নারী ছিলেন? নাকি পুরুষ ছিলেন? কেনই বা তিনি মদ ও মাংস প্রিয়া ছিলেন? তিনি কি সতী (যে নারী স্বামী-সন্তান ও নিকট আত্মীয়দের মঙ্গল কামনায় নিজেকে ব্যস্ত রাখেন) নারী? নাকি নৃত্য পটিয়সী ছলনাময়ী নারী? দুর্গা কি সত্যি সম্মুখ সমরে মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন? নাকি তথাকথিত স্বর্গের উর্বসীদের মত শারীরিক ছলা-কলার মোহজালে বেঁধে অসহায় অবস্থায় মহিষাসুরকে খুন করেছিলেন? দুর্গা ও সবস্বতীর মধ্যে বয়সে দুর্গা বড় না সরস্বতী বড়? গণেশ কার্তিক দুর্গার সন্তান? নাকি স্বামী? দুর্গাপুজোয় বেশ্যা বাড়ির মাটি লাগে কেন? কার্তিক-গণেশ কি চোর ডাকাতদের দেবতা ছিলেন? রামচন্দ্র কি লঙ্কার রাজা রাবণকে হত্যা করার জন্য সত্যি সত্যি দুর্গাপুজো করেছিলেন? নাকি মধ্যযুগের কল্পনাবিলাসী কবি কৃত্তিবাসের নব সংযোজন, মন গড়া কাহিনি?

হিন্দু ব্রাহ্মণ্য পুরাণগুলিকে ভিত্তি করে হিন্দুরা (সিন্ধু নদের উভয় পার্শ্বে বাসবাসকারি মানুষজন, যারা বর্তমানে বৃহৎ ভারতে বসবাস করেন) ব্রাহ্মণ্য দেব দেবীর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা করেন, তাই যুক্তি বিজ্ঞান ও কাহিনির পরম্পরা অনুসারে বেদ, পুরাণ ও অন্যান্য সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য বা এক কথায় হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্র এ ব্যাপারে কী বলে স্বল্প পরিসরে একটু দেখে নেওয়া যাক। হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মের গঠনগত ও দর্শনগত অনেক ফারাক রয়েছে। মূলত প্রতিটি ধর্মই আলাদা মত ও পথের কথা বলে। কিছু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তাঁদের পাণ্ডিত্য ফলিয়ে সহজ সরল জীবনযাপন করার অজুহাতে

নীতিগত কর্তব্যগুলোকে এমন জটিল রূপ দিয়েছেন যে মানুষের জীবন বিষময় হয়ে উঠেছে। সাম্যবাদী কিছু মানুষের সহজাত সরল মতাদর্শ কর্মবিমুখ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের রূপ দিয়ে মানুষের জীবন বিপন্ন করে তুলেছেন। প্রতিটি ধর্মই শেষ পর্যন্ত কর্মবিমুখ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করে। তবু বৌদ্ধধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম বা ইসলাম ধর্মের মত স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য প্রচলিত হিন্দুধর্মে বা ব্রাহ্মণ্যধর্মে নেই। একটু খুলে বললে এরকম দাঁড়ায় — সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে একটি ধর্মগ্রন্থ থাকে। ধর্মগ্রন্থের একজন লেখক থাকেন। একজন আরাধ্য দেবতা বা ঈশ্বর বা অবতার থকেন। সেই ঈশ্বরের কিছু অন্ধ ভক্ত থাকেন। হিন্দুব্রাহ্মণ্য ধর্মে একক কোন ঈশ্বর নেই। নেই কোন নির্দিষ্ট ধর্মগ্রন্থ।

প্রতিটি মতাদর্শে একটি সার্বজনীন বার্তা থাকে। গৌতম বুদ্ধের মতাদর্শ মূলত যুক্তি ও প্রচলিত সমাজ-বিজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্মের পণ্ডিতেরা বৌদ্ধ ধর্মকে হীনযান ও মহাযানে ভাগ করলেন শুধু নয়, পাপ-পুণ্য-জন্মান্তর ঢুকিয়ে দিলেন। যিশু তাঁর অনুগামীদের ক্ষমা ও ভালবাসার কথা বললেন, অথচ যিশুর মতাদর্শকে সামনে রেখে শুরু হল কয়েকজন রাষ্ট্রপ্রধানের ধর্মযুদ্ধ। নিহত হল কয়েক লক্ষ মানুষ। খ্রিষ্টানধর্ম পারিবারিক ও বংশমর্যাদায় বিভক্ত হয়ে পড়ল। যিশুর মতাদর্শেরই সঙ্গে জুড়ে গেল কয়েকশত বাস্তব ভিত্তিহীন কুসংস্কার ও অলীক উপকাহিনি। হজরত মহম্মদ শান্তি ও সম্মানের বার্তাবাহক। তাঁর মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামও করলেন। হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর অদ্যাবধি ইসলামের তথা কোরান হাদিসের দোহাই দিয়ে গরীব মানুষকে নির্যাতন ও হত্যা করা হয়েছে অগণিত। কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সমষ্টির মতাদর্শ যখন কর্মবিমুখ পণ্ডিত ও শাসকেরা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের রূপ দেন তখনই সাধারণ মানুষ অমানবিক অনুশাসনের শিকার হন। একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মে নানা দেবতা থাকার ফলে তাদের রয়েছে নানান মতবাদ। একজনের সঙ্গে অন্যজনের কোনরকম বনিবনা নেই। কায়েমী স্বার্থবাহী প্রথাই হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভিত্তি। ধর্মীয় সংস্কার হেতু কোটি কোটি মানুষ হিন্দুব্রাহ্মণ্য ধর্মের যাঁতাকলে ঘৃণা ও অবজ্ঞা নিয়ে জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন।

হিন্দুব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে ঋগ্বেদ সর্বপ্রাচীন বলে পরিচিত। ঋগ্বেদের কোথাও দুর্গা নামটি পাওয়া যায় না। তবে ঋগ্বেদের দশম মন্ডলের ১২৫তম সূক্তকে ''দেবী সূক্ত'' বলা হয়। কিন্তু এর আটটি মন্ত্রের মধ্যে কোথাও দুর্গার নাম পাওয়া যায় না। ১২৭তম সূক্তটি ''রাত্রিসূক্ত'' নামে পরিচিত। এখানে রাত্রিদেবীর রূপ বর্ণিত আছে। বৈদিক রাত্রির দেবী কৃষ্ণবর্ণা। যিনি পরবর্তীকালে প্রাচীন দেশজ দেবী কালির সঙ্গে অভেদ

হিসাবে গৃহীত হয়ে ''কালী'' নামে আজও পুজিত হয়ে থাকেন। দেবী কালীর রূপ ও কাহিনিও অগণিত। ভৌগলিক অবস্থান এবং মানুষজনের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেব-দেবী সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা ভিন্নরূপে গড়ে উঠেছে। কল্পিত কোন দেব-দেবীর কিছু চিহ্ন বা দেওয়াল চিত্র থাকলেও গোটা বৈদিক যুগে দুর্গার এ ধরনের কোন চিহ্ন বা চিত্র বা মূর্তি ছিল না। তাই বলা যায়, দূর্গা প্রাচীন দেব-দেবীর মধ্যে পড়েন না।

ঋগ্বেদের অনেক পরের ঘটনা ও লেখা যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যকেরই নারায়ণ উপনিষদে দেবী দুর্গার নাম প্রথম পাওয়া যায়—"তামগ্নিবর্ণাং তপসা জলন্তীং/ধেরচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্/দুর্গাং দেবীং শরণ মহং প্রপদ্যে/সুতরসি ততরসে নমঃ''। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত যাজ্ঞিকা উপনিষদের 'দুর্গা গায়ত্রী'তে বলা হয়েছে, ''কাত্যায়নায় বিমহে, কন্যকুমারী ধীমহে, তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়েৎ''। অর্থাৎ আমরা কাত্যায়নীকে স্মরণ করি, কন্যাকুমারীর ধ্যান করি, দুর্গি আমাদের সমৃদ্ধি বিধান করুন। এখানে দুর্গি শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গাত্মক নয়, পুরুষ লিঙ্গাত্মক। এক্ষেত্রে দুর্গা নারী নয়, পুরুষ। যদিও সায়ানাচার্যের মতে, 'দূর্গা গায়ত্রী' তে উল্লিখিত দুর্গি শব্দটি দুর্গা শব্দের সমার্থক। তথাপি, 'দুর্গা গায়ত্রী'র দুর্গি বা দুর্গা পুরুষ ছিলেন, নাকি নারী ছিলেন, এ নিয়ে মতবিরোধ রয়ে গেল। ঋগ্বেদে দুর্গার নাম নেই, কিন্তু সরস্বতীর নাম আছে। যেহেতু ঋগ্বেদকে সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ ধরা হয়, সেহেতু ঋগ্বেদ অনুযায়ী দুর্গা, সরস্বতীর চেয়ে অনেক ছোট। আবার ঋগ্বেদের অনেক পরে লেখা শৌনকের 'বৃহদ্দেবতা' গ্রন্থে দুর্গা, অদিতি বাক, সরস্বতী প্রভৃতি একই দেবীর ভিন্ন ভিন্ন নাম। কাজেকাজেই 'বৃহদ্দেবতা' অনুযায়ী দুর্গা ও সরস্বতী অভিন্ন। অর্থাৎ, যেই দুর্গা সেই সরস্বতী। দুর্গা ও কালীকে এক করার প্রচেষ্টাও চলেছে বহুযুগ ধরে। ঋগ্বেদের রাত্রিসূক্তকে রাত্রিদেবী, বৈদিক রাত্রিদেবীকে বৈদিক পূর্ববর্তী দেবী কালীর সঙ্গে এক করে দেওয়া হয়েছে। ঠিক একইভাবে প্রাচীন সরস্বতী দেবীর সঙ্গে খ্রিষ্ট পরবর্তী দেবী দুর্গাকে অভিন্ন রূপে প্রচার করা হয়েছে। নানা পণ্ডিত নানাভাবে দেবী দুর্গার জীবনকাল খ্রিষ্টপূর্বাব্দ করার প্রচেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই দুর্গাকে সর্বপ্রাচীন দেবী বা মানবী রূপে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। কারণ প্রাচীন পুঁথিতে দুর্গার নাম পাওয়া যায় না। বরং দুর্গাকে কেন্দ্র করে যেসব কাহিনি আছে সেগুলি বিশ্লেষণের পাশাপাশি দুর্গার মূর্তি, পোষাক ও অলংকার দেখলে অতি সহজে দুর্গার জীবনকাল ধরা যায়।

বৈদিক সাহিত্যে পৃথিবীর আর এক নাম অম্বিকা। এই অম্বিকা রুদ্রের সাথে সম্পর্কিতা ছিলেন। কোথাও ভগিনীরূপে, আবার কোথাও স্ত্রী বা পত্নীরূপে। শুক্ল যজুর্বেদের

রাজসনেয়ী সংহিতায় (1/8, 6/11) এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে অম্বিকা হলেন রুদ্রের ভগিনী। আবার কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (10/18) অম্বিকা হলেন রুদ্রের পত্নী বা স্ত্রী। হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বেশিরভাগ শাস্ত্রকারদের অদ্ভুত পাগলামি এমন যে দুর্গা এক শাস্ত্রে ভগিনী তো আর এক শাস্ত্রে পত্নী। হিন্দু ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রকারেরা বোন আর বউয়ের মধ্যে কোন ফারাক রাখেননি। তবে মাতা-কন্যা, বধূ-ভগিনী বোধ যে ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের বেদের যুগে ছিল, তা নিশ্চিত রূপে বলা যায় না। ঋগ্বেদের দশম মন্ডলের বর্ণনায় দেখা যায় — ইন্দ্রের প্রেরিত দূত সরমা সুন্দরী পণিগণের অর্থাৎ ভারতীয় বণিকদের ভয়-ভীতি দেখিয়ে, গো-সম্পদ নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিলেন। সরমা সুন্দরী, ইন্দ্র ও অঙ্গীরার পুত্রদের নামে হুমকি দিলেও পণিগণ (সিন্ধুবাসী বা হিন্দুবাসী বণিক) ভয় না পেয়ে সরমাকে ভগিনী সম্বোধন করেন এবং বলেন, ''আমরা তোমাকে গোধন দিচ্ছি। তুমি তাই নিয়ে আমাদের এই দেশে সুখে-শান্তিতে বাস কর''। প্রত্যুত্তরে সরমা সুন্দরী বলেন, ''আমি ভ্রাতা-ভগিনী সংক্রান্ত কথা বুঝতে পারি না''। আর্যদস্যুদের প্রেরিত দূত বা গুপ্তচর হলেন সরমা সুন্দরী। প্রচীন বা পুরাণকালে দেবতা বা আর্যদস্যুরা নারী ও ব্রাহ্মণ্য ঋষিদের গুপ্তচর হিসেবে ব্যবহার করতেন। সেকালে নারীর কোন মান-মর্যাদা ছিল না। আর্য মহিলাদের বিক্রয় করা হত। আর্য বিবাহপ্রথা হল, কন্যা বিক্রয়ের প্রমাণস্বরূপ পরিভাষাগত শব্দ অনুযায়ী পুত্রের পিতা গো-মিথুন দিয়ে কন্যাকে নিয়ে যেতেন। বালিকাটিকে গো-মিথুনের পরিবর্তে বিক্রয় করা হল বলা আর একটি প্রণালী। গো-মিথুন অর্থ একটি গাভী ও একটি বলদ যা একজন বালিকার মূল্যের জন্য যুক্তিযুক্ত বলে মনে করা হত। শুধুমাত্র বালিকারাই যে তাদের পিতার দ্বারা বিক্রীত হত তা নয়, স্বামীরাও তাদের স্ত্রীদের বিক্রয় করতেন। হরিবংশের ৭৯তম অধ্যায়ে বলা বিবরণে আছে কেমন করে যজ্ঞকারী পুরোহিতকে তাঁর দক্ষিণা দেওয়ার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান হয়, যার নাম পুণ্যব্রত। এখানে বলা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণ স্ত্রীদের তাঁদের স্বামীর কাছ থেকে ক্রয় করতে হবে এবং সেই স্ত্রীদের যজ্ঞকারী পুরোহিতকে দক্ষিণা হিসাবে দেওয়া হবে। এই বিবৃতি থেকে এটা নিশ্চিত যে, ব্রাহ্মণরা তাঁদের স্ত্রীদের কিছুর পরিবর্তে অবাধে বিক্রয় করতেন।

আর্যরা তাদের স্ত্রীদের খাজনার পরিবর্তে সহবাসের জন্য অন্যদের দিতেন। মহাভারতের ১০৩ থেকে ১২৩ অধ্যায়ে মাধবীর জীবন কথার বিবরণ আছে। এই বিবরণ অনুসারে, মাধবী ছিলেন রাজা যযাতির কন্যা। যযাতি গল্বাকে উপহার দেন তাঁর কন্যাকে। গল্বা ছিলেন একজন ঋষি এবং তাঁকে পুরোহিতের দক্ষিণা হিসাবে এই

উপহার দেওয়া হয়েছিল। গল্বা তাঁকে খাজনার পরিবর্তে তিনজন রাজাকে পরপর ভোগ করতে দেন। কিন্তু প্রত্যেককে সেই মহিলার গর্ভে সন্তান উৎপাদনের প্রয়োজনীয় সময়ের জন্য দিয়েছিলেন। তৃতীয় রাজার স্বত্ব ভোগের কাল সমাপ্ত হবার পর গল্বা মাধবীকে তাঁর গুরু বিশ্বামিত্রের কাছে সমর্পণ করেন এবং বিশ্বামিত্র তাঁকে তাঁর স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। বিশ্বামিত্র তাঁর স্ত্রীর গর্ভে সন্তান না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে তাঁর কাছে রাখলেন এবং তারপর তাঁকে গল্বার কাছে প্রত্যর্পণ করেন। গল্বা তাঁকে তাঁর পিতা যযাতির কাছে প্রত্যর্পণ করেন। এ প্রসঙ্গে যম-যমীর কাহিনিও বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। ঋগ্বেদ অনুযায়ী তাঁরা (যম-যমী) বিবসান ও সুরন্যুর সন্তান এবং যমজ ভ্রাতা ও ভগিনী। যমী তার ভ্রাতা যমের সঙ্গে সঙ্গম আকাঙ্খা করেন, কিন্তু যম তা প্রত্যাখ্যান করেন। ঋগ্বেদের দশম মন্ডলের দশম সূক্তে যমী তার ভ্রাতা যমকে বলছেন — 'বিস্তীর্ণ সমুদ্র মধ্যবর্তী এ দ্বীপে এসে এ নির্জন প্রদেশে তোমার সহবাসের জন্য আমি অভিলাষিণী। কারণ গর্ভাবস্থা অবধি তুমি আমার সহচর। বিধাতা মনে মনে চিন্তা করে রেখেছেন যে তোমার ঔরসে আমার গর্ভে আমাদের পিতার এক সুন্দর নপ্তা (নাতি) জন্মাবে।' যম তার উত্তরে বলছেন — 'তোমার গর্ভ সহচর তোমার সাথে এ প্রকার সম্পর্ক কামনা করে না। যেহেতু তুমি তার সহোদরা ভগিনী, তুমি অগম্যা।' যমী তার উত্তরে বলছেন — 'যদিও কেবল মানুষের পক্ষে এ প্রকার সংসর্গ নিষিদ্ধ, তথাপি দেবতারা এরূপ সংসর্গ ইচ্ছাপূর্বক করে থাকেন। অতএব আমার যেরূপ ইচ্ছা হচ্ছে তুমিও তদ্রুপ ইচ্ছা কর। তুমি আমার প্রতি অভিলাষযুক্ত হও। এস এক স্থানে উভয়ে শয়ন করি। পত্নী যেমন পতির নিকট তদ্রুপ আমি তোমার নিকট নিজ দেহ সমর্পণ করে দিই'। যম যমীর এরূপ কথার উত্তরে বলছেন — 'তোমার ভ্রাতার এরূপ অভিলাষ নেই'। একথার উত্তরে যমী বলছেন — 'তুমি নিতান্ত দুর্বল পুরুষ দেখছি (ঋগ্বেদ 10/10/7/14) '। তাহলে একথা পরিষ্কার যে, সাধারণ মানুষের সমাজে ভাই-বোনের মধ্যে সহবাস নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু স্বর্গের দেবতাদের (আর্যদস্যু বা পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য সমাজের) ভাই-বোনের মধ্যে সহবাস প্রচলিত ছিল। আর্যদের বিবাহ সংক্রান্ত চিন্তা-চেতনা এ যুগের দৃষ্টিতে বড্ড লজ্জাকর। ব্রহ্মা তাঁর নিজের কন্যা শতরূপাকে বিবাহ করেন। তাঁদের পুত্র মনু ছিলেন পৃথু সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, এই সাম্রাজ্য ছিল ঐশ্বক এবং ঐলাসদের উত্থানের পূর্ববর্তী।

হিরণ্যকশিপু তাঁর কন্যা রোহিণীকে বিবাহ করেন। পিতা কর্তৃক কন্যাকে বিবাহের অন্যান্য দৃষ্টান্ত হল বশিষ্ঠ ও শতরূপা, জহ্নু ও জাহ্নবী এবং সূর্য ও ঊষা। কানীন পুত্রদের স্বীকৃতির মাধ্যমে এটা নির্দেশিত হয় যে, পিতা-পুত্রীর যৌন সম্পর্ক তখন প্রায়ই ঘটত। কানীন পুত্রের অর্থ অবিবাহিত কন্যার সন্তান। আইনত তারা ছিল সেই কন্যার পিতার

সন্তান। নিশ্চিতভাবেই তারা ছিল পিতার ঔরসজাত নিজ কন্যার গর্ভের সন্তান।

এরকম দৃষ্টান্ত আছে যেখানে পিতা-পুত্র একই মহিলার সঙ্গে সহবাস করছেন, ব্রহ্মা মনুর পিতা এবং শতরূপা তার মাতা। এই শতরূপা আবার মনুর স্ত্রী। আর একটি দৃষ্টান্ত হল শ্রদ্ধার। তিনি হলেন বিবস্বতের স্ত্রী। তাদের পুত্র মনু। শ্রদ্ধা আবার মনুর স্ত্রীও। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করার পথও তাঁর উন্মুক্ত ছিল। ধর্ম দক্ষের দশ কন্যাকে বিবাহ করেন। যদিও দক্ষ ছিলেন ধর্মের ভাই। একজন তাঁর খুড়তুতো বোনকেও বিবাহ করতে পারতেন, যেমন করেছিলেন কশ্যপ। তাঁর বিবাহিত স্ত্রী ছিলেন ১৩জন যাঁর সকলেই ছিলেন দক্ষের কন্যা এবং দক্ষ ছিলেন কশ্যপের পিতা ও মরীচির ভ্রাতা।

মহাভারতের আদি পর্বের বংশ বৃত্তান্ত অনুসারে ব্রহ্মের ছিল তিন পুত্র — মরীচি, দক্ষ, ধর্ম এবং এক কন্যা, যে কন্যার নাম বংশ বৃত্তান্তটি মহাভারতে নেই। এই বংশ বৃত্তান্তেই বলা হয়েছে যে, দক্ষ ব্রহ্মার কন্যাকে বিবাহ করেন যিনি, ছিলেন তাঁর ভগ্নী। দক্ষের অনেকগুলি কন্যা ছিল, যাঁদের সংখ্যা বিভিন্ন আন্দাজমত ৫০ থেকে ৬০-এর মধ্যে। ভ্রাতা-ভগ্নির বিবাহের অন্যান্য দৃষ্টান্তও দেখানো যেতে পারে। তাঁরা হলেন পূষণ ও তাঁর ভগ্নি অচ্ছোদা এবং অমাবসু। পুরু কুৎসা ও নর্মদা, বিপ্রচিতি ও সিংহিকা, নহুষ ও বিরজা, শুক্র-ঊষানস ও গো, অংশুমত ও যশোদা, দশরথ ও কৌশল্যা, রাম ও সীতা, শুক ও পিবরী, দ্রৌপদী ও প্রস্তি — এগুলি সবই ভ্রাত-ভগ্নি বিবাহের দৃষ্টান্ত।

পুত্রের মাতার সঙ্গে এবং পিতৃস্থানীয়দের সঙ্গে পুত্রীস্থানীয়দের সহবাসে কোন বিধিনিষেধ ছিল না ব্রাহ্মণ্যসমাজে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে পূষণ এবং তাঁর মা, মনু এবং শতরূপা ও মনু এবং শ্রদ্ধা, অর্জুন ও ঊর্বশী এবং অর্জুন ও উত্তরা। উত্তরার বিবাহ হয়েছিল অভিমন্যুর সঙ্গে যখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৬। উত্তরা অর্জুনের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। অর্জুন তাঁকে সঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষা দিয়েছিলেন। উত্তরা অর্জুনের প্রেমে পড়েছিলেন বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং মহাভারত বলে, প্রেম সম্পর্কের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে তাদের বিবাহের কথা। মহাভারত অবশ্য বলে না যে, বাস্তবে তাদের বিবাহ হয়েছিল, কিন্তু যদি তাই হত, তাহলে বলা যেত যে, অভিমন্যু তাঁর মাকে বিবাহ করেছেন।

ইন্দ্র ছিলেন অর্জুনের প্রকৃত, পিতা। ঊর্বশী ছিলেন ইন্দ্রের প্রণয়িনী এবং সেই সূত্রে অর্জুনের মাতৃস্থানীয়া। তিনি ছিলেন অর্জুনের শিক্ষক এবং তিনি অর্জুনকে সঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষা দিয়েছিলেন। ঊর্বশী অর্জুনের প্রেমমুগ্ধ ছিলেন এবং তাঁর পিতা ইন্দ্রের

সম্মতিক্রমে অর্জুনকে যৌন সঙ্গমে আহ্বান করেছিলেন। উর্বশীর এই আচরণ ঐতিহাসিক দিক থেকে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ দুটি কারণে। উর্বশীর অর্জুনের প্রতি সেই অনুরোধ এবং ইন্দ্রের এক্ষেত্রে সম্মতিদান দেখায় যে, উর্বশী উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত একটি রীতি অনুসরণ করেছিলেন। দ্বিতীয়ত উর্বশী স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে, সেটি ছিল একটি স্বীকৃত প্রথা এবং অর্জুনের পিতৃ-পুরুষেরা সকলেই ঐ ধরনের আহ্বান গ্রহণ করেছিলেন কোনরকম অপরাধবোধ ছাড়াই।

প্রাচীন ভারতে সহবাসের ক্ষেত্রে কীভাবে রক্তের সম্পর্ককে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হত, সে বিষয়ে হরিবংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত এই কাহিনিটির চেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য কোনটিই নয়। সেই কাহিনি অনুসারে সোম ছিলেন দশ পিতার সন্তান — যেটি বহুভর্তৃক প্রথার অস্তিত্ব স্মরণ করায় — এই দশজনের প্রত্যেককেই বলা হত প্রল্হেতা। সোমের একটি কন্যা ছিল, মরিশা — সোমের দশ পিতা এবং সোম নিজে মরিশার সঙ্গে সহবাস করেন। এটি একটি দৃষ্টান্ত যেখানে দশ পিতামহ এবং পিতা একজন মহিলার সঙ্গে বিবাহতি এবং যে মহিলা ছিলেন তাঁর স্বামীদের পৌত্রী এবং কন্যা। ঐ একই অধ্যায়ে দক্ষ প্রজাপতির কাহিনি বলা হয়েছে। কথিত আছে যে, এই দক্ষ প্রজাপতি, যিনি ছিলেন সোমের পুত্র, তাঁর ২৭টি কন্যাকে তিনি তাঁর পিতা সোমকে সন্তান উৎপাদনের জন্য দিয়েছিলেন। হরিবংশের তৃতীয় অধ্যায়ে রচয়িতা বলছেন যে, দক্ষ তাঁর কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন তাঁর নিজের পিতা ব্রহ্মার সঙ্গে এবং ব্রহ্মা সেই পত্নীর গর্ভে এক পুত্রের জন্ম দেন, যিনি নারদ নামে বিখ্যাত হন।

শাক্ত উপনিষদে দুর্গাকে মহালক্ষ্মী, সরস্বতী ও বৈষ্ণবীর সঙ্গে একাত্ম করা হয়েছে। অর্থাৎ যেই দুর্গা সেই লক্ষ্মী, যেই লক্ষ্মী সেই সরস্বতী। বেশ কিছু পুরাণে দুর্গাকে অপর্ণা ও পর্ণশবরী বলা হয়েছে। অপর্ণা অর্থে পত্রহীনা অর্থাৎ, পাতার পোষাকও যার নেই, অর্থাৎ নগ্নশবরী। একাদশ শতকে ভবদেব ভট্ট, দ্বাদশ শতকে জীমূতবাহন ও শূলপানির লেখায় দেখা যায়, তিনি শবলন্দর, মারবার ও পুলিন্দদের উপাস্য। এরা মধ্যভারতের বিন্ধ্যাচলের জঙ্গলবাসী। ব্রাহ্মণ্য চক্রান্ত সম্পূর্ণ সার্থক দুর্গাকে দাক্ষিণাত্যে প্রচার করার ক্ষেত্রে। কেননা, দক্ষিণের শাস্ত্রে দুর্গার সগর্ব উল্লেখ পাওয়া যায়। সর্বপ্রাচীন দুর্গার মূর্তি বলে প্রচার করা হয়েছে যাকে, তিনি প্রথম খ্রিষ্টাব্দের দুই হাত বিশিষ্ট এক কৃষ্ণাঙ্গী। সেখানে মহিষাসুর নেই। চতুর্থ শতকে উত্তরপ্রদেশের বিহিটায় পাওয়া যায় দুর্গার মূর্তি অতসী বর্ণাও নয় এবং দশহাতেরও নয়। বৌদ্ধযুগে কনিষ্ক এবং হবিষ্কর মুদ্রায় পাওয়া সিংহবাহিনী লক্ষ্মীর মূর্তি গুপ্তযুগে এসে চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্র গুপ্তের মুদ্রায় সিংহহন্তা দেবী

হিসেবে আত্মপ্রকাশ। দুর্গার সর্বভারতীয় প্রচার দেওয়ার জন্য প্রাচীন লক্ষ্মী মূর্তিগুলিকে দুর্গার মূর্তি বলে জনসমাজে প্রচার করেছেন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা। দুর্গার হাতের সংখ্যা ঠিক কত তা বলা মুশকিল। কারণ, কোন কোন পুরাণে দুই হাত, চারহাত, আটহাত, দশহাত, আঠার হাত থেকে হাজার হাতের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন মূর্তিগুলি প্রায় সবই লক্ষ্মীর। বিন্ধ্যের প্রাচীন এলাকা দুর্গ-এর মেয়ে দুর্গার সঙ্গে দুর্গাকে মিলিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টাও করা হয়েছে।

পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত মহাভারতের বিভিন্ন স্থানে দুর্গার নাম, স্তব ও স্তোত্রাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। বিরাট পর্বের ষষ্ঠ পর্বে অর্জুন কথিত দুর্গার স্তব আছে। ভীষ্মপর্বে উল্লেখ আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের পূর্বে অর্জুনকে দুর্গার নিকট জয় প্রার্থনা করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। মহাভারতের দেবী দুর্গা ছিলেন কৃষ্ণবর্ণা, চতুর্ভূজা ও চতুরাননা কুমারী, তিনি মদ ও মাংসপ্রিয়া ও অসুরনাশিনী দেবী ছিলেন। মহাভারতের বিরাট পর্বে দুর্গার স্তবে দুর্গাকে 'নন্দ গোপকূলে জাতা' কুমারী বলা হয়েছে। তখনও তিনি শিবের পত্নী হননি। তাহলে এ কথা বলা যায় যে, মহাভারতের দুর্গা আর বর্তমানের বাঙালির শরৎকালীন দুর্গা এক নয়। মহাভারতের দুর্গার চার হাত, চার মাথা। সধবা নন, কুমারী। এই দুর্গা ছিলেন কৃষ্ণবর্ণা। আর বাঙালির শারদীয়া দুর্গার এক মাথা, দশ হাত, গৌরবর্ণা যার স্বামী সন্তান আছে। যদিও পুরাণ শাস্ত্র মতে, দুর্গার প্রত্যেকটি সন্তান দুর্গার থেকে বয়সে অনেক বড়। তবে মহাভারতের দুর্গার সঙ্গে বর্তমানের শারদীয়া দুর্গার কয়েকটি মিলও খুঁজে পাওয়া যায়। দুই দুর্গাই মদ ও মাংস প্রিয়া। দুই দুর্গাই দেবতাদের অর্থাৎ আর্যদস্যুদের বা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বা শ্রমবিমুখ মানুষের সার্বিক স্বার্থ রক্ষার জন্য আর্যপূর্ব সুসভ্য অসুর বা শ্রমজীবী মানুষ নিধনকারী।

দেবী দুর্গার আবির্ভাবের কারণ অনুসন্ধান করলে জানা যায় যে, দেবতা, ব্রাহ্মণ, যাগযজ্ঞ ও চতুর্বর্ণ ভিত্তিক সামাজিক কাঠামোর বিরুদ্ধ মতবাদী অসুরশক্তির কবল থেকে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে উদ্ধারের জন্য দুর্গার উৎপত্তি ঘটানো হয়েছে। চণ্ডীতে এগারো অধ্যায়ের ৫৪-৫৫ শ্লোকে দুর্গা তথা মহাদেবীর মুখ থেকে বলানো হয়েছে —

যদা যদা বাধা দান বোত্থা ভবিষ্যতি।

তদা তদা বর্তীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥

অর্থাৎ যখনই দানবগণের প্রাদুর্ভাবের ফলে বিঘ্ন উপস্থিত হবে, তখনই আমি আবির্ভূতা

হয়ে দেব-শত্রু অসুরগণকে বিনাশ করব।

জাতিবর্ণ ও শ্রেণীতে বিভক্ত আর্য সমাজের বিপক্ষে শ্রমজীবী মানুষ, চার্বাকবাদীরা, বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরাই ছিল ''দেব-শত্রু অসুর''। এদের সকলকে দমন-পীড়ন করে অথবা বিনাশ করে দেবতা ও ব্রাহ্মণের আধিপত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানই ছিল দেবী দুর্গা নির্মাণের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

হিংসা দ্বারা কখনই হিংসা প্রশমিত করা যায় না। অহিংসা দ্বারাই হিংসা প্রশমিত করতে হয়। অহিংসার পূজারী বৌদ্ধ এবং কলিঙ্গ যুদ্ধের পর সম্রাট অশোক ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধিতা করতেন বলে ব্রাহ্মণ রচিত বিভিন্ন পুরাণ-এ সম্রাট অশোককে 'বৃষল' অর্থাৎ অধার্মিক এবং গৌতম বুদ্ধকে 'চোর' বলা হয়েছে। রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডে (109/34) তার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন—

''যথা হি চৌরঃ

স তথাহি বুদ্ধ''

মেহেরগড় বা সিন্ধু সভ্যতায় সিংহবাহিনী ও অসুর নিধনকারিণী রণদেবী রূপে কোন দেবীমূর্তির সন্ধান পাওয়া যায়নি। খ্রিষ্টিয় পঞ্চম শতাব্দীতে মধ্যপ্রদেশের উদয়গিরির অন্যতম গুহা বরাহ গুহা থেকে প্রাপ্ত মহিষাসুর মর্দিনীর দ্বাদশভূজা মূর্তিটি এখনও পর্যন্ত পাওয়া দেবীদুর্গার সব মূর্তির মধ্যে প্রাচীনতম। প্রথম খ্রিষ্টাব্দ থেকে পশ্চিম এশিয়া ও গ্রিক দেশের সঙ্গে ব্যবসায় সূত্রে মূলতঃ গিস দেশীয় দেব-দেবী ও সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে এদেশে। বলা যায়, পশ্চিম এশিয়া ও গ্রিক দেশীয় দেবীদের প্রভাবে চতুর্থ-পঞ্চম খ্রিষ্টাব্দে দেবী দুর্গার জন্ম হয়।

বঙ্গদেশে দুর্গার প্রচার ও প্রসার ঘটে আরো পরে, পঞ্চদশ খ্রিষ্টাব্দে। বিজ্ঞান এখনও পূর্বজন্ম-পরজন্ম বলে কিছু আবিষ্কার করতে পারেনি। তবু হিন্দু ব্রাহ্মণ্য পুরাণকারেরা পূর্বজন্ম-পরজন্মের তত্ত্ব মানুষের মনে গ্রথিত করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই দুর্গাকে কখনও সতী কখনও বা কালী বানিয়েছেন। অদ্বৈতবাদ অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এই মতবাদ প্রচারও এক্ষেত্রে অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

যুক্তি ও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ, এই সকল কাহিনিগুলিকে 'মিথ'(myth) বলেন। মিথ শব্দটির বাংলা করলে দাঁড়ায় পুরাণ বা গূঢ় অর্থপূর্ণ পুরাণকাহিনি। যথার্থ অর্থে মিথ শব্দটির অর্থ fallacious history বা প্রতারণাপূর্ণ ইতিহাস, বলেছেন মানব

বিজ্ঞানী লেভি স্টোস এবং অধ্যাপক শংকর বসুমল্লিক। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর 'জাতিভেদ' গ্রন্থে বলেছেন — ''যুগে যুগে দেখা যায় অনেক পুরাতন জাতি লুপ্ত ও নতুন জাতি উদ্ভূত হয়েছে। তাই বোধহয় বেদে উল্লিখিত বহু জাতি স্মৃতিতেনেই, স্মৃতিতে উল্লেখিত বহু জাতির কোনও সংবাদ বেদে মেলে না। বেদের অনেক জাতি পরে কী হইয়া গেল বলা কঠিন। যুগে যুগে নামেরও পরিবর্তন হইতে পারে। তবে চাতুবর্ণের বাঁধা নাম দিয়ে সব যুগের একই জাতিকে সবসময় বোঝানো যায় না। এমন অনেক জাতি আছে যাহাদের নাম স্মৃতিতে দেখি, কিন্তু বেদের মধ্যে কোথাও তাহাদের কোনও পরিচয় মেলে না।''

দুর্গাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সংস্কৃত সাহিত্য ও পুরাণগুলিতে বেশ কয়েকশত গল্প বা কাহিনি আছে। সেসব গল্প বা কাহিনিতে দুর্গার জন্মবৃত্তান্ত ও কর্মকাণ্ড নিয়ে মতভেদ থাকলেও অসুর বা আর্যপূর্ব ভারতীয় নিধন নিয়ে কোন বিরোধ নেই। সব গল্পগুলি আলোচনাও উদ্দেশ্য নয়। সবচেয়ে প্রাচীন ও দেবীর ভক্তদের গ্রহণযোগ্য কয়েকটি কাহিনি পুরাণ শাস্ত্র থেকে উল্লেখ করা হল।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত এবং উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রাকশিত গ্রন্থ চণ্ডীর (মার্কণ্ডেয় পুরাণ) ভূমিকাতে লেখা আছে যে, রাজা সুরথ ও সমাধি নামে এক বৈশ্য ব্যক্তির কাছে মেধা ঋষি যে দেবীমাহাত্ম্য বর্ণনা করেছিলেন তা মার্কণ্ডেয় মুনি পরে তাঁর শিষ্য ভাগুরি মুনিকে বলেছিলেন। এরপর ভাগুরিকথিত বিবরণ থেকে জানা যায়, দ্রোণ মুনির চার পুত্র (অভিশাপে পক্ষীযোণি প্রাপ্ত বিঙ্গখা, বিরাধ, সুপুত্র ও সুমুখ) ব্যাসদেবের শিষ্য মহর্ষি জৈমিনিকে বলেন —

প্রাগার্য ভারতীয়দের রাজ্য কেড়ে নিয়ে বংশ পরম্পরায় রাজা সুরথ রাজত্ব করতেন। একবার রাজা সুরথ কোল আদিবাসীদের কাছে পরাজিত হয়ে গড় জঙ্গলে পালিয়ে আসেন। রাজত্ব, রাজ্যপাট হারিয়ে মনের দুঃখে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর সঙ্গে সমাধি বৈশ্য নামে এক বণিকের দেখা হয়ে যায়। সমাধি বৈশ্যও নিজ পরিবার থেকে বিতাড়িত হয়ে এই জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য পরস্পরের দেখা হওয়ার পর একে অপরকে নিজেদের ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা খুলে বলেন। একদিন জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা মেধস মুনির আশ্রম আবিষ্কার করলেন। কথা প্রসঙ্গে এক সময় রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য মুনি মেধসের নিকট জানতে চাইলেন কেন সব হারিয়েও তাদের মন থেকে নিজেদের পরিবার, রাজ্য, রাজত্ব নিয়ে

মোহ যাচ্ছে না? কেনই বা তাঁরা সেই স্মৃতি ভুলতে পারছেন না? মেধস মুনি একথার উত্তরে বলেন, জগতে সমস্ত আসক্তির মূলে কাজ করে মোহশক্তি 'মায়া'। আর এই মায়াকে নিয়ন্ত্রণ করেন সর্বশক্তি 'মহামায়া'। কে এই মহামায়া? রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যের প্রশ্নের উত্তরে মেধস মুনি তাদের দুর্গার কাহিনি শোনালেন। বললেন, জগতে দেব-শত্রু অসুরদের নিধন করতে আদি শক্তি দুর্গার আবির্ভাবের কাহিনি। মহামায়ার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শাস্ত্রকার চণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ের ৭৫-৭৬ শ্লোকে বলেন, ''দেবী আপনিই এই জগৎকে সৃষ্টি করেছেন, আপনিই এই জগৎকে ধারণ করে আছেন এবং আপনি একে পালন করছেন। প্রলয়কালে আপনিই একে গ্রাস করেন। আপনিই সৃষ্টির কারণ। পালন করার সময় স্থিতি হয়ে থাকেন, আবার প্রয়োজনে গ্রাস করেন।'' অথচ হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অনুযায়ী ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণুকে পালন কর্তা আর মহাদেবকে ধ্বংসের কর্তারূপে বলা হয়েছে। যাইহোক, পুরাণ শাস্ত্র অনুযায়ী প্রায় পাঁচ হাজার বছর যুদ্ধেও যখন বিষ্ণু মধুকৈটভকে হত্যা করতে পারেন না তখন মহামায়ার মায়ায় অসুরদ্বয় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে বিষ্ণু কৌশলে তাদের দুজনকে হত্যা করলেন। একথা স্পষ্ট হলো যে, দুর্গার নারীসুলভ ছলনায় অসুরদ্বয়কে আচ্ছন্ন করতে না পারলে বিষ্ণুর ক্ষমতা ছিল না তাদের হত্যা করার।

যেহেতু প্রাগার্যদের কাছে হেরে রাজ্য থেকে বিতাড়িত সেই হেতু মেধস মুনি রাজা সুরথকে দুর্গাপূজো করার পরামর্শ দেন। তখন বসন্তকাল। বসন্তকালে এই পূজো হয়েছিল বলে একে বাসন্তীপুজো বলে। মার্কণ্ড ঋষির শিষ্য ভগুরি এই কাহিনি মার্কণ্ডেয় পুরাণের ১৩নং অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। রাজা সুরথের সেই দুর্গামন্দির অনেক দিন গড় জঙ্গলের অন্ধকারে পড়েছিল। অনেককাল পরে ব্রহ্মানন্দ গিরি নামে এক সাধু জঙ্গলের মধ্যে থেকে সেই মন্দির আবিষ্কার করে সেখানে পূজাপাট শুরু করেন। অনেকে মনে করেন, গড় জঙ্গলে রাজা সুরথের এই দুর্গামন্দির ও দুর্গা পুজো করার জন্য আজকের এই দুর্গাপুর শহরের নামকরণ। এ ক্ষেত্রে দেখা গেল রাজা সুরথ কোল-আদিবাসীদের নিকট হেরেছেন। কোলদের একটি গোষ্ঠী এখনও 'অসুর' নামে পরিচয় দিয়ে থাকেন। ছোটনাগপুর মালভূমির বিভিন্ন অংশে এবং উত্তরবঙ্গের চা বাগানে বহু অসুর শ্রমিক হিসাবে কর্মরত। মূলত গুমলা ও লোহার দাগা অঞ্চলে এদের বসবাস। এঁরা লোহা-মাটি বা আকরিক লোহা থেকে লোহা গলাতে পারেন এবং পূর্ব পুরুলিয়ার অসুর গোষ্ঠীর মানুষেরা তামাও গলাতে পারেন এবং বিভিন্ন অস্ত্র তৈরি করতে পারেন। পরবর্তীকালে এঁদের নাম ঝালদা ও বাঘমুণ্ডিতে অসুর-কামার নামে পরিচিত হয়। এই অসুর কামারদের

তৈরি নানা লোহার দ্রব্য বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ব্যবহার করেন চাষের কাজের জন্য। ঋগ্বেদে আমরা অসুর শব্দটি নিয়ে বারে বারে বিরোধাভাস জানতে পারি। মজার কথা ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য এক সময় অসুর বিশেষণে ভূষিত ছিলেন। কিন্তু পরে ঋগ্বেদে তাঁদের অসুরঘ্ন বা অসুর নিধনকারী বলা হল। পার্সিদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা থেকে জানা যায় যে, অসুর ছিলেন তাঁদের সর্বোচ্চ দেবতা। সংস্কৃতের 'স' ইরানীয়দের 'হ' উচ্চারণযুক্ত। এইভাবে ইরানের 'অহুর' ভারতে অসুর বলে পরিচিত। কিন্তু অহুর শব্দের এত বড়ো বিকৃতি হল কেন? আর্য আক্রমণকারীদের বারে বারে ভারতের প্রাগার্যরা প্রতিহত করেছেন। তাই অহুর শব্দটি পরবর্তীকালে অসুরে পরিণত হয়েছে। আজকের ঝাড়খণ্ডে এবং পুরুলিয়া,বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর সহ পশ্চিম বাংলার চা বাগানগুলিতে যে সমস্ত লোহাগলনকারী গোষ্ঠী আছেন তাঁরা অসুর বা চাপুয়া কামার নামে পরিচিত, যেহেতু তাঁরা ছিলেন অস্ত্র নির্মাতা, তাই বলা যায় তাঁরাই ছিলেন আর্য আক্রমণ প্রতিরোধী জনগোষ্ঠী। আর্য আক্রমণের সময় তাঁরা জোট বাঁধলেন কৈবর্ত গোষ্ঠীর সঙ্গে। কৈবর্ত গোষ্ঠীর সর্বোচ্চ নেতাকে বল হত 'মহামণ্ডলিকা' বা মহিষ। আর্য আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রাগার্যদের যেজোট হয়েছিল তার নেতৃত্ব দেন মহিষাসুর। অধ্যাপক পুরুষোত্তম চন্দ্র জৈন তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ, সোশিও ইকনোমিক এক্সপ্লোরেশন অপ মিডিয়াভেল গ্রন্থে বলেছেন 'ইন দি সেন রেজিম অফ বেঙ্গল, দি কৈবর্তস ওয়ার হাইলি রেসপেকটেড ইণ্ডিয়া ক্রোনিকেলস অফ দি টাইম রেফার টু এ বল্লাল সেন অফ বেঙ্গল, হু কনফারড দি ফিউডেটরি টাইটল অফ মহামণ্ডলিকা অর মহিষ, দ হেডম্যান অফ কৈবর্তস'। ব্রাহ্মণ মুনি মেধস এক্ষেত্রে শত্রু নিধনের জন্য রাজা সুরথকে দেবী দুর্গার পূজোর পরামর্শ দিলেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত রাজ্যহারা কোল বা আদিবাসী সমাজের কোন উন্নতি হয়নি। বরং লুঠেরা-রাজ্য দখলকারী রাজা থেকে সুরথের উত্তরসূরীগণ আদিবাসীদের নিকট প্রণম্য। আর লুটেরা আর্যদস্যুদের মূল শক্তিদায়িনী দুর্গা কোল আদিবাসীদের ক্রমশ আরাধ্য দেবী হয়ে উঠেছেন। এটাই প্রাগার্যদের ট্রাজিডি।

দুর্গার জন্মের কাহিনি নিয়েও নানা মুনির নানামত। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮২ থেকে ৮৪ অধ্যায়ে বর্ণিত দ্বিতীয় উপাখ্যান অনুসারে, পুরাকালে এক সময় স্বর্গের রাজা ইন্দ্র ও তাঁর দেব সেনাদের সঙ্গে মর্তের অর্থাৎ পৃথিবীর অসুরদের এক ভয়ংকর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে দেবতারা অসুরদের নিকট শোচনীয়ভাবে হেরে গেল। প্রাণভয়ে দেবতারা যে যেদিকে পারল সেদিকে দৌড়ল। শেষে তারা ব্রহ্মার নেতৃত্বে শিব ও বিষ্ণুর কাছে এসে সব কথা খুলে বলল। তারা জানাল, অসুরদের রাজা মহাসুর বা মহিষাসুরের অত্যাচারে সকল দেবাতার পালিয়ে বেড়াচ্ছে। মহাসুরের দৌরাত্ম্যের কথা বলতে বলতে ব্রহ্মা ও

দেবতারা উত্তেজিত হয়ে পড়ল। এর ফলে, সকল দেবতার মিলিত ক্রোধ এক বিপুল তেজের আকার নিল। সেই তেজরশ্মি থেকে এক অদ্ভুত আলো উৎপন্ন হল। সেই তেজময় আলো ধীরে ধীরে এক নারীর চেহারা নিয়ে সামনে এসে আবির্ভূত হলো।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে, দেবী ভাগবতে এবং বামন পুরাণে বিভিন্ন দেবতাদের তেজে দেবী দুর্গার শরীর গঠনও বেশ চমকপ্রদ। মহাদেবের তেজে দেবীর মুখ, যমের তেজ থেকে দেবীর কেশপাশ ও বিষ্ণুর তেজে বাহুগুলি তৈরি হয়। চন্দ্র-তেজে দেবীর স্তনযুগল, ইন্দ্র তেজে শরীরের মধ্যভাগ, বরুণের তেজে তাঁর জিহ্বা ও উরুদ্বয় এবং পৃথিবীর তেজে তার নিতম্ব তৈরি হল। ব্রহ্মার তেজে উদ্ভূত হল দেবীর পদযুগল। আর কুবেরের তেজে দেবীর নাসিকা। প্রজাপতির তেজে দাঁত এবং অগ্নির তেজে তিনটি চোখ উৎপন্ন হল। এরপর সন্ধ্যাদেবীদ্বয়ের দ্বারা (সন্ধ্যাদেবী কখন দুজন দেবী হলেন তা একমাত্র শাস্ত্রকাররাই জানেন) তৈরি হলো দেবীর কর্ণদ্বয়। অপরূপা এই নারীকে দেখে দেবাতারা বুঝলেন, এই নারীর মধ্যে আছে সেই শক্তি, যা দিয়ে মহাসুর বা মহিষাসুরকে বধ করা যাবে। জন্ম হল দুর্গার। এইভাবে যে কোন জীবনের জন্ম হতে পারে তা কোন বিজ্ঞান বা যুক্তিবাদী মানুষ বিশ্বাস করবে না। প্রাণ জন্মানোর রসায়ন এ যুগের সকলে জানেন। তবু একদল মানুষ গদগদ হয়ে এ কাহিনি শোনেন এবং বিশ্বাস করেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে দুর্গার নির্দিষ্ট কোন পিতা-মাতা পাওয়া গেল না । তবে মূল কাহিনি সেই অসুর নিধন। এরপর মহাসুর বা মহিষাসুরকে বধ করার জন্য দেবতারা নানান অস্ত্র দিয়ে দেবীকে সাজালেন। মহাদেব দেবীকে একটি ত্রিশূল দিলেন, বিষ্ণু দিলেন একটি সুদর্শন চক্র। এভাবে বরুণদেব শঙ্খ, অগ্নিদেব শক্তি ও পবনদেব একটি ধনু ও দুটি বাণপূর্ণ তূণীর দিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র দেবীকে বজ্র, ঐরাবত ঘণ্টা, যম কালদণ্ড, বরুণদেব পাশা দিলেন। সুর্য দেবীর সমস্ত রোমকূপে তার তেজ এবং কাল-দেবতা দেবীকে খড়্গ ও ঢাল দিয়ে সাজিয়ে দিলেন। সমুদ্রের কাছ থেকে দেবী সমস্ত অলংকার পেলেন। বিশ্বকর্মা দেবীকে কুঠার ও নানারকম অস্ত্র-শস্ত্র দান করলেন। সমুদ্র দেবীকে দুটি পদ্মমালা ও একটি পদ্ম দিলেন। হিমালয় দিলেন দেবীর বাহন সিংহকে, কুবের দিলেন সুরাপূর্ণ পাত্র। সবশেষে নাগরাজ বাসুকি দেবীকে মূল্যবান মণিশোভিত নাগহার দেন।

বামন পুরাণ মতে দেবতাদের তেজরাশির সাথে ঋষি কাত্যায়নের তেজ মিলিত হয়েছিল বলেই তাঁর নাম হয় কাত্যায়নী দুর্গা। আবার ভিন্নমতে, শরীর প্রাপ্তির পর সু-উচ্চ পর্বতে তপস্যারত মহর্ষি কাত্যায়নের আশ্রমে দেবী আবির্ভূতা হওয়ার কালে ঋষি কাত্যায়ন দেবীকে পূজা করেছিলেন বলেই তাঁর নাম কাত্যায়নী দুর্গা হয়। ভিন্ন মতে, মনুর পুত্র মানব, সুমিত্রার নন্দন সৌমিত্রি অনুসারে ঋষি কাত্যায়নের কন্যা

কাত্যায়নী হতে পারেন।

দুর্গা নামের অন্তরালে আর একটি মত হল, দুর্গ বা দুর্গম নামের এক অসুরকে বধ করেন বলেই এই নৃত্য পটীয়সী নারীর নাম হয় দুর্গা। দুর্গ ছিলেন রুরু দৈত্যের সন্তান। মহাশক্তিধর দুর্গ ত্রিলোক (ধর্মীয় ভাষায় স্বর্গ-মর্ত-পাতাল বলতে বোঝায়— বর্তমান জম্মু-কাশ্মীর, কাবুল-কান্দাহার, পাকিস্তান, আফগানিস্থান প্রভৃতি সহ হিমালয় পাদদেশ পর্যন্ত হল স্বর্গ, হিমালয় পাদদেশ থেকে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত মর্ত, আর বিন্ধ্য পর্বতের পরবর্তী অঞ্চল পাতাল নামে পরিচিত) বিজয়ী হন। দেবতাদের অনুরোধে পার্বতী দুর্গকে হত্যা করেন এবং দুর্গা নামে পরিচিত হন।

এখানেও দুর্গা দেবতাদের মঙ্গলের জন্য অসুর বা প্রাগার্য দুর্গ নামে এক বলশালী ব্যক্তিকে হত্যা করেন। এখানেও দেবী ক্যত্যায়নী বা দুর্গার পিতা-মাতা কে জানা গেল না। তবে কাত্যায়ানী বা দুর্গা এখানে দেবতা বা সুর (সুরা নারীতে আসক্ত যারা) বা আর্যদস্যুদের হিতার্থে মহিষাসুরকে বধের জন্য সৃষ্টি, তা বোধহয় বলার অপেক্ষা রাখে না। বানর, রাক্ষস নাগ প্রভৃতি শব্দ নিয়ে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন। নানা মুনির নানা মত কম-বেশি উল্লেখ করা হল। যেমন — 'বানর' ও 'রাক্ষস' কারা এই বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের মতামত খুবই স্পষ্ট। তিনি বলেছেন, 'আর্যগণ সে সময়ে ভারতের গভীর অরণ্যের অধিবাসীদের সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। তখন তাঁহারা বন্য জাতিদিগকে বানর নামে অভিহিত করিতেন। আর এই তথাকথিত বানর অর্থাৎ বন্যজাতিদের মধ্য যাঁহারা অতিশয় বলবান ও শক্তিশালী হইত, তাঁহারা আর্যগণ কর্তৃক রাক্ষস নামে অভিহিত হইত।

মহিষাসুরকে ধারাবাহিকভাবে প্রচার করা হয়েছে যে তিনি অশুভের প্রতীক। মহিষ ও অসুর শব্দ দুটি নিয়ে তৈরি হয়েছে মহিষাসুর শব্দটি। আর্য আক্রমণের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মহিষাসুর নামের এক যৌথ বা জোট নেতৃত্ব। সমস্ত মধ্যভারতের মানুষদের সর্বপ্রধান বংশপ্রতীক হল 'নাগ'। বিশেষ সংকটমূহূর্তে নাগ রক্ষা করবে পরিবারের সমস্ত মানুষকে — এটাই তাঁদের বিশ্বাস। সর্পের যেমন মারাত্মক মারণশক্তি আছে, তেমনি আছে বিশ্বাস রক্ষাশক্তি। সর্পের এই রক্ষা শক্তি থেকেই রক্ষস শব্দটি রাক্ষস-এ পরিণত হয়েছে। সম্পত্তির রক্ষক হিসেবে সর্প সর্ববিদিত এক পুরাণ আলেখ্য। কৃষ্ণ যেমন কালিয়া নাগকে হত্যা করেছিলেন, তেমনি নাগও তাঁকে রক্ষা করেছেন।

সমুদ্রমন্থনের সময় বাসুকি শেষ নাগের অবদান অনস্বীকার্য। গৌতম বুদ্ধকে রক্ষা করেছিলেন 'মুচলিন্দ' নামে এক নাগ। প্রতিটি কাহিনিতে দুর্গাকে দিয়ে দেবকূল রক্ষার্থে মুনি-ঋষি-ব্রাহ্মণেরা পরামর্শ দিয়েছেন। সেই মত অ্যাসিরিও সভ্যতার ধারক-বাহক বলবান অসুরদের হত্যা করতে সক্ষম হয়েছেন। এ কথা অতীব সত্য যে, দীর্ঘকাল ধরে আর্যদস্যু ও সুসভ্য সিন্ধু নগরবাসীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ চলেছিল। পণ্ডিতেরা এই বিরোধ ও যুদ্ধকে আর্য-অনার্য যুদ্ধ বলেছেন। ধর্মীয় শাস্ত্রকারেরা এঁকে দেবতা (আর্যদস্যু) ও অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন। দেবাসুরের যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে আর্য-প্রাগার্য যুদ্ধেরই প্রতীক। যে কোল দেশের দেশত্যাগী রাজা সুরথের কাছে মেধাস ঋষি দেবী মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন , ছোটনাগপুরের বিন্ধ্যপর্বতের পূর্বাঞ্চলে এখনও সেখানে কোল জাতির লোকেরা বসবাস করেন। ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে যে, দেবতাদের রাজা ইন্দ্র ''পঞ্চাশ হাজার কৃষ্ণবর্ণ শত্রুকে বিনাশ করেছেন। অসুর শম্বরের অর্থাৎ শবরের নিরানব্বইটি পুরী ধ্বংস করেছেন'' (২/৭/২-৩)। ঋগ্বেদে (১/৫৩/৭) একথাও আছে যে, ''শম্বরের নগর সমূহ ধ্বংস করে'' পুরন্দর নামে অভিহিত হন। এই আর্য-প্রাগার্য যুদ্ধে এ দেশের বহু নগর, পুরী ও জনপদ ধ্বংস হয়েছিল। প্রাক-আর্যযুগে সিন্ধু ভারতীয় নারীরা যোদ্ধা ছিলেন। আর্য যুগে তাঁদেরও কোন কোন নারী যোদ্ধা ছিলেন একথা ঋগ্বেদ স্বীকার করে। একথাও অনুমান করা যায় যে, দুর্গ রক্ষাকারিণী শম্বর নারী যোদ্ধাদের উৎস হিসাবে নিয়ে আর্যরা যুদ্ধের দেবী দুর্গার কাহিনি গড়েন, কেননা, আর্য সমাজে নারীর কোন সামাজিক মর্যাদা ছিল না।

এবার যে কাহিনি উল্লেখ করব তার নাম 'অকাল বোধন'। এই অকাল বোধন বা শরৎকালীন দুর্গোৎসবই সবচাইতে জাঁক-জমকপূর্ণ। বর্তমনে হিন্দু বাঙালির প্রায় জাতীয় উৎসবের রূপ নিয়েছে। রাজা সুরথের বসন্তকালের পরিবর্তে আশ্বিন মাস বা শরৎকালে অর্থাৎ অসময়ে বা অকালে রামচন্দ্র এই পূজা করেছিলেন বলে দুর্গাপুজো 'অকাল বোধন' নামে পরিচিত।

লঙ্কাধিপতি রাবণকে বধ করবেন বলে রামচন্দ্র দুর্গার অকাল বোধন ঘটিয়ে পূজো করেছিলেন। ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী অবধি সেই বোধন ও পূজোর পর্ব পার হয়ে অষ্টমী নবমীর সন্ধিক্ষণে তিনি সন্ধি পূজো করলেন। দুর্গা তুষ্ট হলেন, রামকে বর দিলেন। দেবী দুর্গার বরে রামচন্দ্র দশমী তিথিতে রাবণকে বধ করলেন।

রামচন্দ্রের এই দুর্গাপুজো কৃত্তিবাসী সংযোজন। বাল্মীকি রামায়ণে কোথাও দুর্গার নাম নেই। রামায়ণের কাহিনি যে সময়ের সে সময়ে দুর্গার আবির্ভাব ঘটেনি।

রামায়ণের সময়কালের কয়েকশত বৎসর পরের ঘটনা দুর্গার আবির্ভাবের কাল। বাল্মীকি রামায়ণের রাম দুর্গাপুজো করেননি। তিনি সূর্যপুজো করেছিলেন। মহাশক্তিশালী মহারাজ রাবণকে যুদ্ধার্থী দেখে রামচন্দ্র ভয় পেয়ে গেলেন। সূর্যবংশজাত রামচন্দ্রকে চিন্তান্বিত দেখে ঋষি অগস্ত্য আদিত্য হৃদয় সূর্যদেবের পুজো করতে আদেশ দেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গৌড়বঙ্গের রাজা গণেশের নির্দেশে বাংলার কবি (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের ফুলিয়া নিবাসী) কৃত্তিবাস ওঝা বাংলা রামায়ণ রচনা করেন। এই কৃত্তিবাসী রামায়ণেই শরৎকালে দুর্গার অকালবোধনের কাহিনি জুড়ে দেওয়া হয়। ১২০৩ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজিকে দিয়ে বাংলায় যে ইসলামি শাসনের শুরু, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলায় তার সমাপ্তি ১৭৫৭ সালে। ৫৫৪ বছরের মুসলিম-প্রশাসনের মধ্যে গনেশই ছিলেন একমাত্র হিন্দু রাজা। রাজা গনেশের প্রচন্ড ব্যক্তিত্ব, পরধর্ম বিদ্বেষ এবং স্বধর্মের প্রতি চরম আনুগত্য ছিল সুপরিচিত। পরধর্মের প্রতি বিরাগ ও নিজধর্মের প্রতি অন্ধবিশ্বাস ও ভালবাসাই হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের অবক্ষয়ের কালে তাকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ রচনার পৃষ্ঠপোষকতা করতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

দুর্গাপুজোর কাল নিয়ে মতভেদ থাকলেও মার্কন্ডেয় চন্ডীতে জানা যায় সুরথ রাজা শরৎকালেই দেবী দুর্গার পুজো করেছিলেন। ষোড়শ শতকে পরিবর্তিত এবং পরিমার্জিত আকারে বঙ্গদেশে রচিত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেও (৬৪ও ৬৫ অধ্যায়) শরৎকালেই দুর্গাপুজোর কথা বলা হয়েছে। সম্রাট আকবরের আমলে রাজা কংসনারায়ণ বঙ্গদেশের দেওয়ানের পদে উন্নীত হতে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর জমিদারি বিস্তার করার লক্ষ্যে মনোনিবেশ করেন। তিনি তৎকালীন বাংলার বিশিষ্ট পণ্ডিতদের কাছে শাস্ত্রানুমোদিত কোন মহাযজ্ঞ করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। বিখ্যাত তান্ত্রিক পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রী রাজা কংসনারায়ণকে বলেন, ''শাস্ত্রে বিশ্বজিৎ, রাজসূয়, অশ্বমেধ ও গোমেদ এই চারটি মহাযজ্ঞের বিধান আছে। তবে প্রথম দুটি সার্বভৌম সম্রাট করতে পারেন। পরের দুটি কলিতে নিষিদ্ধ। উভয় যজ্ঞই ক্ষত্রিয়দের করণীয়। ব্রাহ্মণের নহে। কলিতে একমাত্র মহাযজ্ঞ দুর্গাপুজো। যে কেউ এই মহাযজ্ঞ দুর্গোৎসব করতে পারেন। প্রায় আট লক্ষ টাকা খরচ করে রাজা কংসনারায়ণ এই মহাযজ্ঞ দুর্গোৎসব প্রচলন করেন। প্রখ্যাত গবেষক বিনয় ঘোষের ''কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত'' গ্রন্থে দেখা যায় — রাজা কংসনারায়ণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাজশাহী জেলার ভাদুড়িয়ার রাজা জগৎনারায়ণ প্রায় নয় লক্ষ টাকা খরচ করে বাসন্তী দুর্গোৎসব করেন। পরবর্তীকালে এক রাজার (জমিদার বা বারভুঁইয়া বা ধনী ব্যবসায়ী) দেখাদেখি আর এক রাজা এই পুজো পাল্লা দিয়ে করতে থাকেন। মনে রাখা দরকার কৃত্তিবাসের রামায়ণেও অসুররাজ লঙ্কেশ্বর রাবণকে হত্যার জন্য

রামচন্দ্রের দুর্গাপুজো। যদিও গল্পটা মূল বাল্মীকি রামায়ণে নেই, কৃত্তিবাসের বানানো। । সেই একই প্রচেষ্টা ব্রাহ্মণ্যবাদী রামচন্দ্রকে দিয়ে এদেশিয় মহাশক্তিশালী ভূমিপুত্র (মুন্ডারি) সম্রাট রাবণকে হত্যার কাহিনি।

পঞ্চম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্ম গভীর সংকটের মধ্যে দিয়ে যায়। কেবল যখনই ব্রাহ্মণ্যধর্ম রাজধর্ম রূপে প্রতিষ্ঠা পায় তখনই সর্বদিক দিয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রচার, প্রসার ঘটে যা দেশীয় সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন করে তোলে। প্রথম হুন আক্রমণে উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছু কিছু অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম রক্ষিত হলেও রাজা হর্ষবর্ধনের বিশাল সাম্রাজ্যে আবার বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তিত হয়। এসময় পূর্ব ভারতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটায়। শশাঙ্কের রাজত্বকালে আবার ব্রাহ্মণ্যধর্ম ব্যাপক আকার ধারণ করলেও পাল সাম্রাজ্যে পুনরায় বৌদ্ধধর্মের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে পশ্চিম ভারতে গুর্জ্জর প্রতিহার রাজারা এবং দক্ষিণ ভারতের চোল, চের, রাষ্ট্রকূট প্রভৃতি রাজারা নিজ নিজ রাজ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম বজায় রাখতে সফল হন। বাংলায় পাল যুগে এসে বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের সহাবস্থান ঘটে। এই দুই প্রধান রাষ্ট্রীয় ধর্মের ফারাক সাধারণ মানুষ বুঝতে অক্ষম হন। কৃষিজীবী শ্রমজীবী মানুষের সহজাত ধর্ম ওই দুই রাষ্ট্রীয় ধর্মের বাইরে প্রবহমান থাকে। যেহেতু সাধারণ মানুষের চলমান সাম্যবাদী সমাজ ধর্ম রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি সেহেতু কালক্রমে তা জনমানস থেকে হারিয়ে যায়। কেউ কেউ সনাতন ধর্মের নামে কিছু অনুশাসন প্রচার ও প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সনাতন ধর্মের নামে এই নব ব্রাহ্মণ্য কেউ গ্রহণ করেনি। গৌতম বুদ্ধ স্বধর্ম বা সনাতন ধর্মের মানুষ ছিলেন। সম্রাট অশোকও সনাতন ধর্মের উপাসক ছিলেন। অবশ্য তিনি বুদ্ধের মত ও পথকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিয়ে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়েছিলেন। বুদ্ধ তাঁর ধর্ম আকাশ থেকে পাননি। শ্রমজীবী-কৃষিজীবী মানুষের জীবনবোধ থেকে, জাগ্রত সাম্যবাদী মতাদর্শ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। তাই দ্রুত ব্রাহ্মণ্য ভারত বৌদ্ধ ভারতে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু কিছু বৌদ্ধ অনুশাসন সাধারণ মানুষ মেনে নিতে পারেননি। অন্যদিকে ক্রমাগত সনাতন ধর্মের নামে ব্রাহ্মণ্য স্বার্থের পক্ষে রাষ্ট্রীয় আক্রমণের মাধ্যমে বিরামহীন অত্যাচার চলে। ফলে গোটা দেশ ব্রাহ্মণ্যধর্মের গ্রাস থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। একদিকে বৌদ্ধ অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এই দুইয়ের বিভ্রান্তির মধ্যে শ্রমজীবীদের পালনীয় ধর্মের খোঁজ করেছিলেন হরিচাঁদ ঠাকুর। চলমান কৃষিজীবী শ্রমজীবী নমদের জীবনচর্চা ও জীববোধে সহজাত ভাবেই থেকে গিয়েছিল যে আদর্শ মতুয়া মতাদর্শের মধ্যে দিয়ে সেই

জীবনবোধ প্রচার করার কঠিন চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কৌশলী ব্রাহ্মণ্য ধর্ম মতুয়া মতাদর্শের অনেকটাই গ্রাস করে ফেলেছে হিন্দু শাস্ত্রের মধ্যে দিয়ে। এদেশের সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে ব্রাহ্মণের চিরদাসত্বে অবনত করে রাখার জন্য ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রকে হিন্দু ধর্ম বলে চালানো হয়। কেবল বৌদ্ধ ও চার্বাকদের প্রবল চাপের মুখে প্রকাশ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম অনেক ক্ষেত্রে সহনশীল হল। আর আর্যদস্যুরা তাঁদের বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ত্যাগ করে সনাতন ধর্মমতে চলল। মুসলমান শাসকেরা এদেশ দখল করার পর ইসলাম ধর্ম ছাড়া বাকিদের হিন্দু বলে উল্লেখ করলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মের পণ্ডিতেরা সনাতন ও ব্রাহ্মণ্য শব্দ দুটিকে বাদ দিয়ে হিন্দুধর্ম নামে বাপক প্রচার করল। তাই বর্তমান হিন্দুধর্ম যা, ব্রাহ্মণ্যধর্মও তাই। মুসলমান শাসনের পূর্বেই ভারত থেকে বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদ ঘটেছে। অন্যান্য ধর্মের মানুষ তাদের দর্শন হারিয়ে হিন্দু ধর্মে আশ্রয় নিয়েছে। ফলে হিন্দু শব্দের গোলক ধাঁধায় পড়ে সকল মানুষ ব্রাহ্মণ্যধর্মের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছেন।

আর্যরা একটি মদ্যপ জাতি। মদ তাদের ধর্মের একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। বৈদিক দেবতারা মদ্যপান করতেন। স্বর্গীয় মদকে বলা হত সোমরস। প্রাচীন আর্যদস্যুদের নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে খুব কমদিনই যেত যেদিন তাদের সোমরস পান করা হত না। সোমরস পান তিনটি উচ্চ শ্রেণি যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য — এদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

যজুর্বেদ বলছে 'হে সোমদেব! সুরাপানে শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত হয়ে পবিত্র মনন দ্বারা দেবতাদের সন্তুষ্ট কর; যজ্ঞকারীকে কিছু রসালো খাদ্য দাও এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে দাও প্রাণশক্তি'। মন্ত্রে ব্রাহ্মণ বলছে : 'যার দ্বারা মহিলাদের পুরুষের উপভোগ্য করা হয়েছে এবং যার দ্বারা জলকে মদে পরিণত কার হয়েছে (পুরুষের আনন্দের জন্য) ইত্যাদি'। রাম ও সীতা উভয়েই যে মদ্যপান করতেন, সেকথা রামায়ণে স্বীকার করা হয়েছে। উত্তরখণ্ডে বলা হচ্ছে : 'ইন্দ্র যেমন তাঁর স্ত্রী শচীর ক্ষেত্রে করেছিলেন, রামচন্দ্র সীতাকে বিশুদ্ধ মধু থেকে প্রস্তুত মদিরা পান করালেন। ভৃত্যেরা রামচন্দ্রের জন্য মাংস এবং সুমিষ্ট ফল নিয়ে এল'। একই কাজ করেছিলেন কৃষ্ণ এবং অর্জুন। মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে সঞ্জয় বলছেন : 'অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণ সোমলতা থেকে প্রস্তুত মদিরা পান করে, সুগন্ধি মেখে, মাল্যভূষিত হয়ে জমকালো পোশাক ও অলঙ্কার পরিধান করে বিবিধ রত্নখচিত একটি স্বর্ণ সিংহাসনে আসীন হলেন। আমি দেখলাম শ্রীকৃষ্ণের পদযুগল অর্জুনের কোলের উপর এবং অজুনের পদযুগল দ্রৌপদী এবং সত্যভামার কোলের উপর'। আর্য দেবতাদের মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র ছিলেন সুরাপানে বিশেষজ্ঞ। বৈদিক যুগের

মুনি ঋষি ও রাজা-মহারাজা যজ্ঞকালে সোমরস অর্থাৎ সুরা হব্য হিসেবে অগ্নিতে প্রদান করতেন বিভিন্ন দেবতাদের উদ্দেশ্যে। দেবী দুর্গাও সুরাপানে আসক্ত ছিলেন।

আদি বাল্মীকি রামায়ণের মতো আদি বেদব্যাসী মহাভারতের কোথাও কোন দেবী পূজোর উল্লেখ নেই। তবে পরবর্তী ভিন্ন ভিন্ন ভাষার অনুবাদে দেবী দুর্গার আরধনা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিরাটপর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে রাজ্যভ্রষ্ট যুধিষ্ঠিরের 'ভগবতী দুর্গার স্তব'-এ দেখা যায় যে, দুর্গা এখানে যশোদার কন্যা, মদ মাংস প্রিয়া, কামচারিণী। দুর্গা এখানে দশভূজার পরিবর্তে চতুর্ভুজা। ভীষ্মপর্বের ২৩ অধ্যায়ে দুর্যোধনের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আগে অর্জুন দেবী দুর্গাকে কুমারী, নন্দ গোপকূলে জন্ম, কোকামুখ অর্থাৎ কুকুরের মতো মুখ বলে সম্বোধন করেছেন। মহাভারতের লেখক দেবী দুর্গাকে কুকুরের মতো মুখ বলতেও দ্বিধা করেননি। এক এক ধর্ম পুরাণ এক এক ভাবে দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছে। দুর্গার রূপ যে ঠিক কেমন তা বোঝা দুষ্কর।

মহালয়া থেকে বিজয়াদশমী এই পর্বটিই দুর্গাপূজো। ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও কমবেশি নবরাত্রি রূপে উৎসব পালিত হয়। গুজরাতে ডাণ্ডিয়া রাস ও গর্বা নৃত্য সহযোগে নবরাত্রি পালিত হয়। গোয়াতে এই সময় সেজে ওঠে সারস্বত ব্রাহ্মণী মন্দিরগুলি। দক্ষিণ ভারতে এই সময় ধাপে ধাপে দেব-দেবীর মূর্তি সাজিয়ে পালিত হয় 'গোলু'। দুর্গাপূজো উপলক্ষ্যে যে মূর্তি কাঠামোয় পূজো দেওয়া হয়, সেখানে সকলের অলক্ষ্যে থাকেন দশভূজা দুর্গার স্বামী হিসেবে শিব বা মহাদেব। শিবের আর এক স্ত্রী হিসাবে কালী সর্বাধিক প্রচারিত। অথচ কালী হলেন মাতৃতান্ত্রিক সমাজের আদি মানবী। সর্বপ্রাচীন ঋগ্বেদের 'রাত্রিসূক্ত' বৈদিক যুগের 'রাত্রিদেবী' সেই প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত কালী নামে পূজিতা। কালী আর দুর্গা এক নন। কালীর সমকালে সমাজে লজ্জাবোধ জাগ্রত হয়নি। তাই কালির লজ্জা নিবারণের কোন পোশাক নেই। যদিও মানুষ প্রথম লজ্জা নিবারণের জন্য পোশাক ব্যবহার করত না, পরিবেশ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য পশুর চামড়া, গাছের বাকল ব্যবহার করত। তবে কালী মানুষের মাথা ও হাত কেটে যেভাবে পোশাক পরিধান করেছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রতীকী অর্থে লজ্জা নিবারণের জন্য। আর্যদস্যু ও অন্যান্য ভ্রাম্যমাণ আক্রমণকারীরা এদেশের শুধুমাত্র সম্পদই লুণ্ঠন করত না। নারীকে ভোগ্যবস্তু হিসাবে ব্যবহার করত। এই অমানবিক অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য এদেশের যোদ্ধা নারীরা নিজেরাই দুষ্টকে শাস্তি দিতেন। পোশাক ও অলংকারেও দুর্গা ও কালীর মধ্যে কোন মিল নেই। রেশম বা পশম শিল্পের শাড়ী বা সিল্কের শাড়ী পরিধেয় দুর্গা। জন্মগত, বংশগতভাবে দুজনের দেখা হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। শিব বা মহাদেব কালী থেকে কয়েক হাজার বছরের

ছোট। সমাজে লজ্জাবোধ এসেছে পরে। শিব এই কারণে বাঘ বা পশুর চামড়া ব্যবহার করেন। কালী-শিব-দুর্গার একসঙ্গে দেখা হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। অথচ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এই তিনজনের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক করে দিয়েছেন।

দুর্গাপুজোর যে চিত্র দেখা যায় তা হল — দুর্গা মহিষাসুরকে ত্রিশূল দিয়ে খুন করছেন। পাশে নানা জীবজন্তু(বাহন) সহ গণেশ-কার্তিক-লক্ষ্মী-সরস্বতী বিশেষ ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছেন।

সংস্কৃতে প্রবাদ আছে— 'মাঘস্য শুক্র পঞ্চমাং বিদ্যারম্ভে দিনেপি চ' শ্রীকৃষ্ণই এই প্রথার স্রষ্টা। কারণ অনুসন্ধানে জানা যায় যে. ওই দিনেই স্কন্দের বা কার্তিকের সঙ্গে লক্ষ্মীর বিবাহ দেওয়া হয়েছিল। তাহলে কার্তিক ও লক্ষ্মীর সম্পর্ক কি দাঁড়াল? স্বামী-স্ত্রী। অথচ দুর্গাপূজোর কার্তিক ও লক্ষ্মীর সম্পর্ক ভাই-বোনের। কালক্রমে লক্ষ্মীর ওই দিনটি সরস্বতী দখল করে নিয়েছে।

প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা লক্ষ্মী এবং দুর্গাকে এক করার প্রচেষ্টা করেছেন সুদীর্ঘকাল ধরে। দুর্গাপুজোর সময় তেলেঙ্গানা বলয়ে 'বাথুকাম্মা' উৎসব পালন করা হয়। কথিত আছে, চোল বংশীয় রাজা ধর্মগুপ্ত কন্যা রূপে দেবী লক্ষ্মীকে লাভ করেছিলেন। এই রাজকন্যা বাথুকাম্মাই লক্ষ্মী আবার দুর্গা-ই। কেরলে দুর্গাপুজোর সময়ে সরস্বতীর পুজো হয়।

ঋগ্বেদে সরস্বীতর উল্লেখ আছে। সেখানে সরস্বতী সূর্যের কন্যা ও পত্নী দুই-ই। আবার দেবী পুরাণেও সরস্বতী ব্রহ্মার কন্যা ও পত্নী দুই-ই। তাহলে এই সকল পুরাণ থেকে আমরা কী পেলাম?

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের মুখ হতে সরস্বতী নিঃসৃত হয়েছিলেন। পরে ক্রোধবশতঃ বিষ্ণুর অন্য স্ত্রী গঙ্গার অভিশাপে সরস্বীত নদ বা নদী হলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রাচীনকালে সরস্বতী নামে একটি নদী ছিল। অসুর সভ্যতা ধ্বংস করে আর্যদস্যুরা ভারতে প্রবেশের প্রথম দিকে এই নদীর অববাহিকায় বসতি স্থাপন করে। তখন অবশ্য সিন্ধু ও সরস্বতী নদীর উভয় পার্শ্বে উন্নত সিন্ধুসভ্যতা ছিল। সেখানকার মানুষ উন্নত নাগরিক জীবন-যাপন করত। সরস্বতী নদী তার গতিপথ হারিয়ে অনেক শুকিয়ে গেছে, এমন সময় আর্যরা সরস্বতী নদীর তীরে বসবাস শুরু করে। আর্যদের আসার পূর্ব থেকে নানা কারণে সিন্ধুসভ্যতা ভেঙে পড়েছিল। আর্যদের আগমনে এবং তাদের ক্রমাগত আক্রমণে সিন্ধুসভ্যতা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। শুধুমাত্র সিন্ধু শব্দটি হিন্দু শব্দে বিদেশীদের কাছে থেকে যায়। আর্যরা এই গোটা সিন্ধু অঞ্চলে তাদের ক্ষমতা

ও প্রভাব বিস্তার করে। এইসব অঞ্চল আর্যাবর্ত নামে পরিচিতি লাভ করে। তাদের সভ্যতা আর্যসভ্যতা, তাদের ভাষা আর্যভাষা নামে চলতে থাকে। এদেশের মানুষ এই আর্যভাষীদের জীবন-সংস্কৃতি গ্রহণ করতে এবং তাদের প্রাধান্য মানতে যেমন বাধ্য হয় তেমনি সিন্ধু বা হিন্দুবাসীদের অনেক কিছু আর্যরা গ্রহণ করে। বিরোধ ও ভাব-সংস্কৃতির আদান-প্রদানের মধ্যে থেকে এই সভ্যতা গড়ে ওঠে। মুসলমান যোদ্ধাদের কবলে পড়ে সিন্ধুসভ্যতা ও আর্যসভ্যতা শব্দ দুটির পরিবর্তে পারসিকদের কাছে পরিচিত শব্দ হিন্দুসভ্যতা অধিক প্রচারিত হয়। বৈদিক যুগে সরস্বতীর প্রতিমা ছিল না। হীনযানী বৌদ্ধদের মধ্যে সর্বাস্তবাদী বৌদ্ধরাই প্রথমে বুদ্ধের মূর্তি সৃষ্টি করেন। তাঁদের দেখাদেখি খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী বা তার পরবর্তীকালে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য দেবীদের মূর্তি বুদ্ধদেবের মূর্তির ন্যায় পরিকল্পিত বা গঠিত হয়েছিল।

কার্তিক আর গণেশের মধ্যে গণেশ বড়। কেননা, ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মন্ডলের ২৩তম সূক্তের প্রথম মন্ত্রে 'গণপতি' শব্দের উল্লেখ আছে। কার্তিকের নাম ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদের দশম মন্ডলের ১১- তম সূক্তের নবম মন্ত্রে ইন্দ্রকে এবং অন্যত্র রুদ্রকেও 'গণপতি' বলা হয়। তাই বলা যায়, যিনি ইন্দ্র, তিনি রুদ্র বা শিব। যিনি শিব তিনিই গণপতি বা গণেশ। ঋগ্বেদ অনুযায়ী দুর্গা গণেশের স্ত্রী, অথচ শারদীয় দুর্গাপুজো অনুযায়ী আমরা জানি দুর্গা গণেশের মা। হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বড়ই আশ্চর্য এবং অদ্ভুত সম্পর্ক দুর্গা ও গণেশের। ঋগ্বেদের ১০/১১২/৯ মন্ত্রে ইন্দ্রকেই গণপতি বলা হয়েছে। গণেশের জন্ম বিষয়ে পুরাণাদিতে পরস্পরবিরোধী একাধিক ঘটনা দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, বামন পুরাণ, বরাহ পুরাণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে। তুলসী গণেশকে প্রেম প্রস্তাব দিলে গণেশ তা প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে, তুলসী ক্ষেপে গিয়ে কোন মেয়েকে বিয়ে করতে না চাওয়া গণেশকে অভিশাপ দেন। কিছুকালের মধ্যেই গণেশ পুষ্টি নামে অর্থাৎ মহাষষ্ঠী কে বিয়ে করেন। আর গণেশের অভিশাপে তুলসীর শঙ্খচূড় নামে এক অসুরের সঙ্গে বিয়ে হয়। কথিত আছে, গণেশ চোর ছিলেন। একবার চুরি করে জননী কর্তৃক তিরস্কৃত হয়েছিলেন। গণেশের বাহন মূষিক বা ইঁদুরের স্বভাবও চোরের মত। যেমন — 'মূষ' শব্দটির অর্থই হচ্ছে লুণ্ঠন বা চুরি করা। খেতের ধান, গৃহের অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য তথা ছোটখাটো গৃহ উপকরণ নিত্য নিত্য চুরি করাই তার উপজীব্য। কাঁচ ঘরের মেঝেয় ও দেওয়ালে সিঁদেল চোরের মত সিঁধ কাটে। যতটা পারে পেট পুরে খায় অবশিষ্ট নিজের গর্তে লুকিয়ে রাখে। যা তার খাদ্য নয়, সেগুলি কুচি কুচি করে কেটে তছনছ করে, নষ্ট করে। গণেশ আর তার বাহন ইঁদুর ঠিক যেন, 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই'। আসলে কথায় বলে না বাপ কা বেটা, সেপাই কা ঘোড়া, কুছ নেহি তো থোড়া থোড়া। গণেশের

বাবা শিবকে যজুর্বেদের রুদ্রাধ্যায়ে চোরের সর্দার বলা হয়েছে — 'স্তায়ুনাং পতয়ে নমঃ' অর্থাৎ হে চৌরপতি রুদ্র, তোমাকে নমস্কার। প্রাচীনকালে এবং এখনও বৃহৎ ভারতের কোথাও কোথাও চুরি করার পূর্বে তাদের কার্যসিদ্ধির জন্য চোরের সর্দার রুদ্র বা গণেশের পুজো দেওয়া হয়। গণেশের চৌরগণেশমন্তর-এর খুব খ্যাতি আছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের গণেশ গায়ত্রীতে গণেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। গণেশ প্রথমে একজন 'বিঘ্নকারক' দেবতা বলে পরিচিত ছিলেন। সেই কারণে গণেশকে বিঘ্নেশ ও বিঘ্ননায়ক বলা হয়। বন্যহস্তী ও ইঁদুর চাষিদের পরম শত্রু। কারণ তারা শস্যের বহু ক্ষতি করে। সেই জন্যই গণেশের সঙ্গে ইঁদুরের সম্বন্ধ আছে।

বাঙালিদের কাছে দুর্গার আর এক পুত্রের নাম কার্তিক। গণেশের ছোট ভাই। উভয়ের জন্ম অপ্রাকৃত এবং অযোনিজ। লজ্জাকরও বটে। শাস্ত্র পণ্ডিতেরা কার্তিকের জন্মের নানা উপাখ্যান লিখেছেন। অন্যতম একটি উপাখ্যানে বলা হয়েছে যে, একদা এক আনন্দঘন মুহূর্তে শিবের তেজঃ স্খলিত হয় ধরিত্রীর বুকে। ধৈর্য্যশীলা ধরিত্রী সেই ভয়ংকর তেজঃ ধারণ করতে অক্ষম। তিনি সেই স্খলিত তেজঃ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত করেন। শঙ্করের তেজঃ শুদ্ধ হয়ে তা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়। গঙ্গায় ভাসতে ভাসতে এক সরবনে গিয়ে সেই তেজঃ দেবশিশু রূপে আবির্ভূত হয়। ছয়টি কৃত্তিকার স্তনে লালিত পালিত হয়েছিলেন বলে তাঁর নাম ষড়ানন। কৃত্তিকাদের দ্বারা পালিত হয়েছিলেন, তাই তিনি কার্ত্তিকেয় বা কার্ত্তিক। মহাদেবের তেজঃস্কন্দ ক্ষরিত হয়ে জন্ম হয়েছিল বলে তাঁকে বলা হয় স্কন্দ। হিমালয়ের পাদদেশে গুহাবাস হেতু তাঁর অন্য নাম গুহ। অনেকে মনে করেন কার্ত্তিক অবিবাহিত, চিরকুমার। একথা সত্য নয়। বেশিরভাব পুরাণ শাস্ত্রে কার্ত্তিক বিবাহিত। তাঁর স্ত্রীর নাম দেবসেনা আর পুত্রের নাম বিশাখা। দেবসেনা বাঙালি হিন্দু ব্রাহ্মণদের নিকট ষষ্ঠীদেবী রূপে পরিচিত। কার্ত্তিকের জন্মের পূর্ব পর্যন্ত দেবতারা(আর্যদস্যুরা) তাঁদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নারীকে ব্যবহার করেছেন। একবার ভয়ংকর বীর যোদ্ধা তাড়কাসুরকে বধ করার জন্য দেবতারা কার্ত্তিকের জন্ম দিলেন। শুধু তাই নয়, পুরুষ প্রধান-রাষ্ট্র ব্যবস্থায় স্থায়ী সেনাপতির চাকরি কার্ত্তিকই পেলেন।

ময়ূর ও মোরগ সমবর্গীয় পাখি। শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রখ্যাত টীকাকার গোপাল ভট্ট স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন — ''কুক্কুটোহপি কার্ত্তিকেয়স্য বাহনম্'' মহাভারত ও মৎস্য পুরাণেও এর প্রমাণ আছে। যুদ্ধ, প্রাতরুত্থান, দলবদ্ধভাবে বসবাসকারী ও বিপন্না স্ত্রীকে রক্ষা করাব প্রচেষ্টা - মূলতঃ এই চারটি গুণের জন্য ময়ূরকে কার্ত্তিকের বাহনরূপে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে। ঋগ্বেদে ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতাদিগের মধ্যে কুমার বা কার্ত্তিকের নাম পাওয়া যায় না। শতপথ ব্রাহ্মণে অগ্নিদেবতার বহু নামের মধ্যে কুমার নামটি দেখা

যায়। প্রথমে অগ্নি, শিব ও কুমার একই দেবতা ছিলেন। এদিক থেকে কার্ত্তিকের সঙ্গে মা দুর্গার ছেলের সম্পর্ক বোঝায় না। যা বোঝায় তা হল স্বামী-স্ত্রীর। হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র পড়লে সাধারণ মানুষের মাথা খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দেবতাদের প্রতি অন্ধ ভক্তি থাকলে তো আর কথাই নেই। স্কন্দ বা কার্ত্তিক প্রথমে বিঘ্নকারক গণদেবতা ছিলেন। একথা মহাভারতের বনপর্বে স্কন্দ উপাখ্যানে পাওয়া যায়। স্কন্দ পুরাণে কুমার বা কার্ত্তিককে ''চোর ডাকাতের দেবতা'' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 'দশকুমার চরিত', 'মৃচ্ছকটিক' প্রভৃতি কাব্যেও স্কন্দ বা কার্ত্তিককে চোরের দেবতা বলা হয়।

কুষাণ সম্রাট হবিষ্করের সময়ে (পাঞ্জাব মিউজিয়ামে রক্ষিত) একটি মুদ্রায় OESO এবং NANA নামে একটি নারী ও পুরুষ মূর্তি আছে। গবেষকগণ মনে করেন, পুরুষমূর্তিটি ভবেশ আর নারী মূর্তিটি উমাপার্বতীর। পাঞ্জাব মিউজিয়ামে রাখা একটি নারী মূর্তির হাতে পদ্মফুল এবং রত্নভাণ্ড। মূর্তিটির নীচে OMMA নাম লেখা। এই নারী মূর্তিগুলি আসলে লক্ষ্মীমূর্তি।

লক্ষ্মী মূলত ধনের দেবী। তিনি সমুদ্রোদ্ভবা। হাতে তাঁর শালি ধানের মঞ্জরী ও পদ্ম এবং বুকে কৌস্তুভমণি। দেবী ভাগবতে বলা হয়েছে, ''বাণিজ্যরূপা বাণিজ্যম্'', বণিকদের সম্বন্ধে তিনিই বাণিজ্যরূপিনী; তিনিই সর্বপ্রকার শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আবার অর্থ নিয়ে অর্থলোভীদের মধ্যে সৃষ্টি হয় কলহের। এ অর্থে তিনিই ''পাপিনাং কলহাঙ্কুরা ''। কথিত আছে, দেবী লক্ষ্মীই শাপভ্রষ্টা হয়ে পদ্মা নদীরূপে অবতীর্ণা। আমরা ধন্য অর্থাৎ বঙ্গবাসী ধন্য। কেননা পদ্মা নদী বঙ্গদেশের মধ্যাংশ দিয়ে প্রবাহিত। গোটা বঙ্গদেশকে তিনি সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা করেছেন। প্রবহমান নদের জীবনচিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কৃষি ব্যবসায়ী 'কান্তা কাঞ্চনসন্নিভা' হয়েছেন। নমদের কাছে তাই দেবী লক্ষ্মী নিত্য কৃষিময়ী। পুরাণ শাস্ত্র অনুযায়ী সমুদ্র মন্থনের সময় মুক্তা, সোনা, শঙ্খ, কড়ি, মৎস্য, উর্বর পলি মাটির দখলদারি নিয়ে দেবাসুরের যুদ্ধ বাধে। এই সকল মূল্যবান সম্পদের মালিক অসুর বা প্রাচীন ভারতীয় বা সিন্ধবাসীদের, দেবতারা (আর্যদস্যু) সেই সম্পদ থেকে তাদের বঞ্চিত করেন। নদীমাতৃক উর্বর ভূমির বাসিন্দারা শস্যসম্পদের শক্তিরূপে দেবী লক্ষ্মীকে স্মরণ করে আসছেন। শ্রমজীবী সমাজের অর্জিত সম্পদ শ্রমবিমুখ আর্যদস্যু ও পরবর্তীকালে এদেশে মধ্যস্বত্বভোগীরা জোরপূর্বক কেড়ে নিতেন। বেদ-পুরাণে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে। পরবর্তীকালে দেবী লক্ষ্মীকে (কৃষিজীবী মানুষের নিকট শস্যফলন কেন্দ্রিক উৎসবই আর্যদের দ্বারা লক্ষ্মী দেবী রূপে

পরিচিতি লাভ করে) হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী মানুষজন নিজেদের মত করে সাজিয়ে নেন। লক্ষ্মীর বাহন হিসেবে পেচক বা পেচাকে জুড়ে দিয়ে আর্যদস্যুরা তাদের চরিত্র আরও ফুটিয়ে তুলেছেন। আর্যদস্যু বা হিন্দু ব্রাহ্মণ্য পুরোহিতরাও পেচার মত স্বভাব পালন করেন। দিনের আলোয় সে নিরীহ গো-বেচারা, ঘনপত্রসমাচ্ছাদিত গাছের কোটরে আত্মগোপন পরায়ণ। আর রাত্রির অন্ধকারে সে দুর্ধর্ষ হিংস্র। নিরপরাধ ঘুমন্ত পাখির বাচ্ছা, ব্যাং, ইঁদুর তার শিকারের লক্ষ্য। গরীব কৃষক মানুষের রক্তশোষক, কর্মবিমুখ ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের মত। রক্তের বীভৎস পিপাসায় পেচা যেমন তাদের ওপর সবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং লব্ধ শিকার নখতাড়নে ছিন্নভিন্নপূর্বক নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি করে থাকে ব্রাহ্মণ্য মানসিকতাও তদ্রুপ পৈশাচিক ও অমানবিক। পেচার পক্ষদ্বয় এমন সুকৌশলে নির্মিত যে বিদ্যুৎ বেগে উড়ে গেলেও তাতে বিন্দুমাত্র শব্দ হয় না যাতে শিকার তার আগমন বার্তা জানতে না পারে। ঠিক অনুরূপভাবে ভন্ড গোঁসাই ব্রাহ্মণ পুরোহিত ধর্মের বা ভগবানের দোহাই দিয়ে ও ভয় দেখিয়ে অনায়াসে শোষণ করে থাকে।

লক্ষ্মী হোক আর সরস্বতী হোক, পুজোর প্রাচীনত্ব নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। মহেঞ্জোদড়োয় প্রাপ্ত ক্ষুদ্রকায় রুগ্ন নারীমূর্তি এবং উদ্ভিদগর্ভা নারীমূর্তি মাতৃপুজোর নিদর্শন বহন করে। অথচ যাদের উদ্ভবের ইতিহাস গর্বের নয়, বরং লজ্জার, এদেশের কৃষক-শ্রমিক সমাজ সেই কার্ত্তিক-গণেশ-লক্ষ্মী-সরস্বতীর পূজো দেবেন। বিচিত্র মানুষের মন, শিক্ষা, জ্ঞান ও বোধ। লক্ষ্মী-সরস্বতীর পূজো দিতে দিতে এদেশের কৃষক-শ্রমিক সমাজ ফতুর হয়ে গেল। লক্ষ্মী না দিল অর্থ, সরস্বতী না দিল বিদ্যা। এদেশে সাধারণ মানুষের ঘরে খাদ্য-সম্পদ ও শিক্ষা-সম্মান পাওয়ার জন্য কোন অবতার বা মহাপুরুষেরা কিছুই করেননি। এইসব কৃষক, শ্রমজীবী মানুষের সার্বিক উন্নতির জন্য হরিচাঁদ ঠাকুর, জ্যোতিরাও ফুলে, গুরুচাঁদ ঠাকুর, পেরিয়ার রামস্বামী নাইকার, ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের মত মানুষজনকে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে অথচ কোন সমাজে সেভাবে এই সকল বরেণও মানুষেরা সামান্য সম্মানটুকুও পান না।

বহিরাগত যাযাবর আর্যগণ নিজেদের সুরলোক বা কল্পিত দেবলোকের নাগরিক হিসাবে প্রচার করেন। তুক্-তাক্ প্রিয় আর্য ঋষিরা (ধর্মান্ধ পুরোহিত) পরাজিত সিন্ধুবাসীদের স্বর্গসুখের স্বপ্ন দেখান আবার নরক যন্ত্রণার ভয়ও দেখান। কী করলে স্বর্গসুখ হবে? দেব-দ্বিজে পুজো ও দেবদেবীর নামে আর্য ঋষি (আর্য পুরোহিত) দের অর্থ-সম্পদ-খাদ্য দান করলে। আর্য ব্রাহ্মণ পরাজিত সিন্ধু বা হিন্দু বা পরবর্তীকালের ভারতীয়দের জ্ঞানচর্চা বা বিদ্যা শিক্ষা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেন। মেহেরগড়-হরপ্পা-ম

হেঞ্জোদড়ো-সিন্ধু সভ্যতার উৎপাদনশীল নাগরিকগণ হয়ে গেলেন অলস ও কর্মবিমুখ, যুদ্ধপ্রিয় ও কূটকৌশলী ব্রাহ্মণ্যধর্মের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির দাস। সুরলোক বা দেবলোকের এই মানুষদের বলে সুর বা স্বঘোষিত দেবতা। এদের সঙ্গে যোগ দেন এদেশের ক্ষমতালোভী, ধুরন্ধর নেতা-উপনেতারা। পবন, বরুণ, ব্রহ্মা তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

নরবলি ছিল আর্যদের ধর্মের একটি অঙ্গ এবং সেটিকে বলা হত নরমেধ যজ্ঞ। এই সব আচার-অনুষ্ঠানের সবচেয়ে বিস্তৃত বিরণ পাওয়া যায় যজুর্বেদ সংহিতা, যজুর্বেদ ব্রাহ্মণ, সাংখ্যায়ন এবং বৈতন সূত্রে। জননেন্দ্রিয়ের পুজো বা যাকে বলা হয় লিঙ্গমূর্তি পুজো, প্রাচীন আর্যদের মধ্যে খুবই প্রচলিত ছিল। লিঙ্গমূর্তি পুজো পদ্ধতি স্কন্দ বলে পরিচিত ছিল এবং অথর্ব বেদের ১০-৭ স্তোত্রে দেখা যায় যে, অশ্বমেধ যজ্ঞ আর্যদের একটি বিকৃত ধর্মীয় প্রথা। অশ্বমেধের একটি বাধ্যতামূলক অঙ্গ ছিল মেধ বা মৃত অশ্বের সেপসটি (লিঙ্গ) যজমানের প্রধানা স্ত্রীর যোনির মধ্যে প্রবিষ্ট করানো, যার সঙ্গে থাকত ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের দীর্ঘস্থায়ী মন্ত্রোচ্চারণ। বাজসনেয় সংহিতায় একটি মন্ত্র (২২.১৮) দেখায় যে, অশ্বর দ্বারা এই জঘন্য কর্মটি করানোর সম্মান পাওয়ার জন্য রানিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা লেগে যেত। যাঁরা এই সম্বন্ধে আরো বেশি জানতে চান তাঁরা যজুর্বেদের মহিধরের বিবৃতিতে তা পাবেন। সেখানে তিনি এই অশ্লীল রীতি-নীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন।

আর্যরা ছিল একটি জুয়াড়ি জাতি। আর্যসভ্যতার প্রথম দিকে জুয়াকে তারা সামাজিক মর্যাদায় উন্নীত করেছিল। তারা বাজি ছাড়া খেলত না। রাজ্য এমনকি স্ত্রীদের পর্যন্ত বাজি রাখা হত জুয়া খেলায়। রাজা নল তাঁর রাজ্য বাজি রেখে জুয়া খেলেছিলেন এবং তাতে তিনি রাজ্য হারান। পাণ্ডবরা আরও বেশি এগিয়েছিলেন। তাঁরা শুধু রাজত্বই বাজি রাখেননি, তাঁদের স্ত্রী দ্রৌপদীকেও বাজি রেখেছিলেন এবং দুটোই তাঁরা হারান।

বিদেশী আর্যদের সঙ্গে যেহেতু কোন নারী ছিল না, তাই তারা পিতৃতান্ত্রিক ছিল। এদেশের নারীদের জোরপূর্বক বলাৎকার করত, সন্তানধারণ করতে বাধ্য করত। আর্য বা দেবতা বা সুরদের ধর্ম হল ছলে-বলে-কৌশলে পরের ধন-দৌলত-খাদ্য-সম্পদ লুণ্ঠন করা, শত্রুকে নিধন করা। বেদ-পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারত সর্বত্র দেবতাদের হীন ও অমানবিক কর্মকাণ্ড লক্ষ করা যায়। ভারত ও ভারতের বাইরের বিভিন্ন কাহিনি, উপ-কাহিনিতে মহিষাসুর বধের মূল জীবন-সংগ্রাম আলোচনার পূর্বে দেখে নেব বঙ্গদেশে দেবী দুর্গার পুজো চালু হল কোন প্রেক্ষাপটে।

বঙ্গদেশে কবে দুর্গাপুজো প্রথম প্রচলিত হয় তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। তবে একথা নিশ্চিত , ষোড়শ শতাব্দীর আগে বাংলায় দুর্গাপুজোর প্রচলন হয়নি। ইসলাম ধর্ম প্রসারের পূর্বে বাংলায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৈষ্ণবধর্মের পর্যায়ক্রমে বিকাশ ঘটে। ইসলাম ধর্মের বিকাশের পূর্বে বৌদ্ধধর্ম ও বৈষ্ণব ধর্মকে পিছনে ফেলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম শক্তিশালী হয়ে ওঠে। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে বঙ্গদেশ বৌদ্ধধর্মের সংস্পর্শে এলেও অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে দশম শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত ছিল বৌদ্ধধর্মের সমৃদ্ধির কাল। সপ্তম শতকে (৬২৯-৬৪৫ সালে) চীন দেশের পরিব্রাজক হিউয়েন সাং-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে তাঁর এদেশে আসার পূর্বেই বঙ্গদেশে বসবাসকারী পৌন্ড্র, কিরাত, কৈবর্ত, বঙ্গ ও বাগদিদের একটা অংশ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল। পালরাজা ধর্মপালের আমলে বর্তমানের রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে সোমপুরে সোমপুর জৈন বিহারের ধ্বংসাবশেষের উপরেই বৌদ্ধ মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ৭৫০ থেকে ১১৬০ সালের মধ্যে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের চক্রান্তে বৌদ্ধধর্ম তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে বৌদ্ধ তান্ত্রিকসাধনার কেন্দ্রভূমি রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা পরবর্তীকালে নেপাল, ভূটান ও তিব্বতে বিস্তার লাভ করে। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় তাঁর ''বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব'' গ্রন্থে পাল রাজাদের সম্পর্কে লিখেছেন —''ইহারা মহাযানী বৌদ্ধ সংঘ ও সম্প্রদায়ের পরম অনুরাগী পোষক; অথচ বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মও ইহাদের আনুকূল্য ও পোষকতা লাভ করিয়াছে। ..... একাধিক পালরাজা পুরোহিত সিঞ্চিত শান্তিবারি নিজেদের মস্তকে ধারণ করিয়াছেন''। শুধু তাই নয়, পাল যুগে ব্রাহ্মণরা মন্ত্রী ও সেনাপতির পদে নিযুক্ত হতেন। তাছাড়া বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীদের মধ্যে সমন্বয় ঘটেছিল। তারা, ভীমা, অপরাজিতা, কৃপালিনী প্রভৃতি দেবদেবী বৌদ্ধ সাধনমালায় দেখা যায়। ড. শশীভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর ''ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য'' বইতে বৌদ্ধতন্ত্রের কালী সম্পর্কে লিখেছেন, ''ভয়ঙ্করী, নীলবর্ণা, দ্বিভূজা, অগ্নিকোনস্থিতা, একহাতে কঙ্কাল ও অন্যহাতে অস্ত্র। আলীঢ় ভঙ্গিতে ইনি শিবের উপর অবস্থিতা''। বৌদ্ধ এই কালীর রূপ প্রায় বর্তমান ব্রাহ্মণ্য কালীরই প্রতিচ্ছবি। তবে একথা সঠিক যে, বৌদ্ধতন্ত্রগুলি লিখিত হওয়ার অনেক পরে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রগুলি রচিত হয়। আবার গুপ্তযুগের রাজা-মহারাজারা 'পরমভাগবত' শব্দটি নামের আগে যোগ করে নিজেদের পরিচয় দিতেন। কারণ গুপ্ত রাজারা 'বৈষ্ণব ভাগবত' ধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। বাংলার বর্মণ, দেববংশ ও সেন বংশীয় রাজাগণ (১১৫৯-১২০৬ সাল) বৈষ্ণব ছিলেন। লক্ষণ সেন ছিলেন পরম বৈষ্ণব। তাঁর সভাকবি জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনা করে বৈষ্ণব

ধর্মকে আরও শক্তিশালী করেন। অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম এবং বৈষ্ণব ধর্ম এই তিন ধারার সমন্বয় বাংলাকে মিশ্র ধর্মাবলম্বী করে গড়ে তোলে। এই ধর্মীয় ত্রিধারা থেকে অনেকটা প্রভাবমুক্ত ছিলেন বাংলার কৃষিজীবী নমরা। যার ফলে, অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষেরা নিজেদের ধর্মীয় আত্মসমর্পণের পরাজয় ঢাকার জন্য এদের অবজ্ঞা করার কৌশল নিলেন। মুসলিম শাসনের পূর্বে বাংলার কোথাও দুর্গাপুজোর উল্লেখ মেলে না। সেন-বর্মণ যুগে শুধুমাত্র তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষ বিশেষ করে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের রাজকার্যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এসময় পুরোহিত, মহাপুরোহিত, শান্তিবারিক তন্ত্রসাধক, তন্ত্রধারক প্রভৃতিরাই মন্ত্রী, সেনাপতি ও রাজকর্মচারী রূপে নিযুক্ত হওয়ার ফলে রাষ্ট্র একটি উগ্র ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে পরিণত হয়। সেন-বর্মণ আমলের পণ্ডিত ভবদেব ভট্ট ও ব্রাহ্মণকূল তিলক হলায়ুধ মিশ্র ''ব্রাহ্মণ সর্বস্ব'' ও ''পণ্ডিত সর্বস্ব'' রচনা করেন। সে সময়ের উচ্চতর আদর্শ একমাত্র জ্যোতিষ চর্চা। ভবদেব ভট্ট, হলায়ুধ মিশ্র, বল্লাল সেন, লক্ষণ সেন সহ অন্যান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা নিয়মিত জ্যোতিষ চর্চা করতেন। ফলে গোটা ব্রাহ্মণ্য সমাজ কর্মবিমুখ অথচ ভোগ বিলাসপ্রিয় হয়ে পড়েন। শৃঙ্গার রসের আকর গ্রন্থ জয়দেবের গীতগোবিন্দ এ সময়ে রচনা করা হয়। আর সেই সঙ্গে বৌদ্ধ সহজযানীদের প্রভাবে রাজপ্রাসাদ থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সকলের মধ্যেই যৌনাতিশয্যের প্রাবল্য দেখা যায়। এভাবে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধোগতির অনিবার্য পরিণামে মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা হয়। ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার তাঁর ''বাংলাদেশের ইতিহাস'' গ্রন্থে লিখেছেন, 'জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মুসলমানদের পানীয় গ্রহণ বা দ্রব্য ভোজন এমনকি নিষিদ্ধ ভোগ্যের গন্ধ নাকে আসিলেও হিন্দু জাতিচ্যুতি হইত। মুসলমানে কোন হিন্দু নারীর অঙ্গ স্পর্শ করিলে সে স্বয়ং এবং কোন কোন স্থলে তাহার পরিবার ও আত্মীয়স্বজন জাতি ও ধর্মে পতিত বলিয়াই গণ্য হইত। সেই সমুদয় হিন্দুর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না'। গোটা মুসলমান শাসনে একমাত্র হিন্দুরাজা গণেশ পরধর্ম বিদ্বেষ ও স্বধর্মের প্রতি আনুগত্যের কারণে বর্তমানে ফুলিয়া নিবাসী কৃত্তিবাস ওঝাকে দিয়ে একটি বাংলা রামায়ণ রচনা করান। যেখানে রাম কর্তৃক দুর্গাপুজোর উল্লেখ পাওয়া যায়।

মনুসংহিতার বিখ্যাত টীকাকার কুল্লুক ভট্ট প্রতিষ্ঠিত রাজশাহী জেলার রায় বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা কংসনারায়ণ সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে (ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে) সর্বপ্রথম মাটির প্রতিমা গড়ে দুর্গাপুজো প্রবর্তন করেন। নিজের সামাজিক মযার্দা বৃদ্ধি ও জমিদারির বিস্তার লাভের জন্য প্রায় আট লক্ষ টাকা ব্যয় করে রাজসিকভাবে এই শারদীয়া দুর্গাপুজোর প্রচলন করেন। গবেষক বিনয় ঘোষ তাঁর

''কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত'' পুস্তকে লিখেছেন, ''কংসনারায়ণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাজশাহী জেলার ভাদুড়িয়ার রাজা জগৎনারায়ণ প্রায় নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করে বাসন্তী দুর্গোৎসব করেন।

বাংলার দুর্গাপুজোর ইতিহাস খুব পুরনো নয়। রাজা শশাঙ্কর আমলে বাংলার ধর্মমত ছিল শৈব। তখনও দুর্গার পুজো হত না। রাজা গোপালের পর থেকে গোটা পাল যুগে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্যের যুগে দুর্গা কেন, কোন মূর্তিপুজোরই চল ছিল না। তা সত্ত্বেও সুবচনী, মঙ্গলচণ্ডী, শীতলা, মনসা-র মত তথাকথিত অ-কুলীন বা গ্রামীণ দেবীরা সাধারণ মানুষের পুজো পেয়েছেন, মূর্তি ছাড়াই। কলকাতার পুজোর ইতিহাসেও দেখা যায় জগৎ শেঠ-উমি চাঁদ-ঘসেটি বেগম-মিরজাফরদের সহযোগিতায় ইংরেজরা সিরাজ-উদ-দৌলাকে পরাস্ত করায় ইংরেজদের 'মুন্সি' রাজা নবকৃষ্ণ দেব প্রথম জাঁকজমকের সঙ্গে দুর্গাপুজো করেন। এই রাজা নবকৃষ্ণ দেবের পুজোয় ইংরেজরা জুতো পরেই পুজো মণ্ডপে প্রবেশ করতেন। এই পুজো উপলক্ষে মদ ও বাঈজিদের আসর বসত, ফোর্ট উইলিয়াম থেকে কামান দাগা হত, ভাসানে আর্মি ব্যান্ড আসতো। দেশ প্রেমিক বিপ্লবীরা এই দুর্গাপূজোকে 'বেইমানের পুজো' আখ্যা দিয়েছিলেন। সেকালের বিত্তশালীদের বড়লোকি দেখাবার সবচেয়ে উপযুক্ত উপায় ছিল দুর্গোৎসব। কালীপ্রসন্ন সিংহ লিখেছেন, জোড়াসাঁকোর গন্ধবণিক শিবকৃষ্ণ দাঁ তাঁর প্রতিমার জন্য প্যারিস থেকে গয়না বানিয়ে এনেছিলেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির পুজোয় ব্যবহৃত সোনার অলংকার বিসর্জনের সময় গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হত। হুগলির জমিদার প্রাণকৃষ্ণ হালদার সেকালে সোনার প্রতিমা গড়ে পুজো দিতেন। শুধু তাই নয়, চার ফুটের সোনার প্রতিমা গঙ্গায় বিসর্জন দিতেন।

১৭৫৭ সালে ইংরেজ বণিকের 'মানদন্ড' দেখা দিল 'রাজদন্ড' রূপে। পরিণতিতে তৈরি হয় হঠাৎ ধনী হওয়া এক ধরনের বাবু শ্রেণী। ইংরেজ কর্মচারীদের সাথে ওই সব বিত্তবান ধনী শ্রেণীর অশুভ আঁতাত গড়ে উঠেছিল। সদ্য গজিয়ে ওঠা বিত্তশালী ও উচ্চাকাঙ্খী বর্ণবাদীদের আদর্শহীনতা, চারিত্রক শৈথিল্য, প্রকট পরধর্ম বিদ্বেষ এবং সেই সঙ্গে ইংরেজদের মুসলমান বিরোধী দ্বি-জাতি তত্ত্বের পটভূমিতেই সপ্তদশ শতক থেকে দুর্গাপুজো ক্রমশ বিস্তার লাভ করে। কলকাতায় ১৬১০ সালে প্রথম দুর্গাপুজো করেন সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার। তবে তাঁরও পূর্বে ১৬০৬ সালে নদীয়ার মহারাজা ভবানন্দ মজুমদারও দুর্গাপুজো করেছিলেন। তবে অষ্টাদশ খ্রিষ্টাব্দে হঠাৎ ধনী হওয়া চরম বিলাসী নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ১৭১০-১৭৪২)

শোভাবাজারের তালুকদার রাজা নবকৃষ্ণ দেবের দুর্গাপুজো ছিল চোখে পড়ার মত। বিমলচন্দ্র ঘোষের ''দুর্গাপুজো : সেকাল থেকে একাল'' গ্রন্থে লিখেছেন, 'রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রথম দুর্গাপুজো উপলক্ষে নাচ দেখানোর (বাইজি নাচ) ব্যবস্থাও করেছিলেন। নবকৃষ্ণ দেবও কম যান না। ১৭৫৭ সালে সিরাজদৌল্লার বিরুদ্ধে ইংরেজের জয়ে উল্লসিত হয়ে বিজয় উৎসব হিসেবে দুর্গোৎসব করেছিলেন। সেখানে ১০০১ টি পশুবলি হয়। বিভিন্ন দেশের নাচ ও অন্যান্য বিনোদনের ব্যবস্থা ছিল। এই দুর্গোৎসবে লর্ড ক্লাইভ নানারকম উপহার সামগ্রী পাঠিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ধনী পরিবারে দুর্গাপুজোর উৎসব প্রাঙ্গন ছিল ইংরেজ কর্মচারীদের সাথে এদেশের বাবু সম্প্রদায়ের অন্যতম মিলনস্থল। আন্দুলের রাজা রামচন্দ্র রায়, ভূকৈলাসের দেওয়ান গোকুল চন্দ্র ঘোষাল, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, ভূস্বামী গোবিন্দ রাম মিত্র, জোড়াসাঁকোর শিবকৃষ্ণ দাঁ প্রমুখ ধনী পরিবারের দুর্গোৎসবে বাইজি নাচ ও বেশ্যা সমাগমে ভরে থাকত। বিসর্জন উপলক্ষে চলত নানারকম কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি, গালিগালাজ ও বেশ্যাগমন। মহারাজ সুখময় রায়ের বাড়িতে দুর্গাপুজো সম্পর্কে ১৯৭২ সালের ১৫ সেপ্টেম্বরের Calcutta Chronicle এ প্রকাশিত বক্তব্য রমেশচন্দ্র মজুমদারের কলমে — The only novelty that rendered the entertainment different from last year was the indroduction or rather the attempt to introduce some English tunes among the Hindoostanee music.

সেকালের দুর্গাপূজোয় সকলের জন্য আমন্ত্রণ থাকলেও গরীব দুঃখী অসহায় মানুষজনের পুজোবাড়িতে প্রবেশের অনুমতি মিলত না। দু-এক জন প্রবেশ করলে তাদের অভ্যর্থনার বদলে জুটতো জুতো পেটা, গালি ও নানারকমভাবে অপমান। এমনকি কুমোর, ঢুলি, মালাকার ও অন্যান্য কারিগর যাদের পরিশ্রম ব্যতীত দুর্গাপুজো সম্ভব হত না, তারাও সম্মান পেতেন না। রাজা মহারাজা ও ধনী শ্রেণির পর দুর্গাপুজো ক্রমশঃ বারোয়ারী দুর্গাপূজোর রূপ নেয়। এক বারোয়ারি দুর্গাপুজো সম্পর্কে কালীপ্রসন্ন সিংহ লিখেছেন, ''চুরোট, তামাক ও চরসের ধুয়ায় এমনি অন্ধকার হয়ে উঠল যে, আধঘন্টা প্রতিমাখানি দেখা যায়নি। তিনি আরও বলেন, '.....সেই সঙ্গে কাঙ্গালী, ভাট ও ফকির জাতীয় মানুষও সেখানে ভীড় করতেন। কিন্তু পাহারাওয়ালারাই তাদের বিদায় দিতেন। অনেক গরীব মানুষ গ্রেপ্তার হত'। আবার কোথাও কোথাও 'কাঙ্গালী ও ভিক্ষুকের পুজোবাড়ি ঢোকা দূরে থাকুক, দরজা থেকে মশাগুলো পর্যন্ত ফিরে যাচ্ছে।' বারোয়ারি দুর্গাপুজোর সাথে যে সামাজিক গ্লানি জড়িত হয়ে পড়ে তা ১৮৮৭ সালের সোমপ্রকাশ পত্রিকা লক্ষ করলেই প্রকট হয়ে ওঠে — 'আজকাল বারোয়ারিতে বিশুদ্ধ

আমোদ লাভ করা যায় না। প্রায় মদ বেশ্যা ইত্যাদি লইয়া বারোয়ারির পান্ডাদিগের আমোদ-প্রমোদ হয়।.....বারোয়ারি পান্ডারা প্রায়ই নিষ্কর্মা। দেশের ভিতর তাহারা কেবল পরনিন্দা পরগ্লানি করিয়া দিনাতিপাত করে। ....চৌর্যবৃত্তিতে যাহারা অভ্যস্ত দেশে গ্রামে প্রায়ই যাহাদের অত্যাচারের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, এই প্রকার লোকেই বারোয়ারির গন্ধ পাইয়া নাচিয়া উঠে, পান্ডা সাজিয়া চাঁদা আদায়ের জন্য গ্রামের লোকের উপর উৎপীড়ন করে। .....বারোয়ারি নির্বোধ ও অপরিণামদর্শী ব্যক্তিদিগের উৎসন্ন যাইবার হেতু .....বারোয়ারি বালকগণের মাথা খাইবার সহজ উপায়।.... বারোয়ারিতে লোকেরা হলাহল পান করে আর তাহাদের চরিত্রের মাথা যায় ...মদ ও বেশ্যার কান্ডটা শহরেই কিছু বাড়াবাড়ি'। ষোড়শ শতকের জীমূতবাহন তাঁর 'কাল-বিবেক' গ্রন্থে লিখেছেন যে, বিসর্জনের সময় নানারকম কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি, নৃত্য-গীত ও মদ্য পান না করলে ভগবতী দুর্গা ক্রুদ্ধা হয়ে অভিশাপ দেবেন।

উনিশ শতকে রাজা-মহারাজা ধনী শ্রেণির দুর্গোৎসব, ও বারোয়ারি দুর্গোৎসবের পাশাপাশি পারিবারিক দুর্গাপুজোর সংখ্যাও বাড়তে থাকে। ১৮২৬ সালের ১২ অক্টোবর তারিখের Government Gazette পত্রিকায় প্রকাশ — 'বাবু গোপীমোহন দেবের বাড়িতে অনেক উচ্চ-পদস্থ সাহেব মেমের সমাগমে ভোজ ও মদ্যপান হইয়াছিল। মুসলমান বাঈজি ছাড়াও ব্রহ্মদেশীয় কয়েকটি নর্তকী ও গায়িকার আমদানি করা হইয়াছিল'। ১৮২৭ সালের ২০ সেপ্টেম্বর চুঁচুড়ার প্রাণকৃষ্ণ হালদার Government Gazette পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়েছিলেন — 'যাঁরা নিমন্ত্রণ পত্র পেয়েছেন এবং যাঁরা পাননি সকলেই যেন তার বাড়িতে ২৭ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত দুর্গাপূজো উপলক্ষে বিশাল নৃত্যোৎসবে (Grand Nauch) ওযোগদান করেন।' এই বিজ্ঞাপনে নারী-পুরুষ সকলের জন্যই সুরাপানের উত্তম ব্যবস্থা থাকবে বলে আশ্বস্ত করা হয়। একথা অপ্রিয় হলেও সত্য যে, সে সময়ের পারিবারিক দুর্গোৎসব প্রধানত হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিত্তবান বাবুদের ধন-ঐশ্বর্য প্রদর্শনের এবং মদ ও নারীসঙ্গ সমেত এক বিরাট বিনোদনের মাধ্যম।

বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভোগবাদী কর্মবিমুখ মানুষেরা চরম অসভ্যতা ও নোংরামির মধ্য দিয়ে দুর্গাপুজো প্রচলন করেন। যে ধারা পরবর্তীকালে সাধারণ মানুষও বহন করে চলে। বাংলার সঙ্গে দুর্গাপুজোর প্রাচীনত্ব নিয়ে আদর্শ নিয়ে বিনোদন নিয়ে কোনকালে কোন সম্পর্ক ছিল না, সেই দুর্গাপুজো হল গোটা বাঙালির প্রায় জাতীয় উৎসব। এ উৎসব হাস্যকর ও লজ্জাকরও বটে যখন দেখি সমাজে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত বলে দাবিদার ব্যক্তিবর্গ নতুন পোষাক পরে সপরিবারে মাটির প্রলেপের গড়া মূর্তির

পিছনে বাঁশ ঢুকিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে তার সামনে করজোড়ে 'রূপ দাও, যশ দাও, বিদ্যা দাও....' বলে প্রার্থনা করেন। একদিকে হাজার হাজার গরিব সাধারণ মানুষের অনাহারে মৃত্যুবরণ, অন্যদিকে তেমনি ধনী শিক্ষিত সমাজের দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে বেলেল্লাপনা। ১৮৮০ সাল থেকে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের স্বার্থে মিশনারিরা এই দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। শেষমেশ ১৮৮০ সালে এই দুর্গোৎসবে ইংরেজ কর্মচারীদের যোগদান আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ১৮৬২ সালে ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় দুর্গোৎসব সম্বন্ধে নিন্দাসূচক একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশিত হয় — '....দুর্গোৎসবের সময় আমোদ-প্রমোদ, অত্যাচার ও উন্মত্ততার সময়। ....ঈশ্বর উপাসনার ভাব কিছুই নাই....দুর্গোৎসবের উদ্যোগে অমঙ্গল, উৎসবের সময় অমঙ্গল দ্বারা প্রতি বৎসর এই সময় বঙ্গভূমি পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। .....পুজোর তিন দিন পাপের স্রোত বহিতে থাকে।' দুই প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তি, সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেন যে এহেন দুর্গাকে সামাজিক মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা প্রাণপণ করলেন তা একমাত্র তাঁরাই জানেন। শারদোৎসব ঘিরে বাঙালির উন্মাদনার শেষ নেই। দেবী দুর্গার অসুর সম্রাট মহাসুর বা মহিষাসুরকে বধ করার দৃশ্য বা দুর্গাপুজো ঘিরে আপামর বাঙালি আনন্দ উৎসবে যখন মাতোয়ারা ঠিক তখনই বিষাদে ছেয়ে যায় ঝাড়খণ্ড-ছত্তিশগড়-বিন্ধ্যপর্বতের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের মত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বহুগ্রাম। ওই সব গ্রামে আলোর রোশনাই নেই। নেই নতুন জামা-কাপড় পরে মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে ঠাকুর দেখার ঢল। পুজো-পার্বনের এই কটা দিন এইসব গ্রামের মানুষগুলো নিজেদের ডুবিয়ে রাখেন অন্ধকারের আড়ালে। ঘরে ঘরে জ্বলে না সন্ধ্যাপ্রদীপ। বাজে না মঙ্গল শঙ্খ। গোটা দেবীপক্ষ জুড়েই চলে এদের শোকপালন। কারণ ওঁরা যে অসুর। ষোড়শ শতাব্দীর পর ঝাড়খণ্ডি নামে পরিচিত যে সুবিশাল ভূমিখণ্ডের কথা জানি তা আজকের পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার ও বীরভূম এবং ওড়িশা রাজ্যের ময়ুরভঞ্জ, কেওঞ্ঝোর, সুন্দরগড়, বোনাই, বামরা এবং আজকের ঝাড়খণ্ড প্রদেশ। একসময় শবরভূমি নামে পরিচিত এই অঞ্চল ছিল মূলত কোল জাতিসত্তার মানুষের বাসভূমি। বিচরণ ভূমি বলাই সঠিক। কেননা, এইসব অঞ্চলের মানুষেরা প্রকৃতিপ্রিয় রোমান্টিক জীবনযাপন করতেন। প্রকৃতির ফলমূল সংগ্রহ ও বন্য পশুশিকারই ছিল তাদের প্রধান পেশা। বেদ ব্রাহ্মণ্য প্রভাব তাদের জীবনে কখনও পড়েনি। আজও বহুল প্রচারিত একটি প্রবাদ শোনা যায় — 'কোলকুড়মি-কোড়া, বেদ-পুরাণ ছাড়া অর্থাৎ এইসকল অঞ্চলের সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, বেদিয়া, ভূমিজ, কোলকুড়মি,

কোড়া প্রভৃতি গোষ্ঠীর মানুষেরা ব্রাহ্মণ্য বেদ-পুরাণ দ্বারা নির্ধারিত জীবনযাত্রা আজও অনুসরণ করেন না।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা মহকুমা থেকে উত্তর দিকে ১২ কিলোমিটার ভেতরে শুকানুকুটি প্রত্যন্ত একটি আদিবাসী গ্রাম। ২২টি পরিবার বাস করে গ্রামটিতে। জনসংখ্যা ১৫৫ জন। বসবাসকীরী সকলেরই পদবি 'অসুর'। আশপাশ অঞ্চলের মানুষের কাছে গ্রামটি অসুরগ্রাম নামে পরিচিত। তাঁরা বিশ্বাস করেন তাদেরই পূর্বপুরুষ মহিষাসুরকে হত্যা করেছিলেন পারসিক কন্যা দুর্গা। তাই দুর্গাপুজোয় তাঁরা অংশগ্রহণ করেন না। এমন কি দেবী দুর্গার মুখও তাঁরা দেখেন না। পশ্চিমবঙ্গে সক্রিয় আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদার অধিকার আদায়ের আন্দোলনে জড়িত অনেক মানুষই দুর্গাপুজোর কয়েকদিন কালো কাপড়ের টুকরো বুকে লাগিয়ে শোক প্রকাশ করেন।

শুকানুকুটি গ্রামের মানুষেরা পৌরাণিক ঘটনা ভুলে যদিও বা শারদোৎসবে মেতে উঠতে চায়, সভ্য সমাজ সেখানে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সমাজ ওদের অচ্ছ্যুৎ করে রেখেছে। ভোটদানে অংশগ্রহণের অধিকার থাকলেও অধিকার নেই শিক্ষার, অধিকার নেই কোন সামাজিক অনুষ্ঠানের শরিক হওয়ার। মহিষাসুর বংশোদ্ভূত বলে পরিচিত এই আদিবাসী অসুর সম্প্রদায়কে আজও ব্রাত্যই করে রেখেছে এ যুগের শিক্ষিত সভ্য মানুষেরা।

বেনু অসুর, মোটা অসুর, বুলা অসুর, মালু অসুর শুধু নয় গোটা সুকানুকুটি গ্রামের সহজ সরল এই সব মানুষদের কাছে শারদোৎসব খুব কষ্টদায়ক। মহালয়া থেকেই ওদের শোকপালন। পুজোর সময় যখন ঢাকের আওয়াজে চারিদিক মুখরিত, তখন এই অসুর সম্প্রদায়ের বাড়ির বারান্দা থেকে গ্রামের বাতাসে ভেসে বেড়ায় করুণ কান্নার শব্দ। দেবী দুর্গা যখন অসুরকে হত্যা করেন সেই অষ্টমী-নবমীর সন্ধিক্ষণে ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসীদের মত শুকানুকুটি গ্রামের অসুর সম্প্রদায়ের মানুষেরা বুক চাপড়ে কাঁদেন। এই কান্না কাউকে শোনানোর জন্য নয়। কারও সহানুভূতি পাওয়ার জন্যও নয়। এ কান্না স্বজন হারানোর যন্ত্রণা। কেউ বুঝুক আর না বুঝুক এ কান্নার অর্থ সমাজের লাঞ্ছনার, গঞ্জনার জন্য দীর্ঘকাল মনের কোণে জমে থাকা বেদনার বহিঃপ্রকাশ।

ভারত যখন মুসলমান শাসক দ্বারা শাসিত, তার পূর্ব পর্যন্ত কঠোর ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে এইসব মানুষেরা প্রতিরোধ গড়ে নিজস্ব জাতি সত্তা অনেকটাই ধরে রেখেছিলেন। কিন্তু ইসলাম শাসনের সময়ে নানা কারণে দলে দলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বহু মানুষ

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। এই সময় বৈষ্ণববাদীদের প্রভাবে সমগ্র কোল এবং খেরোয়াল জাতিসত্তার মানুষেরা হিন্দু স্তরভেদের জালে জড়িয়ে পড়লেন। জন্ম নিল পেশাভিত্তিক গোষ্ঠীচেতনা। গোণ্ড, গৌর, মুন্ডা, পাহাড়িয়া, ভুঁইয়া, ভূমিজ, হো শবর, সাঁওতাল, অসুর, কুড়মি, বেদিয়া, কামার, কুম্ভার যাদুপেটিয়া, রাজোয়ার, লোধা, চিকবড়াইক, তাঁতি ইত্যাদি তার উদাহরণ। ফলে জঙ্গলকেন্দ্রিক যৌথ জীবন ভাবনার , যৌথ সংস্কৃতির প্রতীক কোল গোষ্ঠীর মানুষেরা টুকরো টুকরো হয়েগেলেন। কোল শব্দের অর্থেরও বদল ঘটেছে। সুবিখ্যাত নৃতত্ব বিজ্ঞানী শরৎচন্দ্র রায় তাঁর মুন্ডাজ অ্যাণ্ড দেয়ার কান্ট্রি গ্রন্থে কোল শব্দের অর্থ বলেছেন — 'শুয়োরের মত দেখতে কালো শুয়োর খাদক'। এমন নামকরণ নিশ্চয়ই এই জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয় নয়। এঁদের যাঁরা হেয় করতে চান, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা সেই মানুষরাই নিশ্চয় এই নামকরণের মূলে!

প্রায় সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষই যুগ যুগ ধরে অমানবিক লাঞ্ছনা বঞ্চনা নিয়ে বেঁচে আছেন। অথচ গোটা মানব জাতি এঁদের সাম্য-মৈত্রী ভাবনা থেকে শিক্ষা নিতে পারেন।

ভারত ও ভারতের বাইরে বিভিন্ন কাহিনি উপ-কাহিনিতে মহিষাসুর বধের মূল বয়ান এরূপ : রম্ভ আর কারম্ভ কোল জাতির দুই বীর মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজা ছিলেন। কারম্ভ জলযুদ্ধে পারদর্শী ছিলেন আর রম্ভ জল-স্থল ও শূন্যে সমান যোদ্ধা ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র কুমীরের রূপ ধারণ করে কৌশলে কারম্ভকে হত্যা করেন। ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে রম্ভ আর্যদস্যুদের রাজ্য আক্রমণ করেন। দেবতারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। শেষমেশ আশ্রম কর্তা ব্রহ্মার প্রচেষ্টায় রম্ভ ও দেবরাজ ইন্দ্র সন্ধি করেন। ইন্দ্রের সন্ধি করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। কারণ মহারাজ রম্ভর কাছে দেবরাজ ইন্দ্র বার বার হেরেছেন —

''তত্রসুরৈর্মহাবীর্যৈদেবসৈন্যং পরাজিতমর্দেতম।

জিত্বা চ সকলান দেবানিদ্রোহভমহিসাসুরঃ।''

তবু সুযোগ পেলে আর্যদস্যুরা বারবার রম্ভর রাজ্য আক্রমণ করতেন। এই মহারাজ রম্ভ ও রানি তেজার পুত্র মহিষাসুর। মহিষাসুরের যখন আট-দশ বছর বয়স, তখন তার পিতৃরাজ্য সুর বা স্বঘোষিত দেবসেনারা অতর্কিত আক্রমণ করেন। যুদ্ধে একে একে মহারাজ রম্ভ সহ রাজ পরিবারের প্রায় সকলেই মারা যান। যে

কয়জন বেঁচে ছিলেন তাঁরা রম্ভর বালক পুত্রকে নিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যান।

জঙ্গলে বাড়তে থাকা বালকের প্রধান বাহন ছিল মহিষ। মহিষ জঙ্গলবাসী মানুষজনের কাছে দেবতাও বিশেষ। মহিষ জঙ্গলের অন্যতম শক্তিশালী জীবও বটে। ব্রাহ্মণ্য স্বার্থবাহী ধর্মশাস্ত্রকার মহিষাসুরের জীবন সংগ্রামের অপব্যাখ্যা দিয়েছেন। অসুর শব্দের আভিধানিক অর্থ হল দেবশত্রু মহাবল জাতি বিশেষ। বেদের প্রাচীনতর অংশে এবং পারসিক আবেস্তায় অসুর-অহুর -দেবতা। যারা মূলত নগর সভ্যতার সাম্যবাদী নাগরিক। এদেশ আক্রমণের পর থেকে যাযাবর আর্যরা এদেশীয় লোভী বিভীষণদের সঙ্গে নিয়ে দেবতা শব্দটি দখল করে এবং ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে তুক্-তাক্ ও নানারকম কুসংস্কার প্রয়োগ করে নিজেরা দেবতা সেজে বসে। যুগ যুগ ধরে অলীক কল্পকাহিনী জনমানসে প্রচার করেন। যদিও কাহিনিগুলির রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাস্তব সত্য লুকিয়ে থাকে। পিতৃরাজ্য উদ্ধার করার জন্য মহিষাসুর জঙ্গলেই যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী হন। ক্রমশ শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করে একে একে তাঁর সমস্ত হারানো পিতৃরাজ্য জয় করেন। এমনকি, আর্য বা দেবতাদের স্বর্গরাজ্যও দখল করে। স্বর্গরাজ্য বলতে আর্য অধিকৃত অঞ্চল। মুলত জম্মু-কাশ্মীর সহ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল। একটা সময়ে সরস্বতী নদীর অববাহিকাও দেবতা বা আর্যদের দখলে ছিল। মহিষাসুরের কাছে হেরে গিয়ে আর্য বা দেবতারা প্রাণভয়ে পালিয়ে মধ্যে এশিয়ার দিকে সরে যেতে থাকে। পথে ক্লান্ত দেবতারা বর্তমান ইরান ইরাক অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। তখনকার দিনে মধ্য ও উত্তর এশিয়ার বেশিরভাগ জায়গা ছিল যাযাবর জাতির বিচরণ ক্ষেত্র। পরবর্তী সময়ে এই সকল স্থান আশ্রমভিত্তিক রূপ নেয়। দেবসেনাদের অসহায় অবস্থা দেখে সেখানকার আশ্রম অধিকর্তা তাঁদের এই বলে আশ্বাস দান করেন যে, ভারতীয় ভৌগলিক অবস্থানে বসবাসকারী ভারতীয়গণ শত্রুবিহীন অবস্থায় অলস ও আমোদ-প্রমোদ বিলাসী হয়ে পড়েন। মহিষাসুর এখন শত্রু বিহীন। সুতরাং সে এখন অলস ও বিলাসপ্রিয়।

শস্য শ্যামল নদী মাতৃক গ্রাম গঞ্জের সাধারণ মানুষ তিন মাস কাজ করেন আর নমাস উৎসব মেলা ও পুজো পার্বনে কাটিয়ে দেয়। এই চিত্র শুধু বঙ্গদেশে নয়, গোটা উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম বা মধ্য ভারতের সর্বত্রই একই দৃশ্য। বিশেষ করে নদ-নদী বিধৌত সমভূমি অঞ্চলে, যেখানে শস্য উৎপাদন হয়। ভৌগলিক অবস্থান বিশেষ করে উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বে বঙ্গোপসাগর ও পশ্চিম

আরব সাগর, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে ভারতবর্ষকে বারবার রক্ষা করছে। ফলে ইউরোপের মত বিরামহীন যুদ্ধ, গণহত্যা, লুণ্ঠন, এদেশের সহজ সরল মানুষদের স্পর্শ করতে পারেনি। তার ওপর ঋতু বৈচিত্র, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, চাহিদার চাইতে খাদ্যের যোগান বেশি থাকায় এখানকার প্রাচীন অসুর সভ্যতার মানুষ যেমন আরামপ্রিয় তেমনি সাম্যবাদী এবং মানবিক। এই সুযোগটা নেয় বিভিন্ন সময়ে আগত যাযাবর জাতিগুলি। যাদের মধ্যে অন্যতম হল নর্ডিক বা আর্যভাষীরা। এদেশের সু-উন্নত নগর সভ্যতার ধ্বংস ঘটিয়ে গেড়ে বসে ভারতভূমিতে তৎকালীন সিন্ধু অঞ্চলে। বলা যায়, যাযাবর আর্যরা মেহেরগড়-হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়ো তথা সিন্ধু সভ্যতাকে ধূলিসাৎ করে ভারত সভ্যতাকে বহু বছর পিছিয়ে নিয়ে যায়। আর্যরা এদেশে নিজেদের দেবতা বলে প্রচার করে। শুধু তাই নয় জনমানসে তাদেরকে সর্বশক্তিমান ও ঈশ্বরের উত্তরসূরী বলে দাবি করে। আর এদেশের উন্নত মানবিক মতাদর্শে বিশ্বাসী মানুষজনদের দৈত্য-দানব-রাক্ষস-খোক্কস দাস-দস্যু প্রভৃতি নামে প্রচার করে।

শেষমেশ গোষ্ঠীরা আশ্রম অধিকর্তার (ব্রহ্মা!) পরিকল্পনায় একদল নর্তকীকে যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী করে সঙ্গে আরও কিছু কৌশলী ঘাতক সেনাদের নারী সাজিয়ে মহিষাসুরের রাজসভায় পাঠান হয়। নৃত্য-গীতে পারদর্শী নারীগণ দেবতাদের শত্রু মহান অসুর সম্রাট মহিষাসুরকে হত্যা করার জন্য কমপক্ষে তের দফার এক শর্তে চুক্তিবদ্ধ হন, যার মধ্যে অন্যতম চুক্তি হল যাযাবর আর্য কর্তৃক নারীর অবমাননা, লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি যা সেকালের যাযাবর আর্যদের মধ্যে ছিল না। ছিল না আশ্রমভিত্তিক গোষ্ঠীপতিদের সমাজ ব্যবস্থায়। মাতৃপ্রধান সমাজ ব্যবস্থা ছাড়া আর কোন সভ্যতায় নারীর সামান্যতম সম্মান বা স্বাধীনতা ছিল না। পুরষের আজ্ঞাবহ ও মানোরঞ্জনের জন্যই নারীর জন্ম, এই বিশ্বাসই ছিল প্রবল। আজও ব্রাহ্মণ্য ধর্মে নারীর অবস্থানের তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। নারী বাল্যে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন আর বৃদ্ধকালে পুত্রের অধীন।

শর্তানুযায়ী ওই সকল নৃত্য-গীত পারদর্শী নারীগণ সোমরসে বিষাক্ত কিছু মিশিয়ে দেয় যা খেয়ে মহিষাসুরের বীর সেনারা অচৈতন্য হয়ে পড়েন। একে একে তাঁদের হত্যা করেন নারী বেশধারী যাযাবর দেবসেনারা। আর শরী মর্দনের পর মহিষাসুর যখন ভূতলে লুটিয়ে পড়েন তখনই প্রধান নর্তকী তার কটিদেশে লুকানো ধারাল অস্ত্র দিয়ে মহিষাসুরকে হত্যা করেন। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যাযাবর

দেবসেনাদল মহিষাসুরের রাজভবন আক্রমণ করে। দেবসেনাদের দ্বার চলতেথাকে লুণ্ঠন, অত্যাচার ও গণহত্যা। দেশ বা দুর্গ রক্ষাকারীদের হত্য াকরেছিলেন বলে ওই মূল নর্তকীর নাম হয় দুর্গা। পরাজিত ভারতীয় দুর্গ বা দেশ রক্ষকগণকে আর্যরা রাক্ষস বলে অভিহিত করত। পরবর্তীকালে হিন্দু শাস্ত্রকারেরা তাদের কাব্য সাহিত্যে রক্ষস শব্দের র বর্ণের পর একটি 'া' যোগ করে রাক্ষস বলে লিপিবদ্ধ করেন। হিন্দু শাস্ত্রকারদের কাছে রাক্ষস শব্দ হীন-অবজ্ঞা ও ঘৃণঅসুচক। যাযাবর আয়দের যে দল সিন্ধু অঞ্চলে বিজয়ী হয়েছিল তাদের সঙ্গে কোন নারী ছিল না। এদেশের নারীদের জোর করে ধরে নিয়ে যেত সন্তান উৎপাদন করতে। সেই কারণে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে নারী মাত্রই শূদ্রাণী। সে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মালেও শূদ্রাণী। ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মালেও শূদ্রাণী। নারীর তাই পৈতে ধারণ বা দ্বিজ হওয়ার প্রথা নেই। সে মসময় যাযাবর সমাজে নারী কোন মান-মর্যাদা-সম্মান ছিল না। তথাকথিত বেশ্যা বা পতিতাবৃত্তি ছিল আর্যসমাজের বেশিরভাগ নারীর জীবিকা

আর্যসমাজে বহুগামিতা এবং বহুভর্তৃকত্ব অর্থাৎ বাছবিচারহীন যৌন সম্ভোগের ঘটনার একাধিক উল্লেখ রয়েছে। আর্যদের নিয়োগ প্রথার মাধ্যমে একজন বিবাহিত মহিলা স্বামী ছাড়া অন্য াকন পুরুষ দ্বারা বংশধারণের জন্য তাঁর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করাতে পারতেন। এই প্রথায় অবাধ যৌন সম্ভোগ চলেছিল যেহেতু তার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। প্রথম একজন মহিলার ক্ষেত্রে নিয়োগের সংখ্যার কোন বিধিনিষেধ ছিল না। মধুতির ক্ষেত্রে একটি নিয়োগ অনুমোদিত হয়েছিল। অম্বিকার ক্ষেত্রে বাস্তবে একটি নিয়োগ হয়েছিল এবং আর একটি ক্ষেত্রে প্রস্তাব এসেছিল। শরদানদায়িনীর তিনটি নিয়োগ হয়। পাণ্ডু তাঁর স্ত্রী কুন্তীকে চারটি নিয়োগের অনুমতি দিয়েছিলেন। ব্যুসিস্তশ্বাকে সাতটি নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল; যে ক্ষেত্রে স্বামীর সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন অক্ষমতা ছিল না সেক্ষেত্রেও নিয়োগ হত। কোন পুরুষকে নিয়োগ করা হবে তা পছন্দ করতেন মহিলাই। এ ব্যাপারে কার সঙ্গে তিনি নিয়োগে যুক্ত হবেন তা খুঁজে নেবার জন্য এবং একজন্য পুরুষকেই নিয়োগের জন্য নির্বাচন করলে কতবার তার সঙ্গে নিয়োগ যুক্ত হবেন, সে সম্বন্ধে মহিলারা স্বাধীন ছিলেন। নিয়োগ ছিল পুরুষ ও মহিলার তৎকালীন আর্যসমাজের বৈধ সঙ্গমের আর এক নাম যেটি এক রাত্রের জন্যও হতে পারে আবার বারো বছর বা তার বেশি সময়ের জন্যও হতে পারে।

তৃতীয় জন্মেজয়ের পুরোহতি বেদের শিষ্য হলেন উতঙ্ক। বেদের স্ত্রী উতঙ্ককে

অত্যন্ত শান্তভাবে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর স্বামীর স্থান নিতে এবং কর্তব্য পালনের দোহাইতে তার সন্নিধ্যে আসতে। আর একটি দৃষ্টান্ত এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। সেটি উদ্দলাকের স্ত্রীর। তাঁর অন্য ব্রাহ্মণদের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে অবাধ স্বাধীনতা ছিল , সে নিজের আগ্রহেই হোক বা কারোর আমন্ত্রণে সাড়া দিতেই হোক। তাঁর স্বমীর এক শিষ্যের দ্বারা তাঁর এক সন্তান হল শ্বেতকেতু। জটিলা গৌতমী ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ মহিলা, যাঁর সাতজন্য স্বামী ছিলেন যারা ছিলেন ঋষি। মহাভারত বলে যে নাগরিকদের স্ত্রীরা দ্রৌপদীর প্রশংসা করতেন পঞ্চ স্বামীর সঙ্গে ঘর করার জন্য এবং তাঁর সঙ্গে জটিলা গৌতমী এবং তাঁ সাত স্বামীর তুলনা করতেন। মমতা উতথের স্ত্রী। কিন্তু উতথের জীবনকালে তাঁর ভ্রাতা বৃহস্পতির মমতার কাছে অবাধ যাতায়াত ছিল। মমতার পক্ষ থেকে তার প্রতি আপত্রি একবারই উঠেছিল যখন মমতা অন্তঃসত্তা হওয়ার কারণে তাঁকে অপেক্ষা করতে বলেন। কিন্তু তিনি একথা বলেন নি যে বৃহস্পতির তাঁর প্রতি আবেদন বেঠিক বা বেআইনি ছিল।

বিভাণ্ডক ঋষি, মহাভারতের বনপর্বের ১০০ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, একটি হরিণীর সঙ্গে সহবাস করেন এবং সেই হরিণী তাঁর পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। সে পুত্র পরবর্তীকালে ঋষ্যশৃঙ্গ বলে পরিচিত হন। মহাভারতের আদি পর্বের ১ এবং ১১৮ অধ্যায়ে পাণ্ডবদের পিতা পাণ্ডু কিভাবে দম নামে ঋষির অভিশাপগ্রস্ত হয়েছিলেন তার বিবরণ আছে। ব্যাস বলছেন যে ঋষি একবার জঙ্গলে একটি হরিণীর সঙ্গে সঙ্গমে আবদ্ধ ছিলেন। যখন এভাবে তিনি যুক্ত ছিলেন তখন পাণ্ডু সঙ্গম ফুরিয়ে যাবার আগেই ঋষিকে তীরবিদ্ধ করেন। আর্য ঋষিদের আর একটি জঘন্য প্রথা ছিলযে, তাঁর প্রকাশ্যে এবং জনসাধারণের দৃষ্টির সামনে মহিলাদের সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হতেন। মহাভারতের আদি পর্বের ৬৩ অধায়ে কেমন করে ঋষি পরাশর ধীবর কন্যা সত্যবতী ওরফে মৎস্যগন্ধার সঙ্গে যৌনসঙ্গম করেছিলেন তার বিবরণ আছে। ব্যাস বলছেন যে, ঋষি প্রকাশ্যে এবং জনসমক্ষে সত্যবতীর সঙ্গে সহবাস করেছিলেন। আর একটি অনুরূপ ঘটনা পাওয়া যায় আদিপর্বের ১০৪ অধ্যায়ে। সেখানে বলা হয়েছে যে ঋষি দীর্ঘতম জনসাধারণের দৃষ্টির সামনে একজন মহিলার সঙ্গে সহবাস করেছিলেন। এরকম অনেক দৃষ্টান্ত মহাভারতে উল্লিখিত আছে। অধিকাংশ হিন্দুই জানেন যে সীতা , দ্রৌপদী এবং অন্যান্য যশস্বী মহিলারা উল্লেখযোগ্য অযোনিজ। অযোনিজ বলতে বোঝায় একটি শিশু, যে মানবের তথাকথিত আদিমতম পাপ ছাড়াই জন্মেছে। তবে ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিক

থেকে অযোনি শব্দের এরক অর্থ নিশ্চয় করে বলা যায় না। যোনি শব্দটির মূল অর্থ হল গৃহ। যোনিজ শব্দের অর্থ একটি শিশু যে গৃহে জন্মেছে বা গর্ভজাত হয়েছে। অযোনিজ শব্দের অর্থ একটি শিশু যে গৃহের বাহিরে জন্মেছ বা গর্ভজাত হয়েছে। অযোনিজ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুযায়ী হয় সীতা, দ্রৌপদী প্রভৃতি নারীরা প্রকাশ্যে জনসমক্ষে যৌনসঙ্গমের ফসল।

ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রতীয়মান হয় যে যখন কোন ঋষি যজ্ঞ সম্পাদনের কাজে নিযুক্ত থাকবেন তখন কোন মহিলা যদি সেই ঋষির সঙ্গে যৌনসঙ্গমের ইচ্ছা প্রাকশ করেন তাহলে সেই ঋষি তৎক্ষণাৎ যজ্ঞ সম্পন্ন হওয়ার অপেক্ষা না করে এবং কোন নির্জন স্থানে যাওয়ার জন্য কালক্ষেপ না করে সেই যজ্ঞ মণ্ডপেই জনসমক্ষে সেই মহিলার সঙ্গে যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হবেন। ঋষিদের এই কাজটিকে বামদেব ব্রত বা বাম-মার্গ বলা হয়।

আর্যদের বাসনা ছিল ভাল বংশধর পাওয়ার। এই ইচ্ছা তারা পূরণ করত তাদের স্ত্রীদের অধিকাংশ সময়. ঋষিদের কাছে পাঠিয়ে। এই ধরনের কাজে যে সব ঋষি নিযুক্ত ছিলেন তাঁরা সংখ্যায় প্রচুর। এমন কি রাজারাও তাঁদের অনুরোধ করতেন রানিদের গর্ভবতী করার জন্য। দেবতাদের দেব যে একটি সম্প্রদায়ের নাম সেকথা প্রশ্নে উর্ধ্বে। রাক্ষস, দৈত্য, দানব ইত্যাদি নামগুলিও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের। দেবতারা ছিনেল একটি শক্তিশালী এবং লম্পট সম্প্রদায়। তাঁর ঋষিদের স্ত্রীগণকেও উৎপীড়ন করতেন। ইন্দ্র কিভাবে ঋষি গৌতমের স্ত্রী অহল্যাকে বলাৎকার করেছিলেন সে কাহিনি সুপরিচিত। কিন্তু যে নীতি বিগর্হিত কাজ তাঁরা আর্য রমণীদের উপর চাপিয়েছিলেন তা অবর্ণনীয়। দেবগণ সম্প্রদায় হিসেবে মনে হয় অন্যান্য আর্য সম্প্রদায়ের উপর অতি প্রভুত্ব স্থাপন করেছিনেল খুব প্রাচীন কালেই। এই অতি প্রভুত্ব আর্য রমণীদের পতিতায় পরিণত করেছিল দেবতাগণের কামলালসা পরিতৃপ্ত করার জন্য। আর্যরা গর্ব অনুভব করতেন যদি তাদের স্ত্রীরা দেবগণের রক্ষিতা হতেন এবং তাঁদের দ্বারা গর্ভবতী হতেন। মহাভারত এবং হরিবংশে ইন্দ্র, যম, সাত্য, অগ্নি, বায়ু, এবংঅন্যান্য দেবগণের ঔরসজাত আর্যরমণীদের সন্তানের এত উল্লেখ আছে যে যে কেউ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যাবেন এই দেখে যে কি পরিমাণে ঐ ধরনের অবৈধ সঙ্গম দেবগণ এবং আর্য রমণীদের মধ্যে চলেছিল।

দেবগণ আর্য রমণীদের ভোগ করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ছিলেন। এটি খুব

প্রাচীনকালেই নিয়মের অন্তর্গত হয়েছিল। ঋগ্বেদের ১০/৮৫/৪০ -এ উল্লেখ রয়েছে একজন আর্য রমণীর উপর প্রথম অধিকার সোমের দ্বিতীয় গন্ধর্বের তৃতীয় অগ্নির এবং শেষে আর্যদের. প্রতিটি আর্য রমণীকে কোন না কোন দেবের কাছে বন্ধক রাখা হয়েছিল যে দেবগণের অধিকার ছিল রজঃদর্শনারম্ভে প্রথম তাকে ভোগ করা। রমণীর কোন আর্যের সঙ্গে বিবাহের আগে তাকে পুনরুদ্ধার করতে হত দেবগণকে যথাযথ প্যানা দিয়ে মিটিয়ে। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের সপ্তম খণ্ডিকাতে যে বিবাহ উৎসবের বিবরণ দেওয়া হয়েছে সেই বিবাহে তিনজন দেব উপস্থিত ছিলেন। আর্যমান, বরুণ এবং পূষণ। অবশ্যই তাঁদের অধিকার ছিল, পাত্রীর উপর প্রথম যে কাজটি পাত্র করে তা হল সে পাত্রীকে একটি পাথরের ফলকের কাছে আনে এবং তাকে পাথরের উপরে দাঁড় করিয়ে বলে এই পাথরের উপর পদস্থাপন কর এবং পাথরের মত শক্ত হও। শত্রুদের জয় কর; শত্রুদের উপর পদস্থাপন কর। এর অর্থ তিন দেবগণ যাঁদের শত্রু বলে মনে করতেন তাদের দৈহিক নিয়ন্ত্রণ থেকে পাত্রীকে মুক্ত করা। অন্য দেবগণ ক্রুদ্ধ হন এবং কন্যার দিকে অগ্রসর হন। পাত্রের ভ্রাতা মধ্যস্থতা করেন এবং চেষ্টা করেন বিবাদ মিটিয়ে দিতে। তিনি দেবতাদের ছোলা দিতে চান কন্যার উপর দেবগণের অধিকার ক্রয় করার জন্য। সেই ভ্রাতা তখন কন্যাকে হাত পাতলে বলেন। তিনি যখন কন্যার হাতে ভর্জিত ছোলা দিয়ে ভর্তি করেন এবং তাতে শোধন করা মাখন ঢালেন ও পাত্রীকে বলেন, সেটি প্রতি দেবের উদ্দেশে তিনবার করে নিবেদন করতে। এই নিবেদনকে বলা হয় াবদান। তার ভ্রাতা একটি বিবৃতি দেন যেটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, এই কন্যা অগ্নির মাধ্যমে আর্যমান দেবকে এই অবদান নিবেদন করেছেন। অতএব আর্যমান এক কন্যার উপর তার অধিকার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করবেন এবং পাত্রের অধিকারে বাধা দেবেন না। অন্য দুই দেবগণের উদ্দেশে পাত্রী বৃথক অবদান করেন এবং তাদের ক্ষেত্রেও তাঁর ভ্রাতা একই বিধিতে পরিবর্তন করেন। াবদানের পর অগ্নিকে ঘিরে প্রদক্ষিণ হয় যাকে সপ্তপদী বলা হয় এবং এরপর পাত্র পাত্রীর মধ্যে বিবাহ সম্পূর্ণ বৈধ ও শুভ হয়।

আইনজ্ঞরা জানেন যে সপ্তপদী হচ্ছে হিন্দু বিবাহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান এবং এটি ব্যতীত আইনত কোন হিন্দু বিবাহ-ই হয় না। কিন্তু খুব কম লোকই জানে যে, কেন সপ্তপীদ এত গুরুত্বপূর্ণ। কারণটি খুবই স্পষ্ট। এটি একটি পরীক্ষা যে, যে দেব, যার অধিকার ছিল পাত্রীর উপর, তিনি অবদান দ্বারা সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তিনি পাত্রীকে মুক্তি দিতে প্রস্তুত। যদি দেব পাত্রকে অনুমতি দিতেন সপ্তপদীর

অন্তর্ভুক্ত দূরত্বে পাত্রীকে নিয়ে যেতে তাহলে এটি প্রমাণ হত যে দেব ক্ষতিপূরণে সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং কন্যার উপর তাঁর অধিকার ত্যাগ করেছেন। এবং কন্যা আর একজনের স্ত্রী হবার জন্য মুক্ত হয়েছেন। সপ্তপদীর অন্য কোন অর্থ থাকতে পারে না। সপ্তপদীর আবশ্যিকতা দেখায় দেব এবং আর্যগণের মধ্যে এই ধরনের বাধ্যতা সর্বজনীনভাবে বিরাজমান ছিল।

কৃষ্ম ছিলেন বৃষ্ণি (যাদব পরিবার) ভুক্ত। যাদবরা ছিলেন বহুগামী। যাদব রাজাদের সম্বন্ধে জানা যায় যে, তাঁদের অসংখ্য স্ত্রী ও পুত্র ছিল — যে কলঙ্ক থেকে কৃষ্ণ নিজেও মুকত ছিলেন না। কিন্তু এই যাদব পরিবার এবং কৃষ্ণ নিজে গৃহ ও পিত-মাতৃ সম্পর্কীয় নিষিদ্ধ আত্মীয় কুটুম্বের সঙ্গে যৌন সংসর্গের কলঙ্ক থেকে মুক্ত নয়। মৎস্য পুরাণে উল্লিখিত পিতা কর্তৃক কন্যাকে বিবাহের কাহিনি যাদব পরিবারেই ঘটেছিল। মৎস্য পুরাণ অনুসারে কৃষ্ণের এক পূর্বপুরুষ রাজা তৈত্তিরি নিজের এক কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন এবং তার গর্ভে নল নামক এক পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। মাতা-পুত্রে সহবাসের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় কৃষ্ণ পুত্র শাম্বের আচরণে। মৎস্য পুরাণ বর্ণনা করেছে কিভাবে শাম্ব তাঁর পিতা কৃষ্ণের স্ত্রীদের সঙ্গে অবৈধ জীবন যাপন করেছিলেন এবং কিভাবে ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ সেই কারণে শাম্ব এবং তাঁর অপরাধী স্ত্রীদের অভিশাপ দিয়েছিলেন। এ কাহিনির উল্লেখ মহাভারত্যে আছে। সত্যভামা দ্রৌপদীকে তাঁর পঞ্চ স্বামীর উপর নিয়ন্ত্রণের গোপন কথা জানতে চেয়েছিলেন। মহাভারত অনুসারে দ্রৌপদী তাঁকে তাঁর সতীন পুত্রদের সঙ্গে নিভৃতে কথা বলা বা বাস করার ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছিলেন। এটি মৎস্য পুরাণের শাম্ব কাহিনির সঙ্গে মিলে যায়। শাম্বই একমাত্র দৃষ্টান্ত নয়। তাঁর ভ্রাতা প্রদ্যুম্ন বিবাহ করেন তাঁর পালিকা মাতা মায়াবতীকে যিনি ছিলেন সম্বরের স্ত্রী।

অনেক পণ্ডিত মনে করেন দেবী দুর্গা শুধুই যৌনতারই প্রতীক। বহু শাস্ত্রে, পুঁথিতে প্রজননের দেবী দুর্গাকে উদ্দাম যৌবনের ও অবাধ মদ্যপানের দেবী রূপে বর্ণনা কারহয়েছে। তানজোরের পুন্ডমঙ্গেশ্বর ও পূজাইয়ের মন্দিরের দেবীর নাম কোররাবাই। সিংহ ও হরিণ তাঁর বাহন। দেবীর চার হাতে শূল-শঙ্খ-চক্র ও বরাভয়। এই কোররাবাই দেবী দুর্গার আর এক নাম। প্রাচীনকালে মাদুরাই অঞ্চলের শবর যোদ্ধারা নিজেদের গলা চিরে স্ব-রক্তে দেবীর অঞ্জলি দিতেন এবং অবাধ যৌনাচারে লিপ্ত হতেন। জীমূতবাহনের ''কালবিবেক''. রঘুনন্দনের ''অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব'', শূলপানির ''দুর্গোৎসববিবেক'' প্রভৃতি গ্রন্থে দুর্গাপজোয় আমোদ-প্রমোদই প্রধান ও অবাধ মদ্যপানের কথা বলা হয়েছে। গ্রন্থগুলিতে এই নগ্ন, পণদ্ব পরিহিতা দেবী

দুর্গা সম্পর্কে বলছে — ''আদিম রিপুর প্রবৃত্তি এবং অবাধ যৌনাচারের হুল্লোড় না থাকলে দেবী প্রসন্না হতেন না। বরং, কুপিতা এই দেবী উপাসকদের প্রাণভরে অভিশাপ দিতেন''। শ্রীশ্রীচন্ডী অনুযায়ী দেবী দুর্গা মহিষাসুর বধের পূর্বে মদ্যপান করেছেন। হরিবংশ -এর আর্যাস্তব অনুযায়ী বিন্ধ্যবাসিনী এই দেবীর মদ্য ও মাংসে ছিল অপরিসীম আসক্তি। সপ্তম ও অষ্টম শতকের কবি বাণভট্ট ও বাক্‌পতির মতেও এই দেবী পশু ও মনুষ্যরক্তপিপাসু ছিলেন। কথাসরিৎসাগর-এর অংশ বেতালপঞ্চবিংশতি তে একাদশ শতাব্দীর পণ্ডিত সোমদেব ভট্ট রাজা যশকেতুর রাজ্যে আঠারো হাত বিশিষ্ট মদ ও মানুষের রক্তপ্রিয় দেবী দুর্গা মহিষের কাটা মাথার ওপর সদা নৃত্যরতা বলেছেন। বর্তমান ঝাড়খণ্ডের বনবাসী শবর মেয়েরা এখনও দুর্গা মূর্তি বিসর্জনের শোভাযাত্রায় আকণ্ঠ মদ্যপানের পর উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত করেই নাচতে নাচতে যান। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাইপো ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, 'চিৎপুর রোড়ের এই অংশের দুই পার্শ্ব সেখানে বড় অধিক পরিমাণে বারবণিতাদিগের অধিকৃত থাকিত। ....সেকালে একাল অপেক্ষা মদ্যপানের কিছু বেশি প্রাবল্য ছিল। যাহাদের গৃহের প্রতিমা বিসর্জন হইত, সেইসকল বাবু যাহাদের পয়সা ছিল তাহারাই প্রতিমার সম্মুখে বাঁশের ময়ূরপঙ্খীতে খেমটার নাচ নাচাইতে কুণ্ঠিত হইতেন না। .....কেহ কেহ নেশার ঝোঁকে ঢলিয়া পড়িতেন। ....বাবুরা তো

সংস্কৃতির টোপ : কর্পোরেট প্রচারশিল্পে জাতিবাদের সূক্ষপ্রয়োগ

তুষার চক্র বর্তী

বিষয়টা মনের মধ্যে অনেকদিন থেকে ঘুর ঘুর করছিল। বিজ্ঞাপন জগতের এক বন্ধুর সঙ্গে একদিন এ নিয়ে আলোচনা করতেই তিনি হাতে ধরিয়ে দিলেন একটি চমৎকার বই যা কিনা বিষয়টিকে সরাসরি বিদ্ধ করে। সেই বইটি নিয়েই আজকের আলোচনা। বইটির লেখক ক্লোতের রাপেল এক বিতর্কিত চরিত্র। জন্মসূত্রে ফরাসি, করে কম্মে খাচ্ছেন মার্কিন মুলুকে, থাকেন ফ্লোরিডার সৈকতে। সেখানে আর্কিটাইপ ডিসকভারি ওয়ার্লড কোম্পানি এই বিচিত্র নামে একটি কোম্পানি ফেঁদে বসেছেন। কাজ, রাজনীতি ও কর্পোরেট জগৎকে দুনিয়ার যে কোনো সমাজে বিজ্ঞাপন ও জনসম্মোহনের অমোঘ কায়দা বাতলানো। রাজনীতিবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব এবং নৃতত্ত্ববিদ্যা, ক্লোতের রাপালের তিনটিতেই অধিকার অনন্যসাধারণ। আর এই তিন বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে পেশার যে ক্ষেত্রটিতে তত্ত্ববিদ হিসাবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা হল মগজনিয়ন্ত্রণের জগৎ। নামী দামী বহু মার্কিন বহুজাতিক সংস্থার বিজ্ঞাপনী পরামর্শদাতা হিসেবে তার নাম ডাক যথেষ্টই। **আর এই পেশায় তাঁরএকমাত্র তু পের তাস হল সংস্কৃতির টোপ, যা দিয়ে নানা জাতি ও বর্গের মানুষের মনকে তিনি লোভাতুর করে তোলার হদিশ দেন**। ফলে বহুজাতিক সংস্থার বিদেশী পণ্যকে স্বদেশিপ্রতিম করে তোলা যায় সহজেই। দেশে দেশে বিক্রির বাজার ধরতে এই কৌশলের তুলনা নেই। মনের গোপন সব দরজা জানলা দিয়ে তিনি সেধিয়ে যেতে সুদক্ষ। আর এই নিয়েই দি কালচার কোড শিরোনামে বইটি তিনি লিখেছেন। সমাজচর্চার নিরিখেও এটি একটি উল্লেখ করার মত পুঁথি, যদিও সেই দাবী লেখক করেননি।

ইউরোপের পেটের খাদ্য ও মনের খোরাকের পরিবেশনার মধ্য যোজন যোজন তফাৎ চোখে পড়ার মতো। দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার মসলা দিয়ে মনের সরল খাদ্যকেও মোগলাই খানার মতন দুরূহ, দুষ্পাচ্য করে তোলা ইউরোপের মনের পন্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের স্বভাবসিদ্ধ। এই বই সেদিকে থেকে এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। বেশ কঠিন ও জটিল বিষয়কে এখানে লঘু না করেও, পরিবেশনার গুণে প্রায় জলবৎ তরলম করে

তুলেছেন লেখক। মূল যে সত্যটি তিনি ধরিয়ে দিয়েছেন - তা নানা জাতের পাঠকের আগ্রহ ধরে রাখার মত। আসলে, লেখক জানেন লেখাকে চটচটে না করেও আঠালো করে তোলার কায়দা। বইটি পড়বার পরে অনেকের হয়ত মনে হবে এতো আমি আগেই জানতুম। আর ঠিক সেখানেই লেখকের জিত।

যেখান থেকে লেখক তার যুক্তি বিছানো শুরু করেছেন তা হল : কোনো মানুষকে, কী তার পছন্দ সেটা নিয়ে প্রশ্ন করার ছলে তাঁদের প্রভাবিত করবার কায়দা। কেনা কাটা করতে গেলেই ক্রেতাকে এমন প্রশ্ন সতত করা হয়। এই কায়দা প্রয়োগ করা হয় আরো নানা মার্কেট সার্ভে জাতীয় কাজে। কিন্তু, লেখকের দাবী : এমন প্রশ্ন করার তেমন কোনো মানে হয় না। মানুষ চালাক প্রাণী। প্রশ্নকর্তা কী উত্তর চাইছে সেটা বুঝে উপযুক্ত জবাব দেওয়া মানুষের স্বভাব। সত্যি বা মিথ্যের প্রশ্ন এখানে ওঠে না। মানুষ যুক্তিবাদী বলেই এটা সে করে ফেলে। অন্যের মন বোঝাটা তার ধর্ম। সেটা সে বোঝে যুক্তি দিয়ে। আর এমনি করেই সে যত ভাবে, তত সে নিজের প্রকৃত পছন্দ থেকে, অন্যের ইচ্ছার দিকে সরে যায়। যদিও তার পছন্দ অনেকটাই আবেগ-নির্ভর ও যুক্তি নিরপেক্ষ।

আবেগের বশেই মানুষ বেশিরভাগ কাজে প্রণোদিত হয়। সে কারণেই বিজ্ঞাপনের জগতের আবেগ এবং গ্ল্যামারের এত রমরমা। কিন্তু, আবেগ উস্কাবার কাজেও কায়দা কানুনের প্রয়োজন হয়। না হলে তা কাজে লাগে না। তাহলে, চালাক বিক্রেতার কী করা উচিত? লেখকের উত্তর হলো সংস্কৃতির সংকেত কে খুঁজে তাকে 'চার' হিসেবে কাজে লাগানো। তাহলেই অনেক বেশি ক্রেতারূপী মৎস্য টোপ গিলতে এগোবে। বড় বেশি যুক্তি ঠাসা বা আবেগ ঢালা প্রশ্ন করে তাকে ঘাবড়ে না দেওয়াই ভালো। দু-একটা সংকেত কায়দা করে গুজে দেওয়াটাই যথেষ্ট। সংকেত ঠিক ঠিক বোঝা গেলে তা আপনা থেকেই আবেগ উস্কে দেবে। আবেগের ঠেলায় তখন সে আপসে এগোবে। তাই আজ কেনাবেচার জগৎ সংস্কৃতির দখল নিতে এত ব্যস্ত। তারা পূজোর স্পনসর, তারা গানের জলসার ঠিকাদার। **জাতি ও বর্ণ - পরিচয়কেও তারা ব্যবহার করছে। ভোটের রাজনীতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে যার সত্যতা সহজেই বোঝা যায়।**

এত গেল ম্যাক্রো বা বড়মাপের বা মোটা দাগের ব্যাপার। সংস্কৃতির সংকেত কিন্তু খুব ছোট ছোট। সেভাবেই তারা জনজীবনে বিরাজ করে। না হলে - তাদের আর সংকেত বলি কেন? যেমন মোটরগাড়ি তার একটা উদাহরণ। মার্কিন ক্রেতার কাছে

গাড়ি হল আইডেনটিটির কোড, ব্যক্তিচরিত্রের সঙ্গে তার মিল থাকা সেখান অনিবার্য। কিন্তু জার্মানদের কাছে গাড়ি হল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ভারতে গাড়ি হল ধনবৈভবের জানানদারী সংকেত। আবার ধরুন খাবার বা ফুড। এটা গড়পরতা মার্কিনিদের কাছে শুধুমাত্র শরীরের প্রয়োজনীয় জ্বালানী বা ফুয়েল। ওরা বাঁচার জন্য খায় - খাওয়ার জন্য বাঁচে না। ফরাসিদের কাছে কিন্তু খাবার হল সুখ বা প্লেজার আর ভারতে এটা আস্থা অর্জন ও সম্মাননার জ্ঞাপন সংকেত। আহুত-অনাহুত সবরকম অতিথিকেই খাদ্য দিয়ে আপ্যায়িত করাটা আস্থা অর্জনের এক প্রাচীন সংকেত। আমেরিকা বা ইউরোপ যা এখন তুলে দিয়েছে বা ভুলে গেছে।

আমাদের বাজারে ঘুরে বিজ্ঞাপনের কোম্পানির ব্যানারে চোখ রাখলে আপনারা সংস্কৃতির সংকেতের হাজার রকম প্রয়োগ দেখবেন। **কিন্তু, সাংস্কৃতিক সংকেতের সবচাইতে মারাত্মক ও আগ্রাসী প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে রাজনীতির প্রচারে। ভারতে জাতি ও বর্ণগত নানা সংকেতকে সমাজের মতাধরেরা বহুকাল যাবৎ ব্যবহার করে আসছে। তাদের নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে হাত পাকিয়েছিন নানা ইউরোপীয় গবেষক।** এখন, সংকেতগুলিকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে আরো সূক্ষ্মভাবে ব্যবহার করার পালা শুরু হয়েছে। নোবেল জয়ী কনরাজ লোরেঞ্জ যাকে বলেছিলেন ছাপ বা ইমপ্রিন্ট, আমাদের মগজে

বিজাপুর গণহত্যা কোন প্রশ্ন তুলে ধরছে

অর্ক সেনগুপ্ত

২৮ জুন ২০১২, আরো একটা দিন সেদিন লজ্জায় মুখ ঢেকেছিলাম আমরা। আমরা বলতে সেই কয়েকজন যারা উচ্চবর্ণের হিন্দু হয়ে জন্মেই লজ্জিত হয়েছি। কি হয়েছিল এই দিনটায় এমন সেটাই ভাবছেন তো? নিশ্চয় সবাই ভাবছেন না, তবে অনেকেই যে ভাবছেন তা নিয়ে আমি নিশ্চিত। ঐ দিনটায় যাই হয়ে থাকুক না কেন যা হয়েছিল তা দেখে, শুনে, জেনে, লজ্জা তো বোধ করেইছি, প্রচণ্ড ঘেন্নারও জন্ম হয়েছে ভেতরে। কার বিরুদ্ধে ঘেন্না? মনুস্মৃতি অনুযায়ী তৈরী হওয়া ব্রাহ্মণ্যবাদী আদর্শ পরিচালিত এই রাষ্ট্রের প্রতি ঘেন্না। আমার এবং আমার আরো বেশ কিছু সাথীর মতে ২৮ জুন ২০১২ হচ্ছে ৪৭ পরবর্তীতে আদিবাসীদের ওপর ব্রাহ্মণ্যবাদী ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের সবচেয়ে নির্মম আক্রমণের দিন। এই দিনটাতেই ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলার সড়কেগুড়া জঙ্গলে তিনটি গ্রাম — রাজপেতলা, কোট্টাগুডা আর সড়কেগুড়ার গ্রামবাসীরা জড়ো হন তাদের নিজস্ব বীজ উৎসবকে কেন্দ্র করে। যা আসলে আসন্ন চাষবাসের মরশুমের সূচনা উৎসব। সকাল প্রায় ৮টার সময় এই উৎসবের অনুষ্ঠান শুরু হয় আর নটা নাগাদ সি.আর.পি.এফ. কোবরা-এস.ডি.ও'র মতো রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র বাহিনী তাদের ঘিরে ধরে এবং কোনো কথা না বলেই নির্বিচারে গুলি চালাতে শুরু করে। কি কারণে এই ঘটনা বুঝে ওঠার আগেই প্রাণ হারান ১৬ জন। পরে সকালে সরকেগুডা গ্রামে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন আরো ১জন। ৬জন গুরুতর ভাবে আহত হন। পালিয়ে বাঁচা ৩ মহিলাকে তাড়া করে ধরে ফেলে চুল ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসা হয়, শ্লীলতাহানি করা হয় ও ধর্ষণের হুমকিও দেওয়া হয়। আসেপাশের গ্রামেও সকালে হানা দিয়ে সরকারী বাহিনীর লোকেরা ব্যাপক লুঠতরাজ চালায় বলে সাধারণ গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেন ঐ অঞ্চলের গান্ধীবাদী সমাজকর্মী ও আদিবাসী মানুষদের অধিকার রক্ষার আন্দোলনের নেতা হিমাংশু কুমারের কাছে।

দলিত ও সংখ্যালঘুদের মতো আদিবাসীরাও এই ব্রাহ্মণ্যবাদ শাসিত দেশে চরমভাবে

শোষিত ধারাবাহিকভাবেই। বারবার তারা আক্রান্ত ব্রাহ্মণ্যবাদী নানা সংগঠিত বাহিনীর দ্বারাও। কিন্তু সরাসরি রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর নির্লজ্জ ও নৃশংস আক্রমণ এই পরিমাণে আগে নামেনি। যদিও বেশ কয়েকবছর ধরেই রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর আক্রমণ চলছে আদিবাসীদের ওপর। কারণ নানা ধরনের বেসরকারী সশস্ত্র বাহিনী, যারা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত, তাদের হাতে বহুকাল ধরে মার খেতে থাকা আক্রান্ত আদিবাসীরা শেষ ক'বছরে প্রত্যাঘাত করতে শুরু করেছে। আক্রান্ত আদিবাসীরা হয়ে উঠেছে যোদ্ধা। দেশি বিদেশি বড় কোম্পানির হাতে আদিবাসীদের জল-জঙ্গল-জমি ও জমির তলায় থাকা খনিজ তুলে দেবার পরিকল্পনা করেছে ভারত রাষ্ট্র। সেই পরিকল্পনাকেই বাস্তবায়িত করতে এবার মাঠে নেমেছে সরকারী সশস্ত্র বাহিনীরা।

তারা মাঠে নেমেছে বেশ কয়েকবছর হয়ে গেল। কিন্তু কি মুশকিল, তাদের সাথেও সমানে যুঝে চলেছেন আদিবাসীরা। লড়াই ছাড়ছেন না, বরং তাদের লড়াই দলিত-সংখ্যালঘুদেরও অনুপ্রাণিত করে চলেছে, ব্রাহ্মণ্যবাদ পরিচালিত সরকারী-বেসরকারী সশস্ত্র বাহিনীর মোকাবিলা করতে। ফলে মনোবল ভেঙে দিতে এই হামলা। যদিও পরে কেন্দ্রিয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকও মেনে নিয়েছে যে বরং ভুল বুঝে গুলি চালানো হয়েছে সাধারণ গ্রামবাসীদের ওপর। ভুল বুঝে এমন সংগঠিত অভিযান? না, হতে পারে না; পরিকল্পিত গণহত্যা ছিল এটা। আদিবাসীদের সংগ্রামের মানোবল ভেঙে দিতে। আমরা যারা খুব সামান্য কয়েকজন অবস্থান নিয়েছি দলিত-সংখ্যালঘু-আদিবাসীদের পক্ষে, কিছুটা মানবিকতা, কিছুটা রাজনৈতিক বোধ আর কিছুটা একটা নতুন সমাজের স্বপ্নে, তাদের কেউ কেউ বিরোধিতা জানালাম এই ঘটনার তাদের মধ্যে কয়েকজন খুব নামকরা, যেমন — বিনায়ক সেন, হিমাংশু কুমার, অরুন্ধতী রায়, বিভি শর্মা, কবীর সুমন । আরও বিরোধিতা করলেন এমন কিছু রাজনৈতিক শক্তি যারা দলিত আন্দোলনের সাথীদের কাছে মনুবাদী, দলিতদের শত্রু। কারণ তারা লাল ঝাণ্ডধারী ও তাদের দলে বেশ কিছু উচ্চবর্ণ নেতৃত্ব আছে। হ্যাঁ, সরকারী ও সরকারের সহযোগী লালঝাণ্ডাওয়ালারা সত্যি চরম মনুবাদী রাজনৈতিক দলগুলির থেকে আলাদা কিছু করেনি। বরং যা করেছে তা নিপুণভাবে করেছে। কারণ এদের মধ্যে কিছু উচ্চবর্ণের নেতৃত্ব থাকলেও দলিত-সংখ্যালঘু-আদিবাসীরাও ভালো সংখ্যায় আছেন। এবং বহুকাল ধরেই তারা সরকারী-বেসরকারী ব্রাহ্মণ্যবাদী সশস্ত্র শক্তিগুলির সাথে লড়ে চলেছে। তবে

একথাও মাথায় রাখতে হবে যে সরকারী ও সরকারের সহযোগী লাল-ঝাণ্ডাওয়ালারা ঐ লাল ঝাণ্ডাটির বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করে দিয়েছে বহুকাল দলিত-সংখ্যালঘু-আদিবাসীদের কাছে, আপামর জনগণের কাছেও। সত্যিই লাল ঝাণ্ডা আর গেরুয়া ঝাণ্ডার পার্থক্য রাখেনি তারা। তাই লাল ঝাণ্ডাকে তার প্রকৃত মর্যাদার জায়গায় নিয়ে যেতে হলে, বিশ্বস্ততা অর্জন করতে হলে অনেক খাটতে হবে, প্রচারেও, মাঠে ময়দানেও।

আমার প্রশ্ন সেইসব দলিত-সংখ্যালঘু-আদিবাসীদের পার্টি-সংগঠন-ব্যক্তিদের নিয়ে যারা আম্বেদকার-বীরসামুণ্ডা-সিধু-কানহুর নামে দুটো ভাত বেশি খান তাদের নিয়ে। যারা দাবী করেন যে তারাই দলিত-সংখ্যালঘু-আদিবাসীর প্রকৃতি প্রতিনিধি আর কোনো না কোনো মনুবাদী পার্টির সাথে জোট বেঁধে বা বাইরে থেকে সমর্থন দিয়ে ক্ষমতার ভাগ চান, আর বিনায়ক সেন-সুধীর ধাওয়াল-ছত্রধর মাহাতোর গ্রেপ্তারিতে একটা কথাও বলেন না। লালমোহন টুডু-সিধু সরেনদের ঠাণ্ডা মাথায় খুন করলে বা বীজাপুর গণহত্যার পরও নীরব থাকেন। কেন? তারা কি এই ব্রাহ্মণ্যবাদী যুক্তিতে একমত যে এঁরা ভারতের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ? যদি বিপদই হয়, তাও তো ঐ মনুবাদী রাষ্ট্রের, এতে দলিত-সংখ্যালঘু-আদিবাসীর জায়গাটা কোথায়? এর চেয়েও বড় কথা ব্রাহ্মণ্যবাদের যুক্তিতে এরা বিশ্বাস করেন নাকি আজও?

বোধহয় উত্তরগুলো চাওয়ার সময়ে এসেছে। কারণ পার্টি অফিসে বা সংগঠনের প্যাডে আজও বেঁচে আছেন, লড়ছেন আম্বেদকর, পেরিয়ার, ফুলে, রোকেয়া, বীরসা মুণ্ডা, সিধু-কানহু, জগৎ সিং রা তারা জিতবেন, আরো অনেক সুধীর ধাওয়াল, ছত্রধর,

শিক্ষকদের সাথে বিতর্ক চলুক

অন ন্য আচার্য

জাতি-বর্ণবৈষম্যে জর্জরিত, দরিদ্রসংখ্যার হিসাবে সকল দেশের সেরা হবার দৌড়ে সম্ভাব্য পদক বিজয়ী ভারতবর্ষে কার্ল মার্কস, বি.আর.আম্বেদকর এবং পেরিয়ারের অনুগামীদের তৃমুখী অবস্থান (বহুমুখী বা পরস্পর বিরোধীও বলা যায়) উপরোক্ত তিনজন চিন্তকের প্রতি প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া হয় না। যেহেতু কোনও আলোচনা সভায় এখন উপরোক্ত প্রাজ্ঞজনদের সমাবেশ করা যাবেনা, আমরা বরং, এঁদের রচনার সহায়তা নিলে নব্য আম্বেদকরবাদী, নব্য পেরিয়ারবাদী, নষ্ট মার্কসবাদীদের অবস্থানকে বুঝতে সক্ষম হবো।

ক ২০ নভেম্বর, ১৯৫৬ (আম্বেদকরের জীবনাবসানের ১৬ দিন পূর্বে) কাঠমান্ডুতে একটি বৌদ্ধ সম্মেলনে বি.আর.আম্বেদকর বুদ্ধ বা কার্ল মার্কস শিরোনামে একটি ভাষণ দেন। সেই সভায় তিনি মূলতঃ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জীবনযাপন বিষয়ে কথা বলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি কমিউনিজমের dictatorship (একনায়কতন্ত্র) এবং force (বলপ্রয়োগ) সম্পর্কে তাঁর সংশয় সংক্ষিপ্তাকারে ব্যক্ত করেন। তাঁর জীবৎকালে কিছু ব্যক্তিগত আলাপ পর্ব ছাড়া কমিউনিজম সম্পর্কে বিশেষ কড়া মন্তব্য করেননি। একনায়কতন্ত্র এবং বলপ্রয়োগ প্রশ্নে মার্কসবাদী শিবিরেই বিভিন্ন মত আছে। অনেকেই বহুদল ব্যবস্থার পক্ষে। মার্কস কথিত (হিংসা সমাজের ধাত্রী) অবস্থানে অনেকের সংশয়। অথচ আম্বেদকরের জীবদ্দশায় তিনি যতবার মহারাষ্ট্রের শ্রমিক আন্দোলনে কমিউনিস্টদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন ততবারই সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারণে সর্বরিক্ত দলিত সমাজ সুফল লাভ করেছে। ''মার্কসকে গ্রহণ করিতে না পারি, করিতেও পারি। কিন্তু কোনমতে জ্যোতি বার পথ পরিত্যাগ করিব না'' - আম্বেদকর।

তবুও নব্য আম্বেদকরবাদীদের একাংশের মার্কসবাদ বিদ্বেষ কেন তা এখনও গবেষণার বিষয়।

*কৌদী আবাসু আগস্ট ১৯৩২

খ পেরিয়ারের সামাজিক, রাজনৈতিক আন্দোলনের কোনও পর্যায়ে কমিউনিস্টদের সাথে কোনও বিরোধ হয়নি। সিরিংগাভেলু চেট্টিয়ার নামক দক্ষিণ ভারতের প্রথম যুগের এক কমিউনিস্ট নেতার সাথে ৩-এর দশকে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লাগাতার একযোগে সংগ্রাম করেছেন। পেরিয়ারের রুশদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁকে সমাজবাদ এবং নিরীশ্বরবাদ সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে। পেরিয়ারের রচনাবলীর মধ্যে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে একটি বাক্যও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

নব্য পেরিয়ারবাদীদের একাংশ এ বিষয়ে সম্ভবতঃ জানতে চান না।

(গ) কার্ল মার্কসের ভারতচর্চা প্রশংসনীয় উদ্যোগ কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্নাতীত নয়।

কোসম্বী, ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মত - কার্ল মার্কসের ভারতচর্চা বিষয়ে সর্বাংশে একমত হওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে যে সব ভারত-চর্চাবিদদের সহায়তায় কার্ল মার্কস ভারতবর্ষ সম্পর্কে লিখেছিলেন তাঁরা ভারতীয় সমাজের জাতভিত্তিক বৈষম্য সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন না। নানা অসুবিধা সত্ত্বেও কার্ল মার্কস জর্মন ভাবাদর্শ (১৮৪৫-৪৬), পুঁজি (১৮৬৭) গ্রন্থে ভারতে জাতব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করেন। প্রুঁধো রচিত দারিদ্রের দর্শন পুস্তকটির সমালোচনা করে মার্কস রচনা করেন দর্শনের দারিদ্র (১৮৪৭। সেখানে তিনি লেখেন ঃ "পিতৃতান্ত্রিক, জাতিভেদ ভিত্তিক ব্যবস্থায় সামন্ততান্ত্রিক এবং ব্যবসায়ী অর্থনীতিতে কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মের ভিত্তিতে শ্রম বিভাজন নির্দ্ধারিত থাকে। এটা কি আইনসম্মত? না। প্রকৃতপক্ষে বাস্তবিক উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যেই উৎপাদন সম্পর্ক জন্ম নেয়। এর ফলেই বিভিন্ন সামাজিক কাঠামোতে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য লক্ষিত হয়''(পৃষ্ঠা - ১১৮)।

১৮৫৯ সালে রচিত রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সমালোচনা পুস্তকেও একাধিকবার জাতিভেদ উল্লেখ করেন। সেখানে তিনি লেখেন ঃ ".....অথবা আইন হয়তা কতকগুলি পরিবারকে জমির মালিকানা দিতে পারে বা কতকগুলি পরিবারকে বংশানুক্রমে জমি শ্রমিক হিসাবে চিহ্নিত করতে পারে' ' (পৃষ্ঠা ২০১ - মস্কো সংস্করণ)।।

১৮৫৩ সালে বৃটিশ শাসিত ভারতের ভবিষ্যৎ প্রবন্ধে জানান ঃ "রেলওয়ে ব্যবস্থাজাত আধুনিক ব্যবস্থা হয়তো বংশানুক্রমিক শ্রমবিভাজন ভাঙ্গতে পারে'' (পৃষ্ঠা - ৮৪-৮৫

মস্কো সংস্করণ)।

বর্তমান অভিজ্ঞতা আমাদের শেখাচ্ছে যে কার্ল মার্কসের এই শুভকামনা ফলপ্রসূ হয়নি।

পুঁজি গ্রন্থে তিনি একাধিকবার ভারত ও ইজিপ্টের উদাহরণ টেনে বংশানুক্রমিক পেশাজাত ও শ্রেণীর সম্পর্ক অনুসন্ধান করেছেন (পৃষ্ঠা- ৩২১ মস্কো সংস্করণ)।

তবুও একথা বলতে দ্বিধা থাকার কথা নয় যে, রসদ সংগ্রহে অপ্রতুলতা তাঁর মহান প্রচেষ্টা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। বর্তমানে কার্ল মার্কসের বেশ কিছু অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি অনুদিত এবং মুদ্রিত হতে যাচ্ছে তাতে ভারতবর্ষ সম্পর্কে বেশ কিছু চিঠির কথা শোনা যাচ্ছে।

১৮৫৭ সালের আগে অনেকগুলি স্বাধীনতাযুদ্ধ হয়ে গেছে, যা কার্ল মার্কসের নজর এড়িয়ে গেছে। রণজিত গুহ পরবর্তী সাব অলটার্ন ইতিহাসবিদগণ এই কারণে কার্ল মার্কসকে অভিযুক্ত করতেও দ্বিধাবোধ করছেন না। এ বিষয়ে আমরা রণজিত গুহ'র প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় আছি। আশা করা যায় শ্রী গুহ তাঁর অযোগ্য ছাত্রদের প্রশংসা করবেন না।

ভারতে মার্কসবাদের দর্শনে বিশ্বাসী দলগুলি জাতিভেদ ব্যবস্থা, বর্ণ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা, পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে কি কিছুই করেনি? উত্তর একইসাথে - হ্যাঁ এবং না। এটা ঘটনা যে কমিউনিস্ট মতাবলম্বে বিশ্বাসী নেতাদের অনেকাংশই মনে করেন যে কোনও এক ৭নভেম্বর বা ১ অক্টোবরে সমাজতন্ত্র বা নয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইবার পর নতুন সরকার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিবেন যে দেশ হইতে জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, পুরুষতান্ত্রিকতা আইনবিরুদ্ধ হইবে। তার আগে কর্মসূচীতে এসব বিষয়ে গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন নেই। উপরোক্ত তিনটি ব্যাধি হইতে মুক্ত হবার প্রক্রিয়ার সাথেই রাজনৈতিক বিপ্লবের অংঙ্গাঙ্গীমূলক সম্পর্ক আছে, তা এঁদের অনেকের ধারণায় নেই।

প্রবন্ধটির প্রথম পর্বে পেরিয়ার এবং আম্বেদকরের সাথে কমিউনিস্টদের যৌথ কাজকর্মের হদিশ দেওয়া হয়েছে। ১৯৬০ সালে প্রকাশিত নিউ এজ পত্রিকায় কমিউনিস্ট নেতা দামোদরণের রচিত ধারাবাহিক প্রবন্ধ জাতিভেদ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসামান্য দলিল। চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি মনুসংহিতা প্রেমীদের পক্ষে অসহনীয়।

তবুও যখন ভি.টি. রাজশেখর দলিত ভয়েস পত্রিকায় লেখেন — Why Marx failed in Hindu India তা মনোযোগ সহকারে পড়ে জবাব দিতে হবে।

একটি অতি সরলীকৃত সমালোচনা সব কটি মার্কসবাদী দলকে শুনতে হয় যেহেতু ঐ দলগুলির নেতারা উচ্চবংশজাত তাই তাঁরা জাতিভেদ নির্মূলিকরণ চান না। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতার অলিন্দে অনেক দলিত, সংখ্যালঘু আদিবাসীদের নেতৃত্বাধীন দলনেতারা উচ্ছিষ্টভোগীর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁরা প্রাসাদ বাসিন্দা বা পাঁচতারা হোটেল ঘোরা 'বাম'নেতাদের থেকে কম নীতিভ্রষ্ট নন।

ভারতের রাষ্ট্রকাঠামোয় একাধিকবার দলিত, সংখ্যালঘু, মহিলা, আদিবাসীদের প্রতিনিধিরা রাজ্য বা কেন্দ্রে গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী হয়েছেন। সর্বরিক্ত দলিত সমাজের সামাজিক ক্ষমতায়নের আগে তাদের নেতাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঘটলে তা অশ্বডিম্ব প্রসব করছে।

আজ সময় এসেছে ঘুরে দাঁড়াবার, ফিরে দেখবার অতীতের সঠিক ও বেঠিক কাজগুলিকে। ভারত রাষ্ট্র যখন বিদেশী নির্দেশে ৯০ শতাংশ জনগণের বিরুদ্ধে নানা পদ্ধতিতে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে —

তখন একতা বড়ই প্রয়োজন।

স্বামী মোহিতানন্দ মহারাজ সমীপেষু

পুন্ডরীকা পুরকায়স্থ

(লেখক পরিচিতি ঃ লেখক নিয়মিত গঞ্জিকা সেবন করেন। নেশার প্রভাবে তিনি নিজের সাথেই অসংলগ্ন কথাবার্তা চালান। নেশার প্রভাব কাটলে প্রায় স্বাভাবিক কথা বলেন। তাঁর একক প্রলাপ এবং আলাপ সম্পাদকের হস্তক্ষেপ ছাড়াই মুদ্রিত হল)

মহারাজ,

ভারতে মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধি-বিস্ফোরণে আপনার দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত মতামতে বড়ই বিস্মিত বোধ করছি। পর্বান্তর এবং দেশকাল পত্রিকা বহুস্বরবাদে বিশ্বাস করে, ফলে ঐসব পত্রিকায় আপনার রচনা স্থান পায়। ঐসব পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী বড়ই উদার। ওনারা বহুস্বর শুনিবার এবং শোনাইবার জন্য গুজরাট গণহত্যাকারী বা বাবরি মসজিদ ধ্বংসকারীদের মধ্য থেকে কোন একজন লেখককে বাছাই না করে আপনার রচনা প্রকাশ করলেন কেন?

রবিবার সকালে মাছের বাজারে চিৎকার চেঁচামেচির মাঝে কেউ উচ্চাংগ সঙ্গীতের এক টুকরো বন্দীশ খুঁজতে পারেন। একটি খাঁচার মধ্যে কাক, চিল, কোকিল, ঘুঘু, শকুন ইত্যাদি প্রাণীকে আটকাইয়া রাখিয়া যদি তাদের সমবেত কণ্ঠস্বর হইতে কেউ (উত্তর) আধুনিক গানের সুর বাঁধতে চায় তাতে আপত্তি করার কিছুই নাই। কিন্তু তাঁদের লেখক বাছাই-এ আপনাকে পছন্দ কেন? যাদবপুর হইতে মি. গুগুল জানায় যে আপনি ছাত্রজীবনের প্রথম পর্বে মিহি বাম, অন্তিমপর্বে ইঞ্জিনিয়ার, ফান্ডেড এন.জি.ও.-র প্রশ্রয়ে পরিবেশবিদ হইয়াও পরিচিতির ব্যাপ্তিলাভের প্রত্যাশায় প্রগতি শিবিরে আগমার্কা হিন্দু অনুপ্রবেশকারী হইতে চাহিতেছেন।

ডারউইন সাহেব বিবর্তনের তত্ত্বে বানর জাতীয় প্রাণী হইতে মানব জাতির যাত্রাপথ উদ্ভব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আপনাকে তাঁহার কোন গবেষক অনুগামীর ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করাইলে উপরোক্ত যাত্রাপথের বিপরীতমুখী পথচারীর সন্ধান

পাওয়া যাইবে। বিজ্ঞানের এই আবিষ্কারে সারা বিশ্বজুড়ে আপনার নাম উচ্চারিত হইবে।

* * * * * * * *

(নেশার প্রভাব কাটিতেছে - সম্পাদকমন্ডলী)

Religious Demography of India নামক একটি বড় প্রবন্ধে মোহিতানন্দজীর সাথে সহমত হইবার যথেষ্ট উপকরণ আছে।

প্রাবন্ধিক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে ২০৫১ সালের মধ্যেই ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা হিন্দু জনসংখ্যার সমান হইয়া যাইবে। এটি কি সেই ধরনের ভবিষ্যৎবাণী যেখানে বলা হয় ২০৩৭ সালে পৃথিবী ধ্বংস হবে বা সুভাষ ঘরে ফিরিবেই? অনেকগুলি সম্ভাবনার (প্যারামিটার) কথা মাথায় না রাখিয়া ওঠানামা সংখ্যাতথ্যের বিষয়ে অজ্ঞতা থাকার ফলে এ জ্ঞান কেবলমাত্র বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের লাভ-লোকসানের হিসাব পদ্ধতিতে আটকাইয়া থাকিলে টি-টুয়েন্টি ক্রিকেট খেলার শেষার্ধে যেমন প্রায় আঁকিয়া প্রজেক্টেট রান দেখানো হয় সেই বিভ্রান্তিতেই ২০৫১ সালে দেশ রসাতলে যাইবার গপ্পো প্রাবন্ধিক প্রচার করছেন। এটা ঘটনা যে ১৯৮০ সালে জনসংখ্যার হিসাব অনুসারে হিন্দু জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার হ্রাস পায়। গ্রাফের রেখার নিম্নাভিমুখী যাত্রাকে সরল স্বাভাবিক স্থির গতি ধরিয়া যদি কেউ ২০৫১ সালকে সিদ্ধান্ত সাল হিসাবে ঘোষণা করেন তাহলে নানা প্রশ্ন উঠতেই পারে। তাহলে ১৯৮০ সালে হিন্দু জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার হ্রাস পেল কেন? জরুরী অবস্থাকালীন জবরদস্তি নাসবন্দীর (ভেসেকটমী) কথা স্মরণে আনা যাক। বিভিন্ন কারণে হিন্দুদের একাংশ এই সরকারী উদ্যোগে সাড়া দেয় এবং মুসলমানদের অধিকাংশ সাড়া দেয় না (জরুরী অবস্থার পরে ইন্দিরা গান্ধীর পরাজয়ের বিভিন্ন কারণের মধ্যে নাসবন্দী একটি কারণও বটে)। এর চেয়েও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ের মাধ্যমে। দক্ষিণ ভারতে বিশেষতঃ তামিলনাড়ুতে নিরীশ্বরবাদী পেরিয়ারের অনুগামীগণ দীর্ঘকাল যাবৎ পারিবারিক হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করিয়া মানবতাবাদকে ধর্ম হিসাবে নথীভুক্ত করিতেছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে মানবতাবাদ (Humanism) -শব্দটি H অক্ষরটি দ্বারা শুরু হওয়ার কারণে এবং হিন্দু (Hindu) -র H অক্ষরটি সেন্সাস কর্মীদের'' দক্ষতার'' কারণে একই গোষ্ঠীভুক্ত হিন্দু হয়ে যায়। পেরিয়ার অনুগামীদের তুমুল আন্দোলনের ফলে আদালতের রায় মানবতাবাদীদের পক্ষের এবং মোহিতানন্দ মহারাজের বিপক্ষে যায়। আতংক প্রচারের সূচনা নূতন পর্যায়ে পৌঁছয়। এ বিষয়ে দেবেন্দ্র কে. কোটারির

(হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়, জয়পুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব হেল্থ ম্যানেজমেন্ট) Population and development in India বইটি মুসলিম বিদ্বেষীদের বোধোদয়ে সহায়তা করতে পারে।

সাচার কমিটির রিপোর্ট অনুসারে ২১ শতকের শেষে ভারতের জনসংখ্যার ২০ শতাংশ মুসলিম পরিবারজাত হইবে অনুমান করা হচ্ছে। পপুলেশন রেফারেন্স ব্যুরোর সম্পাদক এরিক জুইখে ধারাবাহিক প্রবন্ধে লিখছেন পৃথিবীর কয়েকটি দেশ ব্যতিরেকে অনেক দেশে (ভারত সহ) মুসলিম জনসংখ্যাবৃদ্ধি হ্রাস পাচ্ছে।

সাচার কমিটির রিপোর্ট, পপুলেশন ডায়নামিক্স-এর নিত্যনতুন গবেষণা, সেন্সাস কমিশনের রিপোর্ট এবং সংখ্যাতত্ত্ববিদ্যার প্রাথমিক জ্ঞানের সমন্বয় ঘটাইলে জানা যায় যে, ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা হিন্দু জনসংখ্যাকে স্পর্শ করিতে ৯টি শতক লাগিবে। মুসলমানরা যদি ধর্মীয় বিধানের কোনও একটি গ্রহণ করেন, তবে এই হিসাবের পরিবর্তন হবে।

প্রথম বিধান ঃ নারীদেহ একটি উর্বর উৎপাদন ভুমি, যত ইচ্ছা ইহাকে কর্ষণ করো।

দ্বিতীয় ঃ শারীরিক মিলনকালে আরবী ভাষায় ফয়জল (Faizal), ইংরাজীতে awith-drawl মানিয়া চলিবে। অবশ্য পেরিয়ারবাদীদের ন্যায় নিরীশ্বরবাদীগণ যদি ইতিমধ্যে নিজেদের অ-হিন্দু হিসেবে নথিভুক্ত করিতে থাকেন তবে সেই ''ভয়াবহ বিপদের'' দিন কিয়ৎকাল পূর্বেই আসিবে।

(পুনর্বার গঞ্জিকা সেবন এবং তার প্রভাব)

মাননীয় মোহিতানন্দ মহারাজ,

আপনার তুতো ভাই স্বামী বিবেকানন্দ রাজযোগ রচনায় জানাইয়াছেন যে নিয়মিত যোগাভ্যাস করিলে ৪০০ বছর আয়ু হইতে পারে। তাই আপনার কাছে সবিনয় আবেদন যে, ৮বি বাস স্ট্যান্ডের নিকট একটি হিন্দু যোগাসনের শিক্ষণকেন্দ্র খুলুন যাহাতে আপনি এবং আপনারা দীর্ঘজীবি হইয়া আসন্ন সর্বনাশের দিনটি দর্শন এবং ফলতঃ যন্ত্রণা পাইতে পারেন। ইনভেস্টমেন্ট লইয়া দুশ্চিন্তা করিবেন না। পশ্চিমী